কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা সাহিত্য পত্রিকা

সপ্তম বর্ষ

১৯৮২

সম্পাদক

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ

কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক :
শ্রীদিলীপ মুখোপাধ্যায়

প্রকাশ-কেন্দ্র : বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, আশুতোষ ভবন
কলিকাতা-৭০০০৭৩

গ্রাহক চাঁদা : সত্তর টাকা (পাঁচ বৎসরের জন্য)। চেক, ব্যাংক-ড্রাফ্‌ট ইত্যাদি Pro-Vice-Chancellor (B.A. & F.), Calcutta University-র নামে লিখিত এবং সচিব, কলা ও বাণিজ্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সমীপে প্রেরিতব্য।

মূল্য : প্রতি সংখ্যা পনর টাকা (ডাক মাসুল স্বতন্ত্র)

প্রাপ্তিস্থান : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন বিক্রয় কেন্দ্র,
আশুতোষ ভবন, কলিকাতা-৭০০০৭৩

সূচীপত্র

BĀNGLĀ SĀHITYA PATRIKĀ

Research Journal of the Department of Bengali
University of Calcutta
Vol. VII
1982

Edited by

Professor Asit K. Banerjee, M.A., Ph. D.
Saratchandra Chatterjee Professor of Bengali,
Calcutta University

Published by
Sri Dilip Mukhopadhyay
for and on behalf of the Department of Bengali,
Calcutta University at Asutosh Building,
Calcutta-700073

Price : Rs. 15/- each copy

Subscription (For 5 years) : Rs. 70/-

প্রয়াত অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু

১৯২০-১৯৮১

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগের খয়রা অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান ডঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু ১৯৮১ সালের ২ নভেম্বর রাত্রি ৩-১৫ মিনিটে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার অকাল অবসানে আমরা একজন ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও বন্ধুকে হারাইলাম। যদিও তিনি ভাষাতত্ত্ব বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন এবং বাংলা বিভাগে দুই-চারিটি ক্লাস লইতেন, তবু তাঁহাকে আমরা আপনজন বলিয়া মনে করিতাম, কারণ তিনি আমাদের বিভাগের পুরাতন ছাত্র।

১৯২০ সালে কলিকাতায় দ্বিজেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন, ১৯৪১ সালে সংস্কৃতে অনার্স সহ বি. এ. পাস করেন এবং ১৯৪৪ সালে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হন। ১৯৬১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্যর রাসবিহারী ঘোষ ট্রাভেলিং ফেলোশিপ' লাভ করিয়া বিলাত যাত্রা করেন এবং ১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে "Study of Early Vedic Words of Social Groups" শীর্ষক গবেষণা করিয়া পি-এইচ. ডি. উপাধি লাভ করেন। কর্মজীবনে ভারতীয় নৃতত্ত্ববিভাগে (১৯৫১-১৯৫৩), বিশ্বভারতীতে ভাষা বিজ্ঞানের অধ্যাপনায় (১৯৫৩-৫৪) এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগে অধ্যাপকরূপে নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন (১৯৫৪-১৯৬৩)। তাহার পরে উক্ত বিভাগের রীডার (১৯৬৪-১৯৭৮), পরিশেষে খয়রা অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান হইয়া (১৯৭৭) তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করেন। ভারত ও ভারতের বাহিরে ভাষাবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞান-সংক্রান্ত নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁহার অন্তরঙ্গ যোগ ছিল। বিশ্বভারতী, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ভারতীয় ভাষাতাত্ত্বিক সম্মেলন, আন্তর্জাতিক জাতিতত্ত্ব ও নৃতাত্ত্বিক সম্মেলনে উক্ত-বিষয়ে প্রদত্ত বক্তৃতা ও আলোচনায় তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় রহিয়া গিয়াছে। তাঁহার 'বাংলা ভাষার আধুনিকত্ব ও ইতিকথা' গ্রন্থটি সুপরিচিত। আমাদের 'বাংলা সাহিত্য পত্রিকা'তেও তাঁহার অনেকগুলি মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ইংরেজি ভাষায় রচিত তাঁহার ভাষাতত্ত্ব-সংক্রান্ত প্রবন্ধ-নিবন্ধও সুধীসমাজে সুপরিচিত। 'Indian Linguistics Researches', 'Functional Analysis of Old Bengali Structures', 'A Functional Study of the Bengali Formatives' প্রভৃতি পুস্তক-পুস্তিকায় তাঁহার পরিশ্রম ও প্রতিভার বিশেষ পরিচয় রহিয়াছে। ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক ইংরেজি পত্র-পত্রিকায় তাঁহার রচিত বিশটিরও অধিক মৌলিক প্রবন্ধ রহিয়া গিয়াছে। তাঁহার গুণমুগ্ধ ও অনুরাগী বন্ধু-বান্ধব এবং ছাত্র-ছাত্রীরা সেগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়া তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনে ত্রুটি করিবেন না,

ইহাই আশা করা যায়। ডঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার রচনার মধ্য দিয়া আমাদের মধ্যে জীবিত থাকিবেন ইহাই কাম্য।

কিছুদিন ধরিয়া তাঁহার ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে আসিবার আমাদের সুযোগ ঘটিয়াছিল। বাংলা বিভাগের গবেষণা-পরিষদের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক আনুকূল্যে যে আঞ্চলিক বাংলা ভাষার অভিধান সংকলন ও প্রকাশনার চেষ্টা চলিতেছে তিনি ছিলেন তাহার উপদেষ্টা, নির্দেশক ও প্রধান সহায়ক। তাঁহার অকাল অবসানে এই প্রকল্পের নিদারুণ ক্ষতি হইল। আঞ্চলিক ভাষা ও সমাজপরিপ্রেক্ষিত বিন্যাস ও সংকলনের কাজে আমরা যে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছি তাহার মূলে ছিল তাঁহার অদম্য উৎসাহ ও প্রেরণা। তিনি বিভাগীয় বিষয়ে অতি-ব্যস্ততার মধ্যেও আমাদের গবেষকদের উপদেশ দিয়া, হাতেকলমে কাজ শিখাইয়া দুরূহ কর্ম অনেকটা সহজ করিয়া আনিয়াছিলেন। এখন অভিধান-সংক্রান্ত সমস্যা দেখা দিলে, জটিলতা সৃষ্টি হইলে গ্রন্থিমোচনের জন্য কাহার উপদেশ প্রার্থনা করিব জানি না।

স্নিগ্ধ ব্যবহার, শান্ত চরিত্র, অনুদ্বেজিত আচরণ এবং স্থিতধী মনঃপ্রকৃতি তাঁহাকে আমাদের অতি-নিকটে আনিয়াছিল, আকস্মিক মৃত্যু আসিয়া তাহাতে ব্যবধান সৃষ্টি করিল। যে উদারনৈতিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি আমাদের জীবন ও আচার-আচরণ হইতে একালে প্রায় অদৃশ্য হইতে বসিয়াছে, দ্বিজেন্দ্রনাথের সমগ্র সত্তায় তাহার বিচিত্র প্রকাশ ঘটিয়াছিল। শুধু অধ্যাপকরূপে নহে, মনুষ্যত্বের দিক হইতেও তাঁহার স্মৃতি আমাদের হৃদয়ে অম্লান গৌরবে বিরাজ করিবে।

অ. কু. ব.

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা সাহিত্য পত্রিকা

সপ্তম বর্ষ

১৯৮২
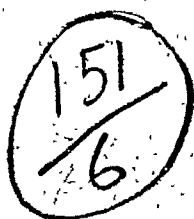
সম্পাদক : অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
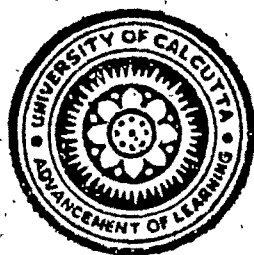
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ
কলিকাতা-৭০০০৭৩

রামকৃষ্ণ পরমহংস ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হরপ্রসাদ মিত্র

রবীন্দ্রনাথ যখন জন্মগ্রহণ করেন, রামকৃষ্ণ পরমহংস তখন প্রায় পঁচিশ বছরের নবযুবক। পরমহংসদেব যখন লোকান্তরিত হন রবীন্দ্রনাথ তখন পঁচিশ উত্তীর্ণ হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালে রামকৃষ্ণ ছিলেন দক্ষিণেশ্বরের পূজারী ব্রাহ্মণ গদাধর চট্টোপাধ্যায় মাত্র—রানী রাসমণির শ্রদ্ধালালিত অলৌকিক এক শক্তিসাধক। ব্রাহ্মসমাজের কেশবচন্দ্র সেনই ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৪এ জানুয়ারী পরমহংসদেবের কতকগুলি উক্তি সংগ্রহ ক'রে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ থেকে প্রথম 'পরমহংসের উক্তি' নামে প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথের জন্মবর্ষেই রানী রাসমণির মৃত্যু হয় এবং সেই বছরেই এক ভৈরবী ব্রাহ্মণী (যোগেশ্বরী বা যজ্ঞেশ্বরী) দক্ষিণেশ্বরে এসে রামকৃষ্ণকে তন্ত্রসাধনায় চালিত করেন এবং তাঁকে 'অবতার' বলেন। তখন রামকৃষ্ণের উন্মাদবৎ অবস্থা। তার দু'বছর আগে তেইশ বছর বয়সে তিনি স্বগ্রাম হুগলী জেলার কামারপুকুরে অসুস্থ অবস্থাতেই ফিরেছেন কিছুদিনের জন্যে,—এবং সেই বৈশাখেই সন্নিহিত জয়রামবাটী গ্রামের রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা সারদামণির (তখন বয়স মাত্র পাঁচ বছর) সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ১৮৬১ থেকে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তাঁর অনেক রকম ধর্মসাধনা সমাপ্ত হয়। ১৮৬৪-তে অদ্বৈতসাধক তোতাপুরী তাঁকে বেদান্তসাধন দিয়ে 'রামকৃষ্ণ' নামও দিয়ে গেছেন। ১৮৭৫-এর প্রথম দিকে বেলঘরিয়ায় জয়গোপাল সেনের বাগানবাড়িতে কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে তাঁর প্রথম আলাপ হয়। ১৮৭৯-তে কেশবচন্দ্র পরমহংসদেবের সন্তানবৎ মাতৃসাধনায় গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই আগষ্ট রামকৃষ্ণ বাদুড়বাগানে বিদ্যাসাগরের বাসস্থানে গিয়ে দেখা করেন। তার কিছু আগে ১৮৮২-র ২৬এ ফেব্রুয়ারী 'শ্রীম' বা মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের কাছে প্রথম যান। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর কলকাতায় ভক্ত অধরলাল সেনের বাড়িতে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। সেকালের নানা মনীষী ও বিদ্বজ্জনের সঙ্গে পরমহংসদেবের সাক্ষাৎ ঘটেছিল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁদের অন্যতম। হিন্দু-কলেজে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহপাঠী ছিলেন রানী রাসমণির জামাতা মথুরানাথ বিশ্বাস—যাঁকে রামকৃষ্ণ 'সেজোবাবু' বলতেন। অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' গ্রন্থপর্যায়ের চতুর্থ খণ্ডে লিখেছেন যে, ১৮৬৭-তে দেবেন্দ্রনাথের বয়স যখন পঞ্চাশ বছর এবং পরমহংসদেবের একত্রিশ, সেই সময়ে মথুরানাথের সঙ্গে রামকৃষ্ণ দেবেন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে দেখা করেন। রোমাঁ রোলাঁর 'Life of Sri Ramkrishna' (১৯২৪) বইয়ে 'শ্রীম'-রচিত কথামৃত অবলম্বনেই এই সাক্ষাতের বিবরণ আছে। কথামৃতের প্রথম ভাগেই এই সাক্ষাতের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথের

আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে পরমহংসদেবের স্বীকৃতি দেখা যায় এবং সেই সঙ্গে এক ধরনের সভ্যভব্য সাজ-সজ্জায় দেবেন্দ্রনাথ যে রামকৃষ্ণকে মাঘোৎসবে আসতে বলেছিলেন, তাও জানা যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্বন্ধে তাঁর জীবিতকালে কী ধারণা পোষণ করতেন সে বিষয়ে কৌতূহল খুবই স্বাভাবিক। প্রসঙ্গটি সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে।

'শ্রীম'-রচিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' চতুর্থ খণ্ডে দেখা যায় যে, ২রা মে ১৮৮৩ তারিখে নন্দনবাগান ব্রাহ্মসমাজে (কাশীশ্বর মিত্রের বাড়িতে) রামকৃষ্ণ গিয়েছিলেন এবং সেখানে একতলার বৈঠকখানায় তিনি যখন উপস্থিত হন, তখন একে-একে ব্রাহ্ম ভক্তরা আসেন। সেইসূত্রেই পাওয়া যায়—"শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র (ঠাকুর) প্রভৃতি ঠাকুরবংশের ভক্তগণ এই উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন।" তারপর দ্বিতলে উপাসনা-কক্ষে পরমহংসদেবকে নিয়ে যাওয়া হয়। রবীন্দ্র (ঠাকুর) যদি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই হয়ে থাকেন, তাহলে তিনি সেই উপাসনাস্থলে সেদিন গিয়েছিলেন কিনা, তার উল্লেখ নেই, শুধু এইটুকু পাওয়া যায় যে, অনেকেই সেখানে গিয়েছিলেন,—অনেকে আবার ঠিক উপাসনাস্থলে নাও গিয়ে থাকতে পারেন। তবে এই খবরটুকু দেওয়া হয়েছে যে—"সন্ধ্যার সময় উৎসবের উপাসনা আরম্ভ হইবে। আদি ব্রাহ্মসমাজের শ্রীযুক্ত ভৈরব বন্দ্যোপাধ্যায় দু-একটি ভক্তসঙ্গে বেদীতে বসিয়া উপাসনা কার্য সম্পন্ন করিবেন।" পরমহংসদেব কথায়-কথায় সেদিন একথাও বলেছিলেন যে—

> "একজন ভক্ত বাবলা গাছ দেখে ভাবাবিষ্ট হয়েছিল।—এই মনে করে যে এই কাঠে ঠাকুর রাধাকান্তের বাগানের জন্য কুড়ুলের বাঁট হয়।
>
> "একজন ভক্তের এরূপ গুরুভক্তি যে গুরুর পাড়ার লোককে দেখে ভাবে বিভোর হয়ে গেল।
>
> "মেঘ দেখে—নীল বসন দেখে—চিত্রপট দেখে—শ্রীমতীর কৃষ্ণের উদ্দীপন হতো। তিনি এইসব দেখে উন্মত্তের ন্যায় 'কোথায় কৃষ্ণ' বলে ব্যাকুল হতেন।"

রামকৃষ্ণ-দেবেন্দ্র সাক্ষাৎকার যখন প্রথম ঘটে, তখন রবীন্দ্রনাথ ছিলেন নিতান্তই বালক। সে-বৃত্তান্ত রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের স্মৃতিতে স্পষ্ট না থাকবারই কথা। তবে, এ-বিষয়ে ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮২ সংখ্যার 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীবিশ্বনাথ রায়ের 'মহর্ষি-রামকৃষ্ণ সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গ এবং রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি' অনুসন্ধিৎসু পাঠকের অবশ্যই পঠনীয়। ২১-এ নভেম্বর, ১৯২৯ তারিখে 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিয়ু' পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথ সেই চিঠি লেখেন। তাতে পূর্বোক্ত সাক্ষাৎকারে নিবেদিতার উপস্থিতির উল্লেখ আছে—যা ১৮৬৭-তে বা তার কাছাকাছি সময়ে অসম্ভব ছিল। নিবেদিতা প্রথম ভারতে আসেন ১৮৯৮-এ। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের সেই চিঠিতে তথ্যগত বিভ্রম সুস্পষ্ট। অতএব সে-চিঠির বিশেষ কোনো গুরুত্ব নেই। তবে বিশ্বনাথবাবু সেই চিঠি ছেপে দিয়ে জিজ্ঞাসু পাঠকের

উপকার করেছেন। তিনি মনে করেন, ১৮৬৬-তে অথবা ১৮৬৯-এ দেবেন্দ্র-রামকৃষ্ণ সাক্ষাৎকার ঘটে।

রবীন্দ্রনাথের ১৩১৮ সালের নিবন্ধ 'রূপ ও অরূপ' তাঁর 'সঞ্চয়' বইটির অন্তর্ভুক্ত হয় এবং রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ-গ্রন্থাবলীর পঞ্চদশ খণ্ডের উল্লেখপঞ্জীর মধ্যে এই প্রবন্ধের একটি অংশ রামকৃষ্ণ-সম্পর্কিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই নিবন্ধের মূল কথা হোলো জগতে মানুষের চেতনায় 'রূপ' স্থিরত্বের ইঙ্গিত,—সীমিত দেশে-কালে রূপের বোধ জাগে,—রবীন্দ্রনাথের কথায়—"এই পৃথিবীকে আমরা ক্ষুদ্রকালের মধ্যে বদ্ধ করিয়া দেখিতেছি বলিয়াই ইহাকে ধ্রুব বলিয়া বর্ণনা করিতেছি—ধরণী আমাদের কাছে ধৈর্যের প্রতিমা। কিন্তু বৃহৎকালের মধ্যে ইহাকে দেখিতে গেলে ইহার ধ্রুবরূপ আর দেখি না, তখন ইহার বহুরূপী মূর্তি ক্রমেই ব্যাপ্ত হইতে হইতে এমন হইয়া আসে যে, আমাদের ধারণার অগোচর হইয়া যায়।" এই আলোচনাসূত্রেই রবীন্দ্রনাথ লেখেন—"যাঁহারা অনন্তের সাধনা করেন, যাঁহারা সত্যকে উপলব্ধি করিতে চান, তাঁহাদিগকে বারবার একথা চিন্তা করিতে হয়, চারিদিকে যাহা কিছু দেখিতেছি জানিতেছি ইহাই চরম নহে, স্বতন্ত্র নহে, কোনো মুহূর্তেই ইহা আপনাকে আপনি পূর্ণ করিয়া প্রকাশ করিতেছে না—যদি তাহা করিত তবে ইহারা প্রত্যেকে স্বয়ম্ভু স্বপ্রকাশ হইয়া স্থির হইয়া থাকিত।" অতঃপর রবীন্দ্রনাথের আরও মন্তব্য—"অতএব আধ্যাত্মিক সাধনা কখনোই রূপের সাধনা হইতে পারে না। তাহা সমস্ত রূপের ভিতর দিয়া চঞ্চল রূপের বন্ধন অতিক্রম করিয়া সত্যের দিকে চলিতে চেষ্টা করে।" এই নিবন্ধেই 'ভাবুক' আর 'পূজক' দুটি শব্দের ইঙ্গিতগত পার্থক্য দেখিয়ে, 'পূজক'-এর নিকৃষ্টতা বা নিম্নতর সীমাবদ্ধনের কথা বলা হয় এবং রবীন্দ্রনাথ লেখেন—"এই বন্ধন মানুষকে এতদূর পর্যন্ত বন্দী করে যে, শুনা যায় শক্তিউপাসক কোনো একজন বিখ্যাত ভক্ত মহাত্মা আলিপুর পশুশালায় সিংহকে বিশেষ করিয়া দেখিবার জন্য অতিশয় ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছিলেন—কেননা "সিংহ মায়ের বাহন।" শক্তিকে সিংহরূপে কল্পনা করিতে দোষ নাই—কিন্তু সিংহকেই শক্তিরূপে যদি দেখি তবে কল্পনার মহত্ত্ব চলিয়া যায়।" আলিপুর পশুশালায় রামকৃষ্ণ কখনো সিংহ দেখে অভিভূত হয়েছিলেন কিনা, সে বিবরণ গবেষণা-সাপেক্ষ,—তবে, ১৮৮৩-র ২১এ জুলাই তিনি যদুলাল মল্লিকের বাড়িতে সিংহবাহিনীর প্রতিমা দেখে তন্ময় হন।

সে যাই হোক, যদি এই মন্তব্য রামকৃষ্ণের প্রতি উদ্দিষ্ট হয়ে থাকে, তাহলে একথা বলতেই হয় যে, রামকৃষ্ণের ভাবনায় সাকার-নিরাকার উভয়েরই সাগ্রহ স্বীকৃতি ১৩১৮ সালেও রবীন্দ্রনাথের নজর এড়িয়ে গেছে। একথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। মনে পড়ে, ১৩৪২ সালে রামকৃষ্ণ-জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে এই রবীন্দ্রনাথই লিখেছিলেন—

বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা।

তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে
নূতন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে,
দেশবিদেশের প্রণাম আনিল টানি
সেথায় আমার প্রণাম দিলাম আনি।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এ স্বামী রঙ্গনাথানন্দ রামকৃষ্ণ-বিবেকান
যা লেখেন, পরে একটি পুস্তিকায় তা প্রকাশিত হয়। এখানে সেই মর
প্রাসঙ্গিক। তিনি লেখেন সেই বিশ্বব্যাপী ঐক্যের চেতনার কথা—যা শ্রী
কথামৃতের অজস্র সরস আখ্যানে, উক্তিতে, গানে-গানে ছড়িয়ে আছে।
বইয়ের প্রথম ভাগে ১৮৮২-র কথায় 'শ্রীম'-র সঙ্গে দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারে পর
এক মায়ের পাঁচ ছেলের কথা তুলে জানান যে বাড়িতে মা—"কারও জ
পোলোয়া, কারও জন্য মাছের অম্বল, মাছের চড়চড়ি, মাছ ভাজা,
করেছেন। যেটি যার ভাল লাগে। যেটি যার পেটে সয় বুঝলে?" ব
প্রথম ভাগেই ১৮৮২-র ৬ই মার্চের কথায় হনুমানের রামভক্তির প্রসঙ্গ
এইরকম অজস্র সাকার-উপাসনার কথা পরমহংসদেব বারবার বলে গেছেন
তিনি বলেছেন—যার যেমন সয়,—সাকার, নিরাকার দুই ভাবই সত্য
আসল কথা।

এই দিক থেকে দেখলে নিরাকার ধ্যানের সঙ্গে মূর্তিপূজার কোনো বিরে
যিনি পূজক তিনিই ভাবুক। স্বামী রঙ্গনাথানন্দ লেখেন—"The one
all existence is the message which Vedanta teaches. The im
implication of this message in life and thought is another gr
which seems to run counter to the very spirit of religious s
nism, but which breathes truly the scientific spirit. As
Vivekananda expresses it, 'To the Hindu, man is not tr
from error to truth, but from lower to higher truth' (C
Works, Vol. 1, Eleventh Edition, p. 17). If truth is like a p
the philosophical understanding of Unity is its apex. Viewe
this supreme height, no aspect of life or effort can appear as
erroneous ; for truth itself is the goal of all paths. It is ch
the application of this great idea to the pressing prob
modern life that the life and message of Sri Ramakrishna and
Vivekananda are supremely significant "[১]

রূপ ও অরূপ,—সাকার ও নিরাকার—এই দুই পক্ষের সামঞ্জস্য যে মানুষে
শান্ত বোধদৃষ্টিতে দেখা অসম্ভব নয়, সেকথা কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর নানা রচনায়
করেছেন। প্রমত্ততা নয়, শান্ততা চাই। 'শান্তিনিকেতন'-এর 'সামঞ্জস্য'

মনে পড়ে—যার একটি বাক্যে রবীন্দ্রনাথ লেখেন—"আনন্দের মধ্যে সমস্ত বোধের পরিপূর্ণতা—মন ও হৃদয়ের, জ্ঞান ও ভক্তির অখণ্ড যোগ।"

'সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' (প্রথম মুদ্রণ ১৩৫৯, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৩৭৫) বইটির উল্লেখ উপস্থিত প্রবন্ধে অনিবার্য। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস এই বইয়ের ভূমিকায় লেখেন—"শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে অনেকে ধ্যানে ও কল্পনার সাহায্যে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাব ভক্তির আতিশয্যে পূরণ করিতে চাহিয়াছেন। ......আমাদের এই বইখানি ডকুমেণ্টারি ইতিহাস, উপন্যাস বা ধারাবহিক জীবন-কাহিনী নয়। এই ইতিহাসেব আরম্ভ ১৮৭৫ সনের ২৮এ মার্চ কেশবচন্দ্র-পরিচালিত 'ইণ্ডিয়ান মিরারে' প্রকাশিত সংবাদ হইতে। ইহার পূর্বে পরমহংসদেবদেব সম্বন্ধে কোনও লিখিত বা মুদ্রিত উল্লেখ পাই নাই। এই ইতিহাসের জের দীর্ঘকাল চলিয়াছে, আজিও অন্ততঃ একজন জীবিত আছেন যিনি তাঁহাকে দেখিয়াছেন এবং তাঁহার কথা হয়ত এখনও শেষ করেন নাই, তিনি বিবেকানন্দ-সহোদর শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত—মহিম। চোখে দেখিলেও তাঁহার বক্তব্যের তিনি নাম দিয়াছেন "অনুধ্যান"। তিনি ভক্ত না হইয়া লেখক হইলে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ লিখিয়া আমাদিগকে বিপদে ফেলিতে পারিতেন।" এই ইঙ্গিতটি ঠিক বোঝা যায় না, কারণ, লেখক মহেন্দ্রনাথ দত্ত [জন্ম: ২৯-এ শ্রাবণ, ১২৭৫—মৃত্যু: ২৮-এ আশ্বিন ১৩৬৩] তাঁর 'শ্রীমৎ সারদানন্দ স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী—প্রথম খণ্ড' প্রভৃতি বইয়ে কাউকেই কোনোভাবে বিপন্ন করেননি। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান' [পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ: ১৩৮৬] বইটি চমৎকার। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বসু-সম্পাদিত এই বইটিতে মহেন্দ্রনাথ দত্তের রামকৃষ্ণ-সম্পর্কিত স্মৃতিকথা খুবই উল্লেখযোগ্য। পূর্বোক্ত বইয়ে সম্পাদকদ্বয় রামকৃষ্ণদেবের তিরোধানের পূর্বে কেশবচন্দ্র সেন প্রকাশিত "পরমহংসের উক্তি" (২৪ জানুয়ারি, ১৮৭৮),—সুরেশচন্দ্র দত্ত প্রকাশিত চব্বিশ পৃষ্ঠার "পরমহংস রামকৃষ্ণের উক্তি", ১ম ভাগ। ১২৯১ (২৩ ডিসেম্বর ১৮৮৪),—রামচন্দ্র দত্তের 'তত্ত্বসার' (বৈশাখ ১২৯২ (১৮৮৫),—রামচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত "তত্ত্ব-প্রকাশিকা" প্রথম খণ্ড (২০. ৬. ১৮৮৬)—এই চারটির নাম করেছেন এবং সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও দিয়েছেন। রামকৃষ্ণের তিরোধানের পরে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের "রামকৃষ্ণ পরমহংসের উক্তি ও সংক্ষিপ্ত জীবন" (দ্বিতীয় সংস্করণ ২৫ ফেব্রুয়ারী ১৮৯৪),—রামচন্দ্র দত্তের ২১০ পৃষ্ঠার "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত" (৮ই জুলাই ১৮৯০),— সচ্চিদানন্দ গীতরত্ন কর্তৃক প্রকাশিত, পরমহংসদেবের উক্তি ৩য় ভাগ (১৮৯২)—"রামচন্দ্রের বক্তৃতাবলী" (নং ১-১৮: ১৮৯৩-৯৭),—রামচন্দ্র দত্তের বক্তৃতা উপলক্ষে ১৮৯৩ থেকে ১৮৯৭-এর মধ্যে গীত "রামকৃষ্ণ সংগীত",—অক্ষয়কুমার সেনের "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি" (১৮৯৪-১৯০১: বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশিত),—সত্যচরণ মিত্রের ১৯২ পৃষ্ঠার "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

পরমহংস" (জীবনী ও উপদেশ) (৯, অক্টোবর ১৮৯৭) ইত্যাদি অনেকগুলি পুস্তক-পুস্তিকার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি আছে। এইসব গ্রন্থের মধ্যেই ১৩৫০ বঙ্গাব্দের ফাল্গুনে প্রকাশিত মহেন্দ্রনাথ দত্তের "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান"-এর উল্লেখ আছে এবং সেই বইয়ের 'নিবেদন' থেকে তুলে দেখানো হয়েছে—"পরমহংস মশাই মাঝে মাঝে, বোধ হয় ১৮৮২ বা ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগ পর্যন্ত, রামদাদার বাড়িতে আসিয়া অনেক কথাবার্তা কহিয়াছেন। ...অতি সামান্যভাবে যাহা আমার স্মরণে আছে, তাহা এ স্থলে বিবৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছি।" স্বামী সারদানন্দের জীবনী সম্পর্কিত মহেন্দ্রনাথের বইটির ১৫ পৃষ্ঠায় 'পরমহংস মহাশয়কে' নরেন্দ্রনাথের প্রথম দর্শনের বিবরণ আছে,—তাছাড়া এই বইটিতে আরো অনেক তথ্য আছে।

রবীন্দ্রনাথ ১২৯২ সালের শ্রাবণে ও ভাদ্রে প্রায় যুগপৎ 'ভারতী'তে ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়' তাঁর একটি বিশেষ চিন্তা প্রকাশ করেন—যা প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রজীবনী'র প্রথম খণ্ডেই (চতুর্থ সংস্করণ বৈশাখ, ১৩৭৭ : ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দ) পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধটির নাম 'সাকার ও নিরাকার উপাসনা'—আধুনিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত 'সাকার ও নিরাকার' (আশ্বিন, ১৩০৫) নয়। এই শেষোক্তটি যতীন্দ্রমোহন সিংহ প্রণীত 'সাকার ও নিরাকার তত্ত্ব' সম্পর্কিত আলোচনার আলোচনা। এটিও প্রাসঙ্গিক। কিন্তু আগে প্রভাতকুমারের পূর্বোক্ত নির্দেশসূত্রগুলি দেখা যাক। তিনি প্রথমেই ১২৯১ সালটা বাংলার সামাজিক ইতিহাসে নানা কারণে স্মরণীয় বলে ৮ই জানুয়ারী ১৮৮৪ (২৫ পৌষ ১২৯০) ৪৬ বছর বয়সে কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর পরে হিন্দু সমাজে নতুন প্রাণের সঞ্চার এবং আদিব্রাহ্মসমাজে বিশেষ কর্মতৎপরতার উল্লেখ করেন। হিন্দুসমাজে বঙ্কিমচন্দ্র তখন নব জাতীয়তার আন্দোলনের যাজ্ঞিক। রামকৃষ্ণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সেকালের মনোভাব প্রসঙ্গে আসবার আগে ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কিত তখনকার পরিস্থিতি প্রভাতকুমারের ভাষাতেই দেখা যাক। তিনি লেখেন—"যে-শাখা দেবেন্দ্রনাথের সমাজসংস্কার-বিরোধী মনোভাবের জন্য তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে কেশবচন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া তথাকথিত গুরুবাদের আশঙ্কা দেখা দিল। তখন তরুণ সাম্যবাদী দল কেশবচন্দ্রকে ত্যাগ করিয়া নূতন যে 'সমাজ' গঠন করিলেন (১৮৭৮), তাহার ভিত্তি স্থাপিত হইল যুক্তিবাদ ও নিয়মতান্ত্রিকতার উপর—শাস্ত্র নয়, মহাপুরুষ নয়, সঙ্ঘ হইল নিয়ামক। এই সমাজের অন্যতম নেতা কৃষ্ণকুমার মিত্র 'সঞ্জীবনী' নামে সাপ্তাহিক প্রকাশ করিলেন (১৮৮১), তাহার 'মটো' বা মন্ত্র ছিল, 'সাম্য মৈত্রী, স্বাধীনতা'—ফরাসী বিপ্লবের বুলি। ইহারা ছিলেন উগ্র সমাজ-সংস্কারক, সংস্কারকের সকল দোষ এবং গুণ সমভাবে ইহাদের মধ্যে ছিল।" এই উগ্রতাই নেতাদের সঙ্গে জনসাধারণের ব্যবধান ঘটিয়ে দেয়। আবার প্রভাতকুমারের ভাষায়—"ইহাই হইল ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার তিন বৎসরের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ ও উদারনীতির মুখপত্ররূপে সঞ্জীবনী (১৮৮১) ও হিন্দুসমাজ সনাতনী নীতির মুখপত্ররূপে বঙ্গবাসী

(১০ ডিসেম্বর ১৮৮১) আবির্ভূত হইয়াছিল।" অনতিবিলম্বে ১২৯১ বঙ্গাব্দে হিন্দুসমাজের 'নবজীবন' ও 'প্রচার' পত্রিকা বেরোয়। আদি-ব্রাহ্মসমাজ নিরাকার পরমেশ্বরের আরাধনায় বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁরা হিন্দু শাস্ত্রানুসন্ধানে ব্যাপৃত থেকে মনে করতেন যে তাঁদের ধর্মমতই মূল হিন্দুধর্মসম্মত, কেশবচন্দ্রের অসবর্ণ-বিবাহ-আন্দোলন (১৮৭২) তাঁরা সমর্থন করেননি, বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ-আন্দোলনও তাঁরা সমর্থন করেন নি। রাজনারায়ণ বসুর 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব' পুস্তিকা বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন-পত্রিকায় অভিনন্দিত হয় বটে, তবে—"উহার বক্তব্য বিষয় হিন্দুদের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে স্বীকৃত হইতে পারে না একথা লেখেন বঙ্কিমচন্দ্র।" হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যার কাজে নিজেকে নিযুক্ত রেখে বঙ্কিম—"কোম্‌ত্ প্রমুখ পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদের মতের সহিত গীতার" মতের সমন্বয় সাধনে ব্রতী হন ব'লে প্রভাতকুমার মন্তব্য করেছেন এবং গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীর "শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙ্গলার স্বদেশী যুগ" বইয়ের ১১ পৃষ্ঠার পাদটীকা থেকে যা উদ্ধৃত করেছেন, তা উপস্থিত প্রবন্ধের পাদটীকায় দেওয়া হোলো।[২] অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে 'পজিটিভিজম্'-এর বাংলা নাম ব্যবহৃত হয় 'বৈজ্ঞানিক ধর্ম'। এই 'বৈজ্ঞানিক ধর্ম' ব্যাখ্যান ও অন্যান্য কারণে নব্য হিন্দু ও আদিব্রাহ্মসমাজের মধ্যে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', 'বঙ্গবাসী', 'সঞ্জীবনী' অবলম্বনে বাদ-প্রতিবাদ দেখা দেয়। 'প্রচার' ও 'নবজীবন' পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে ১২৯১ সালের শ্রাবণে যা আলোচনা করেন, সেই ১২৯১-এর আশ্বিনে রবীন্দ্রনাথ আদি-ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক হয়ে 'প্রচার'-এর বঙ্কিম-লিখিত প্রবন্ধটির বিরুদ্ধ সমালোচনা করেন 'একটি পুরাতন কথা' নামে—সেই ১২৯১ সালেরই 'ভারতী' পত্রিকায়। এই লেখাটি বিশ্বভারতী-প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর 'অচলিত' : দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত এবং 'সমালোচনা' (১২৯৪) বইটিতে তৎপূর্বে প্রকাশিত হয়। অতঃপর এইসূত্রে রবীন্দ্র-বঙ্কিম বাদানুবাদের প্রসঙ্গ এখানে অনাবশ্যক। ১৮৮৫-তে রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই কলুটোলায় বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়িতে যেতেন। বঙ্কিমের অনুরোধে শশধর তর্কচূড়ামণির বক্তৃতা শুনতে রবীন্দ্রনাথ একদিন অ্যালবার্ট হলে যান। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তর্কচূড়ামণির আজগুবী ধর্মব্যাখ্যানেরও বিরোধী ছিলেন এবং ব্রাহ্মদের সম্বন্ধে বা বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ আন্দোলন সম্বন্ধেও তিনি অনুকূল ছিলেন না। এসব প্রসঙ্গ অনেকেই দেখিয়েছেন। অতএব এ-বিষয়ে বাগ্‌বিস্তার নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এইসূত্রেই 'সত্যদর্শী গ্রন্থমালা'—১ পর্যায়ে স্বর্গত প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের "পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ" [মাঘ, ১৩৬০] পুস্তিকাটি—যাতে অচিন্ত্যকুমারের "পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ" বইটির কোনো-কোনো অংশের প্রতিবাদ ছাপা হয়েছিল, সেটিও উল্লেখযোগ্য। তাতে রামকৃষ্ণের সঙ্গে বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, কেশবচন্দ্র সেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রাহ্মসমাজের সম্পর্ক বিষয়ে কিছু আলোচনা আছে, রবীন্দ্রনাথের কথা নেই।

'সাকার ও নিরাকার উপাসনা' নামে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের প্রসঙ্গে প্রভাতকুমারের এই কথাগুলি অতঃপর দেখা দরকার। তিনি লেখেন—"আমরা পূর্বে বলিয়াছি, শশধর তর্কচূড়ামণি ও নব্য হিন্দুদল ব্রাহ্মসমাজের মূলভিত্তি নিরাকার উপাসনা-তত্ত্বের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসের নানা দেবদেবীর মূর্তি-পূজার মধ্য দিয়া গভীর আধ্যাত্মিক শক্তিলাভহেতু নিরাকারতত্ত্বের অসারতা যেন প্রমাণিত হইল। শিক্ষিত সমাজের মধ্য হইতে রব উঠিল 'নিরাকার উপাসনা হিন্দুধর্মের বিরোধী' এবং সাকার উপাসনাই হিন্দুত্বের লক্ষণ। এই মতবাদ লইয়া ব্রাহ্ম ও হিন্দুদের মধ্যে তীব্র সমালোচনা চলিতেছিল, রবীন্দ্রনাথ এই আলোচনায় যোগদান করিলেন। তিনি 'সাকার ও নিরাকার উপাসনা' নামে এক প্রবন্ধ লিখিয়া উহা ভারতী ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রায় যুগপৎ প্রকাশ করিলেন (শ্রাবণ ও ভাদ্র ১২৯২)।"[৩]। একথা আগেই দেখা গেছে। 'একটি পুরাতন কথা'তে রবীন্দ্রনাথ প্রবলভাবে 'সত্যে'র জয়গান করেন,—'লোকহিতে'র চেয়ে 'সত্য'ই শ্রেয়তর আশ্রয়, সে-কথাও জানান এবং 'ধর্মের' মধ্যে যে এক 'অত্যন্ত বৃহত্ত্ব' আছে—"যাহাতে সমস্ত জাতি একত্রে বাস করিয়াও তাহার বায়ু দূষিত করিতে পারে না", সে-কথাও লেখেন। তিনি লেখেন—"মানুষের প্রধান বল আধ্যাত্মিক বল। মানুষের প্রধান মনুষ্যত্ব আধ্যাত্মিকতা।" বলা বাহুল্য, এইসব মন্তব্যের কোথাও প্রত্যক্ষ ভাবে রামকৃষ্ণের প্রতি কোনো কটাক্ষ ছিল না।

প্রভাতকুমার 'সাকার ও নিরাকার উপাসনা'র সূত্র ধরে রবীন্দ্রনাথের সেই নব-যৌবনের পর্বে কবির এই উক্তিটি সঙ্গতভাবেই তুলে দেখিয়েছেন যে—"হিন্দুধর্মের শিরোভূষণ যাঁহারা, আমরা তাঁহাদের নিকট হইতে ধর্মশিক্ষা লাভ করি। অতএব ব্রাহ্ম ও হিন্দু বলিয়া দুই কাল্পনিক বিরুদ্ধ পক্ষ খাড়া করিয়া যুদ্ধ বাধাইয়া দিলে গোলাগুলির বৃথা অপব্যয় করা হয় মাত্র।"—এবং কথায়-কথায় 'আর্য-ধর্ম-প্রচারিণী সভা' (১২৭৯) ও 'ধর্মপ্রচার পত্রে'র (১২৮২) কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের (১২৫৮-১৩০৯) প্রসঙ্গ উত্থাপন ক'রে সেকালের অবতারবাদের উৎসাহ-আতিশয্যে ১২৯০ সালে সেই কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন যে নিজেকে 'কল্কি অবতার' বলে ঘোষণা করেন, প্রভাতকুমার সে-প্রসঙ্গও দেখিয়েছেন, কারণ, ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে 'অবতার'-ধারণার প্রভাব যে তথাকথিত শিক্ষিত সমাজেও তখন কী রকম ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল, সে-বিষয়ে প্রিয়নাথ সেন-কে লেখা 'কড়ি ও কোমল'-এ গ্রন্থভুক্ত 'পত্র' কবিতাটির কয়েক ছত্র তুলে দেখাতে তাঁর স্বভাবতই আগ্রহ ঘটে। সেই ছত্রগুলি সুপরিচিত—

খুদে খুদে আর্যগুলো ঘাসের মতো গজিয়ে ওঠে,
ছুঁচোলো সব জিভের ডগা কাঁটার মতো পায়ে ফোটে।
তাঁরা বলেন "আমিই কল্কি" গাঁজার কল্কি হবে বুঝি!
অবতারে ভরে গেল যত রাজ্যের গলি ঘুঁজি।

রামকৃষ্ণ ও রবীন্দ্রনাথ—সে-পর্বে এই দুই অসম কিন্তু বিশিষ্ট পুরুষের ভাবগত সাদৃশ্য নির্ণয়ের প্রয়াস অবান্তর, কারণ, দুজনে ছিলেন দুই পৃথক পথের পথিক। ব্রাহ্ম-সমাজের কেশবচন্দ্র সেন কলকাতা টাউন-হলে ১৮৭৯-র ২১-এ জানুয়ারীর বক্তৃতায় নিজেকে অনুপ্রেরিত ভবিষ্যদ্বক্তা না বললেও অদ্বিতীয় একক ব্যক্তি ('a singular person') বলেছিলেন—প্রভাতকুমারের আলোচনাতেই তা পাওয়া যায়। এবং এই অদ্বিতীয়তা যে গুরুবাদেরই নামান্তর, প্রভাতকুমার তাও জানিয়েছেন তাঁর এই মন্তব্যে—"নববিধান সমাজে বিশিষ্ট মানব বা আচার্যবাদ গুরুবাদেরই সমতুল্য।" রবীন্দ্রনাথ তখনো 'গুরুদেব' ছিলেন না এবং গুরুবাদের তিনি বরাবরই বিরোধী ছিলেন বললে ভুল হয় না।

পূর্বোক্ত 'কড়ি ও কোমল'-এর 'পত্র' কাবতাটিতে 'আর্য' শব্দের প্রয়োগে সেকালের অত্যুৎসাহের যেমন নিন্দা দেখা গেছে—সেই সূত্রে একথাও স্মরণীয় যে 'শ্রীমান দামু বসু এবং চামু বসু সম্পাদক সমীপেষু"-তে 'বসু' বলতে চন্দ্রনাথ বসু ও 'বঙ্গবাসী'র যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু-ই (১২৬১-১৩১২) ছিলেন বিশেষ লক্ষ্যস্থল। তরুণ চন্দ্রনাথ বসু (১৮৪৪-১৯১০) হিন্দু-কলেজের তখনকার প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র-সম্মেলনে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 'মরকত-কুঞ্জে' যখন প্রথম রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যান, তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স ছিল মাত্র পনেরো বছর,—সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলের নামে-মাত্র ছাত্র তিনি,—চন্দ্রনাথের বয়স তখন একত্রিশ বছর,—রাজনারায়ণ বসু তখন সেই সম্মেলনীর অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা—এবং সেই অধিবেশনেই আটত্রিশ বছর বয়স্ক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথ প্রথম দেখেন। সেই কবিতায় এই কটাক্ষ ছিল—

নাই বটে গোতম অত্রি যে যার গেছে সরে,
হিঁদু দামু চামু এলেন কাগজ হাতে করে।
(আহা দামু আহা চামু।)
লিখছে দোঁহে হিঁদু শাস্ত্র এডিটোরিয়াল,
দামু বলছে মিথ্যে কথা, চামু দিচ্চে গাল। (হায় দামু হায় চামু।)

রবীন্দ্রনাথের লেখা ১২৯৩ সালের মাঘ সংখ্যার 'ভারতী'তে হেঁয়ালি-নাট্যে,——'কল্পনা' বইটির 'উন্নতিলক্ষণ' কবিতায়,—'একান্নবর্তী পরিবার', 'স্বপ্নবিচার', 'আশ্রম পাড়া', 'গুরুবাক্য' (হাস্য কৌতুক), 'নূতন অবতার' (ব্যঙ্গ কৌতুক) প্রভৃতি রচনায় শশধর তর্কচূড়ামণির তথাকথিত বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে এবং অবতারবাদের বিরুদ্ধে কটাক্ষ ক'রে নানা মন্তব্য করা হয়।

অবতার-ধারণা নিয়ে রামকৃষ্ণের তিরোধানের পরেও অনেক তর্ক-বিতর্ক চলেছে বটে, তবে বর্তমান শতকের প্রথম দশকে এবং তার আগেই বিশেষত কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, স্বামী বিবেকানন্দ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং

আরো অনেকের আলাপ-আলোচনা, ভাষণ ও রচনার ফলে সেই কটাক্ষের ও বিতর্কের ধারা ক্ষীণ হয়ে গেছে। ১৩২০ সালের 'প্রবাহিণী' পত্রিকায় ২০এ ফাল্গুন পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 'ভগবান রামকৃষ্ণ' নামে যে প্রবন্ধ লেখেন, তার প্রথম দিকেই গীতার উক্তি উল্লেখ ক'রে ধর্ম সংস্থাপনের জন্যে অবতারের অভ্যুদয়ের কথা ছিল। ইংরেজ শাসনের ফলে আমাদের সমাজে ইংরেজি শিখেই অনায়াসে অর্থোপার্জনের সুযোগ ঘটা,—এবং ফলে,—"সমাজে কাঞ্চন-কৌলীন্যের" প্রসঙ্গ ওঠে। তারপর, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়—"ইংরেজী শিক্ষার প্রথম ও দ্বিতীয় আমলে আমরা সব ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিয়াছি। ধর্ম, সমাজ, মনুষ্যত্ব—সর্বস্বই চূর্ণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এই সর্ববিধ্বংসিনী প্রবৃত্তির প্রতিক্রিয়া হইল ব্রাহ্ম সমাজের উদ্ভবে। গঙ্গার তরঙ্গে যেমন ঐরাবত ভাসিয়া গিয়াছিল,—সে বেগ সামলাইতে পারে নাই, তেমন ব্রাহ্ম-সমাজও ইউরোপের বিলাসের স্রোতে ভাসিয়া গেল।" তারপর সেবাব্রত দেখিয়ে দেবার জন্য রামকৃষ্ণের আবির্ভাব। পাঁচকড়ির কথায়—"তিনি সামঞ্জস্যের পূর্ণাবতার। সকল সাধনার সামঞ্জস্য বিধান করিয়া তিনি বাঙ্গালায় শান্তিরাজ্য স্থাপনের বনিয়াদ গড়িয়া দিয়াছেন।"[৪]

রামকৃষ্ণ ও রবীন্দ্রনাথ এই দুজনের সাক্ষাৎ সম্পর্ক সত্যিই সাধারণ লোকচক্ষুতে খুবই ক্ষীণ। রবীন্দ্রনাথ যখন আদিব্রাহ্মসমাজের কতকটা উৎসাহী কর্মী ও প্রবক্তার ভূমিকায় বিদ্যমান, তার আগেই কেশবচন্দ্র সেনের নববিধান-সমাজ স্থাপিত হয়। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬-এ জানুয়ারী কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্মকে 'নববিধান' নাম দেন। কিন্তু তার আগে থেকেই ১৮৫৭ থেকে ১৮৬৬-র মধ্যে তাঁরই নেতৃত্বে একেশ্বরবাদ, স্বাধীন বিবেকবুদ্ধির প্রতি আগ্রহসঞ্চার এবং সমাজে সাম্প্রদায়িকতা ও নর-নারী ভেদবোধ পরিহার করার উদ্যম ঘটে। ১৮৭৮-এ 'সকল ধর্ম সত্য',—কেশবচন্দ্র প্রভৃতির এই উদার মনোভাবের সঙ্গে অন্যান্য কারণ যুক্ত হয়ে ব্রাহ্মদের মধ্যে বাদ-প্রতিবাদ দেখা দেয়—যার ফলে ঘটে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ'। ফলে, ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে প্রথম পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই চারটি সম্প্রদায় জন্মগ্রহণ করে—১। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ বা আদিব্রাহ্মসমাজ, (২) ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ বা নববিধান ব্রাহ্মসমাজ (৩) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, (৪) নিরপেক্ষ ব্রাহ্মসমাজ।[৫] সতীকুমার চট্টোপাধ্যায় সংক্ষেপে লিখেছেন—"কেশবচন্দ্র ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১ জানুয়ারী সমগ্র পৃথিবীর ধর্মসম্প্রদায়ের নেতা ও রাষ্ট্রপতিগণকে ভ্রাতৃত্বে মিলিত হইবার জন্য একটি লিপি প্রেরণ করেন। তাহাই নববিধানের স্বরূপ প্রকাশ করে। নববিধান ঘোষণার ১৩ বৎসরের ভিতর শিকাগো শহরে ধর্মমহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। নববিধান-ব্যাখ্যাতা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সেই সভায় উপস্থিত হইয়া জগৎবাসীকে নববিধানের বার্তা স্মরণ করাইয়া দেন।"[৬] আমি কোনো ভবিষ্যদ্বক্তা 'প্রফেট' নই—যীশুর মতন নই, কিন্তু নিঃসন্দেহে আমি অসামান্য মানুষ—একথা ব্রহ্মানন্দ ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে সমাজের বার্ষিক উৎসবের

ভাষণে নির্দ্বিধায় বলেন। তিনি একথাও বলেন যে বিগত কুড়ি বছর ধ'রে—অর্থাৎ ১৮৫৯ থেকেই ঈশ্বরের ও ভারতের সেবায় তিনি নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিলেন। ব্রাহ্ম-সমাজের বার্ষিকীগুলির সংকলয়িত্রী শ্রীমতী এস. ডি কলেট ব্রহ্মানন্দের এইসব উক্তি আত্মগৌরব প্রচারের অবিশ্বাস্য ও যন্ত্রণাদায়ক উক্তি বলে মন্তব্য করেন। সে-বছর কেশবচন্দ্রের উদ্দীপনা বেড়ে যায়। তিনি অনেকগুলি বক্তৃতা দেন, তাছাড়া ব্রাহ্ম বিদ্যালয় পুনরায় চালাতে আরম্ভ করেন। কলকাতা টাউন হলে সেই বছরেই ৯ই এপ্রিল তিনি এক বক্তৃতা দেন—'India asks—who is Christ?' এবং তাতে যীশুকে এশিয়ার মানুষ এবং পাশ্চাত্ত্য চিন্তানায়কের চেয়ে যীশুর মধ্যে হিন্দু যোগীর লক্ষণই যে বেশি ছিল, সে-কথাও বলেন। যীশু যে বলেছিলেন—আমি ও আমার পিতা পৃথক নই, আমরা উভয়ে একেরই অভিব্যক্তি,—এই কথাটি তাঁর খুব ভাল লাগে। তাঁর নিজের কথায়—"the doctrine of divine humanity is essentially a Hindu doctrine." রামকৃষ্ণের গভীর মমতায় তিনি যে উত্তরোত্তর খুবই আকৃষ্ট হচ্ছিলেন, তাতে সন্দেহ কোথায়? দেব-দেবী পূজাকে পৌত্তলিকতা বলে সর্বৈব উড়িয়ে দিতে তিনি ক্রমেই কুণ্ঠাবোধ করেন। 'Sunday Mirror'-এ (১, অগস্ট ১৮৮০) প্রকাশিত 'The Philosophy of Idol-worship' এই মন্তব্যের সমর্থক। পরের বছর ১০ই অক্টোবর (১৮৮১) ব্রাহ্ম-মন্দিরে বিশেষ প্রার্থনার পরে তিনি সবান্ধবে সশিষ্যমণ্ডলী দক্ষিণেশ্বরে যান রামকৃষ্ণের কাছে। কেশবচন্দ্র যে কতোদূর অভিভূত হয়েছিলেন রামকৃষ্ণের সঙ্গলাভ ক'রে, তার নির্ভরযোগ্য কিন্তু সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পাওয়া যায় শিবনাথ শাস্ত্রীর 'History of the Brahmo Samaj' (বর্তমান এক খণ্ডে সম্পূর্ণ) বইটিতে।[৭] এইসঙ্গে একথাও স্মরণীয় যে রবীন্দ্রনাথের পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে মূলত মনে-প্রাণে হিন্দু ছিলেন,—পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে দর্শনে তাঁর অধিকার থাকলেও তিনি যে প্রাচ্য অধ্যাত্মবোধেরই শ্রেষ্ঠত্ব মানতেন, সে-প্রসঙ্গও এই বইয়ে এবং অন্যত্র পাওয়া যায়।[৮] কেশবচন্দ্র যখন অন্তিম শয্যায়, তখন তাঁর বাসগৃহ 'কমল কুটীরে' দেবেন্দ্রনাথও তাঁকে দেখতে যান, রামকৃষ্ণও দেখতে যান।[৯] 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে'র দ্বিতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ আছে। অন্যত্রও আছে। দ্বিতীয় খণ্ডের মধ্যেই যে 'সপ্তম খণ্ড', তাতে পূর্বকথা আলোচনাসূত্রে দক্ষিণেশ্বরে বসেই পরমহংসদেবকে এইসব বলতে হয়েছিল যে—"একদিন ধ'রে বসলুম, দেবেন্দ্র ঠাকুরের বাড়ি যাব।" সেজোবাবু—অর্থাৎ মথুরানাথ বিশ্বাস ছিলেন দেবেন্দ্রনাথের সহপাঠী (পৃঃ ৬১-৬২)। সে-প্রসঙ্গ আগেই দেখা গেছে। 'শ্রীম' অন্যান্য ক্ষেত্রেও দেবেন্দ্রনাথ-রামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ রেখে গেছেন। তবে সে-সব কথা সম্পূর্ণ প্রীতিকর নয়। দেবেন্দ্রনাথ সেই ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দেও রামকৃষ্ণ পরমহংসের সারল্য ও সর্বধর্মবরণের মহিমা বুঝতে পারেননি ব'লে মনে হয়। নিজের অভিমানে, সংস্কারে তিনি হয়তো বেশি আবদ্ধ ছিলেন বলেই পরমহংসদেবের অসামান্যতা, তাঁর অকৃত্রিমতা দেবেন্দ্রনাথের কাছে যথাযোগ্য সমাদর পায়নি। হয়তো

কিঞ্চিৎ কঠোর হলেও একথা মাননীয় যে, রবীন্দ্রনাথের ওপর তাঁর পিতৃদেবের প্রভাব ছিল সর্বাধিক। দেবেন্দ্রনাথের কাছে রবীন্দ্রনাথ সুফী-কবিদের সূক্তিও অবশ্যই শুনে থাকবেন ব'লে অধ্যাপক সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন।[১০] রামমোহনের ধর্মমত বেদান্ত-আশ্রিত ছিল এবং তাঁর কাছে—"বেদান্তের ভূমিকারূপেই উপনিষদের মূল্য।" রামমোহন তান্ত্রিক আচার, স্মার্ত আচার-বিচার,—ইসলামের একেশ্বরবাদ মেনে-ছিলেন। অধ্যাপক সেনের কথায়—"দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রামমোহনের সাক্ষাৎ শিষ্য, ব্রহ্মবাদের নেতৃত্বে রামমোহনের অব্যবহিত দায়াদ। দেবেন্দ্রনাথ ফারসী পড়িয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার চিত্তভূমি হাফেজের মতো কবি ও সুফী সাধকদের চিন্তারসে অভিষিক্ত হইয়াছিল। অধ্যাত্মভাবনায় আনন্দের অর্থাৎ ভক্তি-প্রেমের স্থান রামমোহনের ভক্তিবাদে একেবারেই ছিল না। দেবেন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তায় তাহা মুখ্য হইল। সুতরাং দেবেন্দ্রনাথ বেদান্তসূত্র ত্যাগ করিয়া উপনিষদ্‌কেই শাস্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।"[১১] সে যাই হোক্, 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে'র চতুর্থ ভাগে ১৮৮৪-র ৭ই সেপ্টেম্বরের কথায় ভক্ত অধরলাল সেনের ও নিরঞ্জনের সঙ্গে আলাপে রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যা বলেছিলেন, সেসব মন্তব্যও অকুণ্ঠ সমাদরের নয়—যদিও এইটুকু পাওয়া যায়—"তবে সংসারীরা একেবারে ডুবে থাকে, তাদের তুলনায় [দেবেন্দ্রনাথ] খুব ভাল—তাদের শিক্ষা হবে।" অতীতের সেই সাক্ষাতের সময়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতৃদেব ও রামকৃষ্ণের কাছে সত্যিই উপস্থিত ছিলেন কিনা জানা নেই। উপস্থিত থাকলেও রবীন্দ্রনাথের সে-সব কথা হুবহু মনে থাকবার নয়। দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে রামকৃষ্ণের ধারণা পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথের অজানা ছিল না এবং পিতৃদেব সম্বন্ধে সমালোচনায় তিনি ক্ষুণ্ণ হয়ে থাকবেন। বিশ্বনাথবাবুর পূর্বোক্ত প্রবন্ধটিতে—পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ যে সেই সাক্ষাৎকার নির্ভুলভাবে স্মরণ করতে পারেননি, তার উল্লেখ আছে। হয়তো এইসব কারণেই পরমহংসদেবের সাকার-নিরাকার সমীকরণ আদি-ব্রাহ্মসমাজের উৎসাহী কর্মী হিসেবেই তাঁর কাছে বিশেষ রুচিকর ছিল না। তাই রামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একটিও প্রবন্ধ লেখেননি—তাঁর এই মৌনীভাব উত্তরকালের পক্ষে লক্ষণীয় এক প্রশ্নচিহ্ন নয় কি? তবে একথা ঠিকই যে ১৯৩৭-এর ৩রা মার্চ রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকীতে সভাপতির অভিভাষণে পরমহংসদেব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন—"I venerate Paramahamsa Deva because he in an arid age of religious nihilism proved the truth of our spiritual heritage by realising it, because the largeness of his spirit could comprehend seemingly antagonistic modes of Sadhana, and because the simplicity of his soul shunes for all time the pomp and pedantry of pontiffs and pundits." অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু এটি দেখিয়েছেন এবং শ্রীবিশ্বনাথ রায়ের পূর্বোক্ত প্রবন্ধে এই উদ্ধৃতি ব্যবহৃত হয়েছে। তাছাড়া তত্ত্ববোধিনীতে দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 'পরমহংস রামকৃষ্ণদেব ও আদিব্রহ্মসমাজ' নামে যে প্রবন্ধে আদিব্রাহ্মসমাজের সেকালের আচার্য

ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তব্য অনুসারে লেখেন—'পরমহংসদেব একজন ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষ', তারও উল্লেখ করেন।

যতীন্দ্রমোহন সিংহের 'সাকার ও নিরাকার-তত্ত্ব' সম্বন্ধে ১৩০৫ সালে রবীন্দ্রনাথ যে আলোচনা করেন, সেটির উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। তাতে যতীন্দ্রমোহন জানান যে, নিরাকার উপাসনা অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথ খুবই সঙ্গত ভাবে তার প্রতিবাদ করেন, নিরাকারবাদী ব্রাহ্ম বা অন্য ধর্মের ভক্ত মানুষ যে অবশ্যই থাকতে পারেন, সেই সমালোচনায় তিনি সে-কথা জানান এবং প্রায় পরমহংসদেবের মতোই এই লেখাটির এক জায়গায় জানান—"আমরা যাহাকে সাকার উপাসনা বলি তাহাতেই বা দোষ কী? নিরাকার যখন পূর্ণভাবে মনের অগম্য তখন তাঁহাকে সুগম আকারে পূজা করাই ভালো।" এই অনাসক্ত শুদ্ধ দৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের প্রথম যৌবনে ছিল না মনে করা ঠিক নয়। উপস্থিত প্রবন্ধের তা মোটেই প্রতিপাদ্য নয়। রূপ থেকে অরূপের দিকে যাবার সাধনা কি তাঁর 'চতুরঙ্গ'-তেও না পাওয়া যায়? তাঁর গানে গানে,—তাঁর অসংখ্য কবিতায় তা ব্যক্ত হয়নি কি? শেষ-জীবনে তিনি যখন 'মালঞ্চ' উপন্যাস লেখেন (আশ্বিন-অগ্রহায়ণ, ১৩৪০ 'বিচিত্রা' এবং গ্রন্থাকারে ১৩৪০ চৈত্রে প্রকাশিত), তখন ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে রমেন-কে আদিত্যের চিঠি পড়তে দেখা যায়—যে-চিঠি আদিত্যের রোগজীর্ণা স্ত্রী নীরজাই 'ঠাকুরপো'-কে পড়তে দিয়েছে, যাতে সরলা সম্বন্ধে নীরজাকে আদিত্য জানিয়েছে—"ওদের ঋণ শোধ করতে পারব না কোনোদিন, ওর দাবিরও অন্ত থাকবে না আমার পরে। তোমার সঙ্গে কখনও যাতে ওর দেখা না হয় সে চেষ্টা রইল মনে। কিন্তু আমার সঙ্গে ওর সম্বন্ধ যে বিচ্ছিন্ন হবার নয়, সে-কথা আজ যেমন বুঝেছি এমন আর আগে কখনও বুঝি নি।" সেই পরিচ্ছেদেই নীরজাকে পরমহংসদেবের ছবির দিকে তাকিয়ে দুহাত জোড় করে প্রার্থনা করতে দেখা গেছে।

এই একটি দৃশ্যেই পরমহংসদেব যে আর্তের, দুঃখীর, নিরাশ্রয়ের কতো বড়ো আশ্রয় ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কি তা দেখিয়ে যান নি? সমস্ত পূর্ব-প্রতিবন্ধকতা উত্তীর্ণ হয়ে রবীন্দ্রনাথ গল্পে নয়,—কবিতাতেও ততোটা আনুষ্ঠানিকতা-বর্জিত সহজ প্রেরণায় নয়,—প্রবন্ধেও নয়—কিন্তু এখানেই পরমহংসের প্রতি তাঁরও প্রণতি জানিয়ে গেছেন।

১। 'Sri Ramakrishna and Universal Religion' : Swami Ranganathananda (The Ramakrishna Mission Institute of Culture, Calcutta 1968. pp. 8-9.)

২। "One of the two branches of the Hindu Revival in Bengal headed by Pandit Sasadhar Tarkachuramani and Kumar Sree Krishnaprasanna Sen......the other movement led by Babu Bankim Chandra Chatterjee as its theologian and Babu Chandranath Bose as its essayist and critic and Nabin Chandra Sen as its

epic poet······Nabajiban (The New life) a journal was started as the organ of Neo-Hinduism. Evidently the view on man and the Universe held by thinkers like Mill, Spencer and Darwin, have vitally affected Bankim Chandra's interpretation of Hindu religion and philosophy ; but the profoundest influence of all has been that of Auguste Comte, whose Positive Polity and Religion unconsciously appear in almost everything that our author has to say on domestic, social and political ideals and institutions and the creation and conservation of national life specially in his novels Devi Chaudhurani and Ananda Math."—New Essays in Criticism (1903) Pp. 88, 89, 92 : Dr. Brajendranath Seal.

৩। 'রবীন্দ্র জীবনী' : ১ম খণ্ড, পৃ: ২১০ (চতুর্থ সংস্করণ) দ্রষ্টব্য।

৪। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলী (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ : দ্বিতীয় খণ্ড) দ্রষ্টব্য।

৫। 'ভারতকোষ' ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৭৯-৮০ দ্রষ্টব্য।

৬। তদেব।

৭। 'History of the Brhmo Samaj' (Second Edition : 1974) pp. 198-200.

৮। তদেব, পৃ: ১১৯-২০ দ্রষ্টব্য।

৯। তদেব, পৃ: ২৬০ দ্রষ্টব্য।

১০। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত খণ্ড) দ্রষ্টব্য।

১১। তদেব।

ধর্মচিন্তায় রামমোহন *

(পরিবেশ ও উৎস)

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী

ধর্ম নিয়ে আজকের যুগে অনেক জিজ্ঞাসা। জিজ্ঞাসাটি সমাজের দিক থেকে, রাষ্ট্রের দিক থেকে, বিজ্ঞানের দিক থেকে, অর্থনীতির দিক থেকে। তবে এ জিজ্ঞাসা পূর্ব মীমাংসার 'ধর্মজিজ্ঞাসা' নয়, প্রশ্নবোধক চিহ্নের মত খোপানসী খড়্গ। পাশ্চাত্য জগতে ধর্মের উপর সে খড়্গের আঘাত নেমে এসেছে অনেক আগেই।

এর কারণ, পাশ্চাত্য জগতের লোকস্থিতির আদর্শ ভিন্ন। অর্থ ও কাম তাঁদের মুখ্য পুরুষার্থ; ঐহিক অভ্যুদয় তাঁদের জীবনের চরম লক্ষ্য। তাঁদের ধর্মচিন্তা চিরকাল অর্থ ও কামচিন্তার অধীন। সেখানে ধর্মপাল রাজ্যপালের মুখাপেক্ষী।

ভারতবর্ষে তেমনটি হতে পারে নি। ভাবতবর্ষও অভ্যুদয়কে উপেক্ষা করে নি। ভারতবাসীর চতুর্বর্গ—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। কিন্তু লোকস্থিতির লক্ষ্য ভিন্নতর বলেই এখানে চতুর্বর্গের অর্থ ও কাম, ধর্ম ও মোক্ষের নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রিত। এখানে ধর্ম উপসর্গের মত পূর্বে বসে অর্থ ও কামের ধাত্বর্থকে পরিবর্তিত করে দিয়েছে, আবার মোক্ষ পশ্চাতে থেকে অর্থ ও কামের রূপতত্ত্বে ভিন্ন তাৎপর্য এনে দিয়েছে। ধর্মই ভারতীয় জীবনের 'জীবাতু'।

আমাদের সৌভাগ্য, যিনি নবযুগের নতুন 'ভারতপন্থ', সেই তীক্ষ্ণধী রাজা রামমোহন রায়ও ছিলেন সেই ধর্মতরুর ফল। নব্যপন্থী রামমোহন আমরণ শাস্ত্রপন্থী।

কিন্তু রামমোহনের জীবন-বিচারে গোড়া থেকেই গড়ে উঠেছে একটি বস্তুমুখী ধারা। অনেকেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করেছেন তাঁর সমাজচেতনা, রাষ্ট্রভাবনা, অর্থনৈতিক চিন্তা ও লোকহিতকর কর্মের দিক থেকে। অর্থাৎ ধর্মবাহ্য ইহজীবনমুখী যে চিন্তা আধুনিকতার মূল, রামমোহনকে তার পুরোভাগে স্থাপন করে আমরা শ্লাঘা অনুভব করেছি। ভুলে গিয়েছি, তিনি প্রথমত ভারতবাসী, তাঁর সকল চিন্তা, সকল কর্মের ভিত্তি ধর্ম। ধর্মকে উপলক্ষ্য করেই তাঁর স্বাতন্ত্র্যের উন্মেষ, ধর্মকে কেন্দ্র করেই তাঁর পিতার সঙ্গে, গ্রামবাসীর সঙ্গে বিরোধ; সর্বশেষে শহর কলিকাতায় দেশসুদ্ধ দেশমুখ্য ধর্মাচার্যদের সঙ্গে বিতর্কে তার নিজস্ব ধর্মমতের প্রতিষ্ঠা। রামমোহনের পিতা বিষয়ী বৈষ্ণব রামকান্ত রায় চেয়েছিলেন, পুত্র হবে বৈষয়িক ব্যবহারশাস্ত্রে দক্ষ। আরবী-ফারসী পড়ানোর উদ্দেশ্য ছেলেকে মুসলমানী হাদীসে (ব্যবহার শাস্ত্রে) পারদর্শী করে তোলা; সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্য হিন্দুর দায়ভাগ ও নীতিশাস্ত্রে তাঁকে নিপুণ করে তোলা। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস, হাদীস পড়তে গিয়ে তিনি

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত ১৯৮০ সালের রামমোহন রায় স্মারক বক্তৃতামালার একাংশ।

হদিস পেলেন ইসলামী ধর্মদর্শনের ; মনু-জীমূতবাহন পড়তে গিয়ে মনে গেঁথে নিলেন বেদান্ত উপনিষদের শঙ্কর-ভাষ্য। ধর্মানুসন্ধিৎসাই রামমোহনের জীবন-চর্যার ধ্রুবপদ।

বীরবল প্রমথ চৌধুরী রামমোহনের social consciousness-এর উপর গুরুত্ব দিয়েও স্বীকার করেছেন, "তাঁর ধর্মবুদ্ধির পরিচয় না দিলে তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা অঙ্গহীন হয়।" শিবনাথ শাস্ত্রীও বলেছেন, "রামমোহন রায় ধর্মবিহীন শিক্ষাকে বড় ভয় পাইতেন।" রাজার জীবনীকার কুমারী কলেট আরও জোর দিয়ে বলেন, "he was above all and beneath all a religious personality."

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বঙ্গে, এমন কি রামমোহনের শৈশবকাল পর্যন্তও এদেশে ধর্ম ছাড়া মানুষের জীবনকে ভাবনা করা সম্ভব ছিল না। ধর্ম-কর্মের রূপ যা-ই হোক্, ইতিহাসের উন্মেষকাল থেকে রাঢ়-বঙ্গ-পুণ্ড্র ধর্মচক্রেই আবর্তন করেছে। আদিম যুগে ছিল তন্ত্রচর্যা। শিব-শক্তি তার অধিদেবতা, সহ-জ বৃত্তি কাম ও ভোগ তার সাধন। এই তন্ত্রচর্যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল জৈনধর্মের কঠোর কৃচ্ছ্র সাধনা, আরও পরবর্তীকালে মহাযানী বৌদ্ধদের পারমিতা যোগ। আর্য অভ্যাগমের পরে এদেশ ব্রাহ্মণ্য পৌরাণিক ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে ; এসেছে বৈদিক কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান, দশবিধ সংস্কারের বন্ধন, এসেছে ঐশ্বর্যপ্রধান বৈষ্ণবধর্ম। সমাজকে বাঁধার চেষ্টা করা হয়েছে আর্য শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র ও ধর্মসূত্রের বন্ধনে। তার ভিতরেও আদ্য তান্ত্রিকতা লুপ্ত হয়নি। বৈষ্ণব পাঞ্চরাত্র মতে শক্তিবাদের প্রভাব পড়েছে, জৈনদের কঠোর 'অনুব্রত' 'মহাব্রত'কে আত্মসাৎ করে গড়ে উঠেছে শৈব নাথপন্থী হঠযোগ, বৌদ্ধধর্মও তন্ত্রস্পৃষ্ট হয়ে 'কমল-কুলিশ যোগ'কে (শূন্যতা ও করুণার যোগ) স্বীকার করে নিয়েছে। শাস্ত্রীয় ও অশাস্ত্রীয় শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ ধর্মাচার থেকে এ দেশ কখনও বিচ্ছিন্ন হয়নি। যাবতীয় করণ 'ধামার্থে'।

তুর্কী বিজয়ের পরে জবরদস্তিতে কিছু বাঙালী হিন্দু ধর্মান্তরিত হয়েছে। অবশিষ্ট যারা, তারা বহির্বিশ্ব থেকে বিযুক্ত হয়েছে, কিন্তু ধর্মহীন হয়নি। শম্বুকবৃত্তি অবলম্বন করে, সঙ্কোচের বহু আবরণে ধর্মকে আবৃত করে ঘরের মধ্যেই তারা বিচিত্র ধর্মাচরণ করেছে। লোকায়ত ধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের মেলবন্ধনে গড়ে উঠেছে বাংলার 'মঙ্গল-দেবতা'। মুসলমান ধর্মান্তরিতকরণের প্রতিরোধে 'লোকনিস্তারের' লক্ষ্যে ভাষায় সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থ অনুবাদের প্রেরণাও জেগেছে। তবে ধর্মে এসেছে শিথিলতা ও প্রাণহীনতা : 'ধর্মকর্ম করে সভে এই মাত্র জানে।' এর ভিতর সমাজে ভেদের প্রাচীর গড়ে তুলেছে বিদ্যা, কুল ও কাঞ্চন-কৌলীন্য : 'পণ্ডিত কুলীন ধনীর বড় অভিমান।' এই ভেদবুদ্ধিকে ভেঙে ফেলতে এলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, জ্বালালেন প্রেমধর্মের মশাল। তাতে প্রাণের ধর্মে জাতি জাগল, কিন্তু জাগল না শাশ্বত মানব-চৈতন্য। চৈতন্য-প্রবর্তিত 'রাগানুগা ভক্তি' লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ ও বীরভদ্রের প্রশ্রয়ে অন্যপথে ছুটে চলল। বিশুদ্ধ রাগাত্মিক মানবীয় রাগাশ্রিত প্রেমে পরিণত হয়ে নতুন সহজিয়া প্রেমসাধনের দ্বার মুক্ত করে দিল। ইতিমধ্যে বাঙালী আরও

কঠিনভাবে বাঁধা পড়ল স্মার্ত রঘুনন্দনের 'অষ্টাবিংশতি তত্ত্বে'র নিগড়ে আর কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের তন্ত্রদীক্ষার শৃঙ্খলে। বাংলার নব্য ন্যায় সূক্ষ্ম-বিচারের পথ খুলে দিলেও ধর্ম বিচারভ্রষ্ট হয়ে, হয়ে উঠল আচারসর্বস্ব। ধর্ম রইল, কিন্তু নিগড়-পিষ্ট জীবনে সে ধর্ম হল বহ্বাচারের বাহন ও মুক্ত জীবনের পরিপন্থী।

এই ত গেল হিন্দু ধর্মজীবনের কথা। মধ্যযুগে যে তুর্ক-আফগান-মোগল এদেশ শাসন করেছেন, তাঁরাও ধর্মহীন ছিলেন না। তাঁদের ধর্মশাস্ত্র-কোরাণ-হাদীস। কেউ কেউ এই শাস্ত্রের নির্দেশ মেনেছেন অক্ষরে অক্ষরে; তাঁরা হলেন এমাম, মোল্লা, মৌলানা, হাজী, কাজী, গাজী। আবার কেউ কেউ স্বাধীন বিচারের পথে শাস্ত্রকে গ্রহণ করেছেন; তাঁরা হলেন মোতাজিলা, ফালাসিফা। এঁদেরই ভিতর একদল হলেন প্রেমপন্থ সুফী, তাঁরা মেনেছেন প্রাণের ধর্ম। এঁরা সকলেই শরীয়তকে মেনেছেন, মেনেছেন ইস্‌লামী তৌহিদ—খুদার এককত্ব ও একাধিপত্য। বাঙালী মুসলমানদের ভিতর আর এক শ্রেণীর মুসলমান আছেন—বে-শরা পীর-ফকির-সাঁই-দরবেশ। তাঁরা আক্ষরিক ভাবে শরীয়তী বিধান মানেন না, কিন্তু তাঁদের আছে 'কেরামতি' (অলৌকিক সিদ্ধি) আর তুক্‌তাক্ মন্ত্রে অধিকার। বাংলার গ্রাম্য গুণীন, সাপের রোজা, ভূতের ওঝা বেশীরভাগ এসেছেন এই বেশরা গোষ্ঠী থেকেই। মসজিদে মসজিদে ভোরের আজানে, নামাজে, রোজায়, ঈদ পরবে, মহরমের মিছিলে, গ্রাম্য গুণীনের মন্ত্রাবেশে, দরগার সিন্নি বাঁটায়, সুফীদের প্রেমগীতিতে মুসলমান ধর্মের পরিচয় মিলে। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম বঙ্গের মুসলমানদের সজীব চিত্র এঁকেছেন।

হিন্দু ও মুসলমানধর্ম পরস্পর বিপরীতমুখী হলেও, এরই ভিতর হিন্দু ও মুসলমানে মিলনও ঘটেছে। সমীকরণের ফলে নতুন দেবতার উদ্ভব হয়েছে। বাংলার দক্ষিণরায়, সত্যপীর, বনবিবি হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সৃষ্টি। সুফী প্রেম সাধনার সঙ্গে বৈষ্ণব প্রেম ও তান্ত্রিক সহজিয়াদের যোগে এদেশে নতুন বাউল সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে। হিন্দুর সঙ্গে যোগে ও বিয়োগে মুসলমানধর্ম আজও এদেশে সজীব। রামমোহনের ধর্ম ভাবনায় আদৌ সচেতন প্রভাব পড়েছে মুসলমানী একেশ্বরবাদীয় ধর্মের।

তা ছাড়া রামমোহনের জন্মের অনেক আগে থেকেই যে সকল বিদেশী বণিক বাণিজ্য ব্যপদেশে এদেশে এসেছেন, তাঁরাও নিতান্ত ধর্মভ্রষ্ট ছিলেন না। আর্মানী, পর্তুগীজ, দিনেমার, ওলন্দাজ প্রভৃতি বণিক যেখানেই কুঠি স্থাপন করেছেন, সেখানে গীর্জাও গড়ে উঠেছে। 'ব্যবসায়াত্মিকা' বুদ্ধি নিয়ে এলেও, Heathen-দের ভিতর খ্রীষ্টধর্মের আলো বিস্তার ও খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করাও ছিল এঁদের পবিত্র কর্তব্য। তাই প্রথমে সিরীয় খ্রীষ্টান, রোম্যান ক্যাথলিক সাধুসন্ত ও পরে প্রোটেস্টাণ্ট প্রচারকেরা এদেশে পাড়ি জমিয়েছেন, গীর্জাও স্থাপন করেছেন এবং দেশীয় লোকের দারিদ্র্য ও মূর্খতার সুযোগ নিয়ে লোভের জাল বিস্তার করে কালা আদমিদের খ্রীষ্টানও করেছেন। 'ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' প্রণেতা দোম আন্তোনীও ছিলেন বাঙালী। পর্তুগীজ প্রচারকেরা তাঁকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা দেন। রামমোহনের নিজের

দেশ হুগলীতেও ১৬৭৯-৮০ সালে পর্তুগীজ রোমান-ক্যাথলিকেরা কুঠি-গীর্জা স্থাপন করেন; চন্দননগর ছিল ফরাসী অধিকৃত ও শ্রীরামপুর দিনেমারদের কেন্দ্র। সেখানেও খ্রীষ্টধর্মের কর্মকেন্দ্র ছিল। কেবল ইংরেজ বণিকেরা ধর্মপ্রচারের ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত সতর্ক। লাভের ব্যবসায়ে স্বধর্ম প্রচারের লোভ যাতে বিন্দুমাত্র বাধা সৃষ্টি করতে না পারে, সেদিকে তাঁদের প্রখর দৃষ্টি ছিল। এদেশে তাঁদের ব্যক্তিগত ধর্মকার্য নির্বাহের জন্য ইংরেজ চ্যাপেলিন যে না এসেছেন, তা নয়; ইংরেজদের বিবাহাদি ক্রিয়াকর্ম তাঁরাই করতেন। কিন্তু চ্যাপেলিন থাকলেও ইংরেজদের চ্যাপেল (ভজনালয়) ছিল না। শোনা যায়, পুরনো ফোর্ট উইলিয়মে একটি মাত্র উপাসনা ঘর ছিল, সেটি কোম্পানীর কর্মচারীদের ভজনালয়ের কাজ করেছে। ঐতিহাসিক V. A. Smith বলেন, সুসমাচার প্রচারক দলের নেতা Wilberforce-এর আগ্রহাতিশয্যে এদেশে প্রোটেস্টান্ট ধর্ম প্রচারের উদ্যোগে দেখা দেয়। তার আগে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে যাঁরা এসেছেন, তাঁরা কোম্পানীর সহযোগিতা লাভ করেননি। ফলে কেরী-ওয়ার্ড-মার্শম্যানদের মত প্রচারকদের প্রথমে এদেশে কাজ করতে হয়েছে কোম্পানীর আওতার বাইরের এলাকা থেকে। পরে অবশ্য তাঁরা শহর কলিকাতাতেও প্রবেশ পথ পেয়েছেন এবং খ্রীষ্টধর্মের চর্চা, প্রচার ও প্রসার গুরুত্ব লাভ করেছে।

খ্রীষ্টধর্মের বহিরঙ্গ অনুষ্ঠানের রূপ প্রকাশ পেত খ্রীষ্টমাস ও নববর্ষ উৎসবে। কবিবর ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর 'বড়দিন', 'নববর্ষ' প্রভৃতি কবিতায় তার সুন্দর ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছেন। লোভ দেখিয়ে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের নিন্দা রামমোহন নিজেও করেছেন। পক্ষান্তরে খ্রীষ্টের নৈতিক আদর্শ যে সংসারী লোকের জীবন ও সমাজসেবার উপযোগী, রামমোহন তার সমর্থন করেছেন। রামমোহনের অভ্যুদয়-কাম ধর্ম ভাবনায় খ্রীষ্টীয় নীতির গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে।

এই ভাবেই যুগ চলে এসেছে রামমোহন পর্যন্ত। হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, খ্রীষ্টান হোক—সকলের জীবনেই ছিল ধর্মের বন্ধন। কোন কোন হিন্দু ধর্মান্তর গ্রহণ করেছে মান ও প্রাণের দায়ে, কেউ আবার ম্লেচ্ছাচার গ্রহণ করেছেন মুসলমান সুলতান-দের উচ্চপদ লাভ করে—যেমন হুসেন শাহের সাকর মল্লিক ও দবির খাস। কিন্তু তাঁরাও ধর্মহীন নন। চার্বাকের মত এদেশে পথ পায়নি। মধ্যযুগের 'জগাই-মাধাই' চার্বাক নয়, অনাচারী হিন্দু। ধর্মের বিরোধিতা করে এদেশে কোন চরিত্র বড় হয়ে ওঠেনি। অনমনীয় পুরুষকারের প্রতিমূর্তি চাঁদ সদাগর মনসা-বিরোধী হলেও, শৈবধর্ম তাঁর আশ্রয়। চাঁদের মনসা-বিরোধিতা যেন সর্পভীত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে একটি প্রবল শক্তির অভ্যুত্থান। কুসংস্কার দলনে রামমোহনের পৌরুষদৃঢ় ব্যক্তিত্ব যেন মধ্যযুগের সাধু চন্দ্রধরের প্রতিরূপ। রাজারও ধর্মীয় অভিযান প্রথাগত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে।

রামমোহনের জীবনবোধের সঙ্গে ধর্মবোধ ওতপ্রোত। এই বোধ কতখানি অনুভবসিদ্ধ, কতটুকু আধ্যাত্মিক এ প্রশ্ন অনেকেই তুলতে পারেন; রামমোহনের প্রতিবাদী দল সে প্রশ্ন সরবে তুলেছেন। কিন্তু সেই বোধের প্রতি একনিষ্ঠতা প্রশ্নের

অতীত। তাঁর ব্যবহারিক জীবনের সকল কর্ম নিয়ন্ত্রিত হয়েছে তাঁর ধর্মবিশ্বাসের অনুগত হয়ে। মনীষী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ঠিক এই কথাটিই বলেছেন :

"All attempts at reform, whether religious, social, political, or any other description, are based on faith in the ultimate triumph of truth and justice and humanity, which is synonymus with a belief in the moral government of the universe. This is an essential element in religious belief. ...As in his life, so in his writings, religion occupies the foremost place."

('Rammohan Roy and Modern India').

রাজা রামমোহনের এই ধর্মচিন্তার মূল ভাবটি কি? তাঁর বিভিন্ন রচনা, পত্রাবলী এবং বিশেষ করে ব্রাহ্ম সমাজের দানচুক্তিপত্র থেকে বলা চলে, ভূমাবোধ ও ভূমির মঙ্গল কামনায় রামমোহনের ধর্মচিন্তার বস্তু নিষ্কর্ষ হল,

১. একেশ্বরবাদ, ২. পৌত্তলিকতার নিরাকরণ ("The unity of God and absurdity of idolatry"), ৩. একেশ্বরবাদের ভিত্তিতে সর্বধর্মের মিলন ('Strengthening the bonds of union between men of all religious persuasions and creeds") এবং ৪. দান-দয়াদি লোকহিতকর কর্মের প্রসার ("Promotion of charity morality piety benevolence virtue".)

পরমেশ্বরের একত্ব এবং এককত্বই রাজার ধর্মের মূল কথা। এরই আর একদিক পৌত্তলিকতার অসারতা। বহুত্ব একত্বের বিরোধী। প্রতীকে শুধু একত্ব বাধিত হয় না, 'জন্ম ও নশ্বর' প্রধান হয়ে ওঠে। তাই প্রতীক-উপাসনার তীব্র প্রতিবাদ রাজার ধর্মে ধ্বনিত হয়েছে। ভৌম মানুষের মঙ্গলকামনায়, এই অদ্বৈত একেশ্বরবাদ ও মূর্তিপূজার উচ্ছেদের ভিতরই রাজা যুগসমস্যার সমাধান খুঁজে পেয়েছেন।

ভাবলে সত্যই আশ্চর্য বোধ হয়, পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের দ্বৈতাশ্রিত ভক্তিসিক্ত বাংলার মেদুর মাটিতে পৌরুষদীপ্ত অদ্বৈতবাদের চিন্তা এল কেমন করে? কেবল অদ্বৈতবাদের মত ও পথ নির্মম, নীরস, কঠোর। হিমপ্রস্থের কঙ্কর-কাঠিন্য গৌড়বঙ্গের ভূ-প্রকৃতির বিরোধী। এদেশের মাটিতে শুষ্ক অদ্বৈত বেদান্ত কোনকালেই তেমন প্রতিষ্ঠা পায়নি। তার কারণ, বেদান্ত মনন-প্রধান, বাঙালী ভাবপ্রবণ। শুদ্ধ অদ্বৈতবাদ জীবন ও কর্মের প্রতি বিমুখ, বাঙালীর ভিতর রয়েছে প্রচণ্ড জীবন-মুখীনতা। রিক্ততা নয়, আসক্তিই বাঙালীর জীবন-চর্যার মূল সুর। সামান্য হলেও 'দুধেভাতে' বেঁচে থাকার স্বপ্নই বাঙালীর প্রিয় জীবন-স্বপ্ন।

আর্য অনুপ্রবেশের পরেও শুদ্ধ বৈদিক ধর্ম এদেশে অনুপ্রবিষ্ট হয়নি। বেদ-উপনিষদের চর্চাও তেমন হয়নি। জনশ্রুতি ও কুলপঞ্জীর সাক্ষ্যেও প্রমাণিত হয়, যাজ্ঞিক ক্রিয়া-কর্ম করার জন্য এদেশে বারবার বৈদিক ব্রাহ্মণদের আনা হয়েছে কাশী-কনৌজ থেকে। প্রাচীন সাহিত্যও প্রমাণ করে, বঙ্গদেশ ছিল 'দস্যুভূয়িষ্ঠ' অন্-আর্য-

ভূমি। বেদের সংস্কার নিয়ে যাঁরা এদেশে প্রথম এসেছেন, তাঁরা সবাই সংস্কারপতিত আর্য ও ব্রাত্য। বৈদিক ঋষি অন্ধ দীর্ঘতমা গোধর্ম প্রচার করেছিলেন বলে তাঁকে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়, এবং তিনি আশ্রয়লাভ করেন ভারতের পূর্বাঞ্চলে চম্পানগরে বলিরাজার রাজ্যে। দীর্ঘতমার ঔরসে বলিরাজ মহিষী সুদেষ্ণার ক্ষেত্রে যে-সকল পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তাঁদের নামেই অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গাদি দেশ-নাম প্রচলিত হয়েছে। মহাভারতের আদিপর্বে (১০৪ অধ্যায়) এ কাহিনী আছে।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আরও একটি কাহিনী রয়েছে এদেশের আর্যদের সম্পর্কে। হরিশ্চন্দ্র রাজার বরুণ যাগে ঋষি বিশ্বামিত্রের যে পঞ্চাশজন পুত্র দেবরাত শুনঃশেপকে অগ্রজ বলে স্বীকার করেন নি, তাঁরা নির্বাসিত হয়েছিলেন 'দস্যুভুয়িষ্ঠ' পুণ্ড্রাদি দেশে। পূর্ব দিগ্‌দেশবাসী গালবাদি ঋষি সেই নির্বাসিত আর্যসন্তানগণ মধ্যে গণ্য। রামায়ণ ও পুরাণাদি থেকে এঁদের সম্পর্কে জানা যায়, এঁরা বৈদিক যাগে নয়, অবৈদিক যোগে দক্ষ ছিলেন। তাঁদের বংশধরেরাও পাশ্চাত্য বা উত্তর ভারতীয় বেদবাদীদের মত নিয়মনিষ্ঠ ছিলেন না। অথর্ববেদের ব্রাত্যকাণ্ডে যে বাউল শ্রেণীর ব্রাত্যদের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করা হয়েছে, তাঁরা অনেকটা সেই শ্রেণীর আর্য; তাঁরা মননে নয়, প্রাণধর্মে ছিলেন প্রশস্ত। বাঙালী আর্য চিরকাল শুদ্ধ আর্যদলভ্রষ্ট সংস্কারহীন নির্বাসিত আর্য।

এদেশের ক্রিয়াকুশল খাঁটি ব্রাহ্মণ যাঁরা, তাঁরাও দর্শনশাস্ত্র অপেক্ষা বৈদিক দর্শাদি যাগে অধিক দক্ষ। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী জানিয়েছেন, বিভিন্ন শাখার যে সকল বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ এদেশে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করেছেন, তাঁরা বেদের সমগ্র মন্ত্র নয়, অর্থসহ বিচার করতেন দশকর্মের উপযোগী প্রয়োজনীয় বৈদিক মন্ত্র।[১] 'অগ্নিহোত্র' 'পঞ্চমহাযজ্ঞ', 'অপশকুন যজ্ঞ', 'তুলাপুরুষদান'—এই সকল ক্রিয়াতেই রাঢ় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা পারদর্শী ছিলেন। বৈদিক জ্ঞানকাণ্ড অপেক্ষা কর্মকাণ্ডের দিকেই তাঁদের বেশী ঝোঁক। বঙ্গের কীর্তিমান আচার্য গুণবিষ্ণু, অনিরুদ্ধ, হলায়ুধ, রায়মুকুট বৃহস্পতি, স্মার্ত রঘুনন্দন সকলেই স্মৃতির পণ্ডিত। ষোড়শ শতক থেকে এদেশে স্বাধীনভাবে ন্যায়চর্চা নব্য ন্যায়ের নতুন দিগন্ত খুলে দেয়। সমগ্র মধ্যযুগে এদেশে অসংখ্য স্মৃতিরত্ন, স্মার্তশিরোমণি, ন্যায়চঞ্চু, ন্যায়রত্ন, ন্যায়ালঙ্কার, তর্কপঞ্চানন ও তর্কবাগীশদের সন্ধান পাওয়া যায়। বিদ্যাবাগীশ, বিদ্যালঙ্কার, বিদ্যাবাচস্পতিও ছিলেন। সম্ভবত বিদ্যাবাগীশেরা একাধিক শাস্ত্রে পারঙ্গম ছিলেন। ব্যাকরণ, অভিধান, ছন্দ, অলঙ্কার, কাব্য, স্মৃতি, ন্যায়—এইগুলিই চতুষ্পাঠীর প্রধান পাঠ্য বিষয় ছিল। চৈতন্যভাগবত, কবিকঙ্কণ চণ্ডী, রূপরামের ধর্মমঙ্গলে এদেশের সংস্কৃত বিদ্যাচর্চার যে-সকল চিত্র মেলে, তাতে বেদান্তের পণ্ডিতের উল্লেখ দেখা যায় না। বঙ্গে বেদান্তের পাঠ ছিল নিতান্ত গৌণ। বেদান্তের প্রতি একটা অবজ্ঞার ভাবও ছিল। শ্রীকৃষ্ণমিশ্রের 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' নাটকে দক্ষিণ রাঢ়াবাসী একটি চরিত্র কাশীতে বেদান্তের চর্চা দেখে মন্তব্য করেছে,

ভিক্ষালোভে যতিব্রত ধারণ করে মুণ্ডিতমুণ্ড ভাক্ত জ্ঞানীরা বেদান্ত শাস্ত্রকে

ব্যাকুলিত করছে। কর্মমীমাংসা ও ন্যায়ের বিপরীতার্থবাদী বেদান্ত যদি শাস্ত্র হয়, তবে বৌদ্ধশাস্ত্রের অপরাধ কোথায়?[২]

ষড়্‌দর্শনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে, সিন্ধুতে বিন্দুর মত হয়তো বেদান্তের অবস্থান ছিল, চর্চাও ছিল সীমাবদ্ধ। মধ্যযুগে দুজন বিখ্যাত বেদান্তী পণ্ডিতের কথা শোনা যায়,—একজন সার্বভৌম ভট্টাচার্য, অপরজন মধুসূদন সরস্বতী। কিন্তু এঁরা দুজনেই বাস করেছেন বঙ্গের বাইরে—সার্বভৌম ওড্রে, আর সরস্বতী কাশীতে। বাংলায় বেদান্তের আসন প্রায় শূন্য। বেদান্ত দর্শনের মূল ভিত্তি উপনিষৎ-শ্রুতি একরূপ অজ্ঞাতই ছিল। এইভাবে মধ্যযুগের বাঙালী বেদ ভুলেছে, ভুলেছে বেদান্ত-উপনিষৎ। অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার মত বেদের দোহাই দিয়ে এদেশের মানুষ সমর্থন করেছে সহস্র অন্ধ সংস্কারকে।

এরই ভিতর অবক্ষয়ী মধ্যযুগের অবসানকালে রামমোহনের কম্বুকণ্ঠ শোনা গেল। সুপ্তিমগ্ন জাতির প্রাণে নতুন কৌতূহল সঞ্চার করে তিনি ঘোষণা করলেন, "অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা"। তিনি নতুন করে সঙ্কলন করলেন 'ওঁ তৎসৎ' মন্ত্র। উপনিষৎ-শ্রুতি উদ্ধার করে শোনালেন,

১. 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' (ছান্দোগ্য)

২. 'পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ' (কঠ)

৩. 'তদেব ব্রহ্ম তদ্বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে' (কেন)

এখন প্রশ্ন, বেদান্ত-উপনিষৎ বহির্মুখ বঙ্গে ব্রহ্মৈকবাদের এই সূত্র রামমোহন পেলেন কোথা থেকে? কি এর উৎস?—অনেকেই মনে করেন, এবং মনে করার যুক্তিসঙ্গত কারণও রয়েছে যে, রামমোহনের একেশ্বরচিন্তার প্রথম প্রেরণা ইসলামী তৌহিদের একেশ্বরবাদ। রাজার জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ও বলেন,

"আরবী ভাষায় কোরাণ পাঠজন্য ও মুসলমান মৌলবীদের সংস্রবে আসাতে তাঁহার মনে এই সময়েই একেশ্বরবাদের ভাব প্রথমে প্রবিষ্ট হইয়াছিল।"

রামমোহনের একেশ্বরবাদের প্রথম প্রশ্রয় শরীয়তী ইসলামে হলেও এর প্রতিষ্ঠা বেদান্তসূত্রে ও উপনিষৎ-শ্রুতিতে। পরে তিনি এই একেশ্বরবাদের প্রকাশ দেখেছেন ভারতপন্থ নানক-কবীর প্রভৃতি সন্তদের ভিতর, খ্রীষ্টধর্মে ও বিশ্বের যাবতীয় ধর্মে।

কিন্তু রাজার ধর্মচিন্তা উন্মেষের এইটিই শেষ কথা নয়। মানুষের মানসিক প্রস্তুতিতে জন্মভূমির ঐতিহ্য, পরিজন-পরিবেশের ভূমিকা এবং তৎকাল ও তদ্দেশ-প্রচলিত অন্যান্য ধর্মমতের প্রভাব তুচ্ছ নয়। পারিপার্শ্বিক যে পরিবেশে শিশু ও কিশোর মন লালিত হয়, 'অবোধপূর্ব' ভাবে তারই গূঢ় প্রভাব বিস্তৃত হয় মানুষের জীবনে। শৈশব ও কৈশোরের মুদ্রাচিহ্নই পরিণত মানুষের চিন্তায় ও কর্মে রেখাপাত করে। আলঙ্কারিকেরা বলেন, বাসনালোকে সংস্কার থাকলেই কোন প্রত্যক্ষবস্তুর সংস্পর্শে প্রত্যভিজ্ঞা বলে তা উদ্বোধিত হয়। বিস্ফোরকে বারুদ থাকলেই আগুন ধরে।

এখানে খুব দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হয়, যিনি নতুন ভারতের প্রকল্পক, যাঁর চিন্তার সোতা ধরে নব্যভারতের ধর্ম ও কর্মচিন্তা বহুধারায় বিচিত্ররূপে বিকাশ প্রাপ্ত

হয়েছে, তাঁর বাল্য-কৈশোর-যৌবনের পূর্ণান্বিত বৃত্তান্ত আজও অজ্ঞাত ও অর্ধস্ফুট এবং এবং সে বৃত্তান্ত জল্পনা ও জনশ্রুতির আবরণে আবৃত। রামমোহনের জীবন-নাট্যের পঞ্চাঙ্কের তিন অঙ্কই প্রায় অভিনীত হয়েছে যবনিকার অন্তরালে। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৩০ পর্যন্ত তাঁর শহর কলিকাতার সংঘাতমুখর জীবন এবং ১৮৩১ থেকে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর প্রবাস-জীবনের সক্রিয় ভূমিকা যতটা প্রত্যক্ষ, তার পূর্ববর্তী জীবনের বিবরণ ততটা প্রত্যক্ষ নয়, তা ইতিহাস-চেতনাকেও পরিতৃপ্ত করে না। তা যেন নেপথ্যালোক থেকে উত্থিত কিছুটা স্বগতোক্তি ও পরভাষণের বিবৃতিমাত্র। রামমোহনের জন্মসন ১৭৭২, না ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দ, কিংবা তাঁর জীবৎকাল ৫৯, না ৬১ বৎসর —তা আজও বিতর্কের অতীত নয়।[৩]

রামমোহন যে অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করছিলেন, সেই দক্ষিণ রাঢ়ার একটি গৌরবময় ইতিহাস আছে। রামমোহনের জীবনীগ্রন্থে সে ইতিহাস উপেক্ষিত। অথচ রাজার পৌরুষদৃপ্ত ব্যক্তিত্ব ও ধর্মমতের উৎস নিরূপণে সে ইতিহাসের মূল্যবান ভূমিকা রয়েছে।

দক্ষিণ রাঢ়ার পশ্চিমে দারকেশ্বর-শিলাবতী (রূপনারায়ণ), পূর্বে ইতিহাসের প্রবল ধারাবাহী ভাগীরথী। মধ্যভাগ বিদীর্ণ করে প্রবাহিত দামোদর নদ। এরই পাশে মুণ্ডেশ্বরী। এখানকার সকল নদ-নদীই দক্ষিণমুখী। কেবল মুক্তবেণী ত্রিবেণী থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবাহিত ছিল গুপ্ত সরস্বতীর অধুনালুপ্ত মুক্তধারা। ব্যক্তির জীবন-গঠনে নদনদীর প্রভাব অল্প নয়। নদের অতি প্রখর পুরুষালি গতি, আর নদীর নর্তনশীলা লীলাভঙ্গী এই অঞ্চলের জীবনধারায় তীব্র বেগ সঞ্চার করেছে। উত্তর রাঢ়ার মত দক্ষিণ রাঢ়া রুক্ষ-শুষ্ক 'বজ্রভূমি' নয়। এর ভূপ্রকৃতি মানুষকে উদাসীন থাকতে দেয় না; কর্মের রঙ্গভূমিতে কর্মীকে রণসাজ পরিয়ে দেয়। প্রেয় ও শ্রেয়ের কামনা এখানে হাত ধরাধরি করে চলে। নদ-নদীর এই বিস্তৃতি, গভীরতা ও গাম্ভীর্য রামমোহনের ব্যক্তিজীবন গঠনে ছাপ ফেলেছে। বনস্পতির মত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও রাজার ধর্মভাবনায় যুগপৎ ভূমি ও ভূমার স্পর্শ তাঁর অঞ্চলের সরিত্তটিনীর দান।

প্রাচীনকালে দক্ষিণ রাঢ়ার বিখ্যাত জনপদ ছিল ভূরিশ্রেষ্ঠ—বর্তমান ভুরশুট। নদ-নদী বিধৌত এই দেশে একদিকে শ্রেষ্ঠীদের প্রতিপত্তি, অপরদিকে ক্রিয়াযাজী ব্রাহ্মণদের শাস্ত্রচর্চা এই অঞ্চলকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছিল। দশম শতাব্দীর কীর্তিমান পণ্ডিত 'ন্যায়কন্দলী'র রচয়িতা ভট্ট শ্রীধর এই ভুরশুটের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পোষ্টা ছিলেন রাজা পাণ্ডুদাস। শ্রীধর তাঁর স্বগ্রামের প্রশংসা করে বলেছেন,

> বহু ক্রিয়াবান্ ব্রাহ্মণদের বাসভূমি দক্ষিণ রাঢ়ায় ভূরিসৃষ্টি নামে গ্রাম ছিল,
> সে গ্রামখানি ছিল বিত্তবান্ শ্রেষ্ঠীদের সমাশ্রয়।
> ["আসীদ্ দক্ষিণ রাঢ়ায়াং দ্বিজানাং ভূরিকর্মণাম্।
> ভূরিসৃষ্টিরিতি গ্রামো ভূরিশ্রেষ্ঠিজনাশ্রয়ঃ ॥"]

ধর্মনিষ্ঠার সঙ্গে কর্মনিষ্ঠার, অধ্যাত্মচিন্তার সঙ্গে বিষয়চিন্তার যোগ এই অঞ্চলের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। অপর বৈশিষ্ট্য ব্যক্তিত্বের আটোপ-টঙ্কার। উগ্রতেজা ব্রাহ্মণদের

সাহঙ্কার ব্রাহ্মণ্যতেজ যেন জগতকে দগ্ধ করত। একটু কটাক্ষ-মিশ্রিত হলেও শ্রীকৃষ্ণ-মিশ্রের 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকে (সম্ভবত চতুর্দশ শতকে রচিত) ভূরিশ্রেষ্ঠিক গ্রামবাসীর একটি চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে, নাম তার 'অহঙ্কার'। তাকে দেখে অপর চরিত্র 'দম্ভ' বলছে,

> অভিমানে প্রজ্জ্বলিত হয়ে ইনি ত্রিভুবন গ্রাস করছেন; বাগ্‌জালে সকলকে ভর্ৎসনা করে বুদ্ধিবলে ইনি যেন ত্রিজগতকে উপহাস করছেন। মনে হয়, ইনি দক্ষিণ রাঢ়া প্রদেশ থেকে এসেছেন।[8]

ভুরশুটের এই অভিমান-দীপ্ত চরিত্র নীতি এই অঞ্চলের মানুষকে বহ্নিমান ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল করে তুলেছে। শুধু পুরুষ নয়, এই অঞ্চলের মহিলাও বীর্য-দীপ্ত। পাঠান-বিজয়িনী 'রায়বাঘিনী' রানী ভবশঙ্করী সপ্তদশ শতকের ভুরশুটের গৌরব। নারী হয়ে রণরঙ্গিনীর বেশে খড়্গ হস্তে ইনি বিপক্ষের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন।

ভুরশুটের স্বাতন্ত্র্য শুধু কঠিন শাস্ত্রচর্চায়, শুধু দৈহিক বীরত্বেও নয়—জীর্ণ-পুরাতন সংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামী মনোভাবে ও নতুনত্বের উদ্ভাবনেও এই অঞ্চল বিশিষ্টতার দাবী রাখে। এই অঞ্চলেরই কীর্তিমান কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র। রামমোহনের জন্মের দ্বাদশ বর্ষ পূর্বেও তিনি জীবিত ছিলেন (ভারতচন্দ্রের মৃত্যু হয় ১৭৬০ খ্রীঃ)। পুরানো মঙ্গলকাব্যের ধারায় তিনি 'নূতনমঙ্গল' (অন্নদামঙ্গল) রচনা করেন। তাঁর ভাষাশিল্প প্রস্তরে খোদিত ভাস্কর্যের মত দৃঢ়রেখ। বীরবল প্রমথ চৌধুরী তাঁকে বলেছেন, 'Supreme literary craftsman'; সমগ্র মধ্যযুগের বঙ্গীয় কবিদের ভিতর তাঁর কাব্যের ভাব ও ভঙ্গীর মধ্যে রয়েছে এমন একটি পৌরুষ-দীপ্তি, কবি Coleridge-এর ভাষায় যাকে বলা চলে 'masculinity'; ভাবের স্বচ্ছন্দ প্রকাশে প্রথাগত বাধা লঙ্ঘনেও তিনি নিরঙ্কুশ; মহনীয় দেবচরিত্র বা দেবোপম মনুষ্যচরিত্রের অবনমনেও তিনি নিঃশঙ্ক পাদচারী। এ সকল বিষয়ে পুরুষকারের প্রোজ্জ্বল প্রতিমূর্তি রামমোহন যেন তাঁর দেশবাসী কবি ভারতচন্দ্রের সগোত্র। রামমোহনের কুলিশ-কঠিন ব্যক্তিত্বে ও ধর্মের দিক থেকে স্বতন্ত্র ভাবনায় আঞ্চলিক এই দৃঢ়তার ছাপ পড়েছে।

সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্য আশ্চর্য কাকতলীয় ঘটনা, যে 'কালাপাহাড়' সুলেমান কররাণীর আমলে (ষোড়শ শতকে), বর্ণহিন্দু ব্রাহ্মণ হয়েও হিন্দুর দেবমন্দির ও মূর্তি দলনে একটা বিভীষিকাময় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তিনি নাকি জন্মেছিলেন এই ভুরশুটেরই এক ব্রাহ্মণ পরিবারে।[৫] কবি মোহিতলাল কালাপাহাড়ের হিন্দু দেব-বিরোধী ধ্বংসলীলাকে যুগসঞ্চিত কুসংস্কার ও মোহধ্বংসের অভিযান বলে অভিনন্দিত করেছেন। কালাপাহাড়ের প্রায় দু'শ বছর পরে সেই অঞ্চলে আবির্ভূত হলেন মূর্তি-পূজার ঘোর প্রতিবাদী রামমোহন। কে জানে, তাঁর সংস্কারে সেই দু'শ বছর আগেকার সেই পূর্বজের প্রভাব পড়েছে কি না! তবে এ কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে, নবযুগের প্রভাতে মোহিতলালের কালাপাহাড়-প্রশস্তির সার্থক অংশভাক্ রামমোহন। রামমোহন নব্যযুগের 'দেবারিমানব', 'মানবসিংহ'।

শুধু ভুরশুট নয়, দক্ষিণ-রাঢ়ার ত্রিবেণী-পাণ্ডুয়া-সপ্তগ্রামও ধর্মের জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম ও সর্বস্ব ত্যাগের দৃষ্টান্তে উজ্জ্বল। সরস্বতী নদীতীরে ছিল বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র সপ্তগ্রাম। সুলতানী আমলে সপ্তগ্রামের নামেই 'দ'য়ের সাতগাঁ' সরকার স্থাপিত হয়েছিল। এইখানেই জন্মগ্রহণ করেন বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ রঘুনাথ দাস। তিনি ধর্মের জন্য 'ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য স্ত্রী অপ্সরা সম' ত্যাগ করে কঠিন বৈরাগ্য ব্রত অবলম্বন করেছিলেন। 'তৃণাদপি' নম্রতার ভিতর বৈষ্ণব চরিত্রে যে 'তরোরিব' সহিষ্ণুতা থাকতে পারে, তার একক দৃষ্টান্ত রঘুনাথ—'রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা'। স্বমতের প্রতি রামমোহনের একনিষ্ঠা, স্ব-ধর্মমতের জন্য আত্মীয়স্বজনের বন্ধনকে উপেক্ষা করা ও প্রতিপক্ষ প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে একাকী দণ্ডায়মান হওয়ার সাহস ও ধৈর্য, অস্ত্র দ্বারা শত্রু জয় অথবা নিয়ম দ্বারা ইন্দ্রিয় জয় অপেক্ষা কম শ্লাঘনীয় নয়। মোট কথা রাজার চরিত্রে ও অটল সঙ্কল্পে আঞ্চলিক কীর্তিমান্ চরিতেতিহাসের প্রভাব কোন দিক থেকেই অল্প নয়।

রামমোহন প্রচারিত একেশ্বরবাদ ও জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সমাজে বা সঙ্ঘে 'একদেব'-এর উপাসনার বীজও প্রাচীনকাল থেকে কর্মমীমাংসা-চর্চিত দক্ষিণরাঢ়ায় প্রচলিত ছিল। এগুলি প্রসার লাভ করেছিল শাস্ত্রবাহ্য লোকায়ত ধর্মগুলির ভিতর। বিশেষভাবে উল্লেখ্য—

১. লৌকিক শাক্ত ও শৈব ধর্ম, ২. ধর্মঠাকুরের 'বার্মতি' এবং ৩. সহজিয়া বাউল ধর্ম।

এই সকল ধর্মাচরণের আনুষ্ঠানিক রূপ যাই হোক, এর কেন্দ্রে রয়েছে অদ্বৈতবাদ ও ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের একীকরণের চেষ্টা। রামমোহন যে নিরাকার একেশ্বরবাদ লক্ষ্য করেছিলেন উত্তর ভারতীয় 'সন্ত'-সম্প্রদায় ও নানক-কবীরাদি 'পন্থ' ধর্মের মধ্যে, সেই একই মত অন্য আকারে প্রচলিত ছিল তাঁর নিজেরও অঞ্চলে। প্রচলিত ছিল অবজ্ঞাত, অনাখ্যাত নিম্নশ্রেণীর ভিতর, যারা বহুকাল থেকে ছিল তথাকথিত শাস্ত্রজ্ঞদের মতে, রামমোহনের মতই 'নগরান্তবাসী'।[৬]

দক্ষিণ রাঢ়ায় আদিবাসীদের স্থায়ী আস্তানা না থাকলেও এই অঞ্চলে বহুকাল থেকে বসবাস করছে অন্ত্যজ শ্রেণীর ডোম, তিয়র, বাউরী, বাগ্দী, মেটে, লোহাড়, গোপ প্রভৃতি জাতি। ব্রাহ্মণ্য পৌরাণিক ধর্মের আওতায় এসে এরা হিন্দু সমাজের নীচুতলা আশ্রয় করে থাকলেও, এদের সংস্কারে ও জীবনচর্যায় রয়েছে আদিবাসীদের দৈহিক বীর্যবত্তা ও শক্তিবিশিষ্ট অদ্বৈতবোধজাত মাতৃতান্ত্রিকতা। যেখানেই এরা বাস করেছে, সেইখানেই গড়ে উঠেছে লোকায়ত শাক্ত 'থান'। দক্ষিণ রাঢ়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রয়েছে বহু গ্রামদেবতার পীঠ। গ্রাম্য শাক্ত থানগুলির ভিতর রাজবলহাটের রাজবল্লভী, হরিপালের বিশালাক্ষী, শিবাক্ষেত্র শিয়াখালার উত্তর বাহিনী, বাঁশবেড়িয়ার হংসেশ্বরী নানাদিক থেকে বিশিষ্ট। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেও ওঁদের ভিতর অনেকে লৌকিক দেবতারূপে বন্দিতা হয়েছেন।[৭] এই সকল দেবস্থানে যে শক্তি মূর্তি

প্রতিষ্ঠিতা, সেগুলি সবই উত্তরকালের কল্পনা। স্বরূপে শক্তি 'একা' ও 'নিরাকারা'। শক্তির আদিমতম প্রতীক কোথাও অনির্দেশ্য প্রস্তর, কোথাও নদী বা বৃক্ষ, কোথাও ত্রিরেখ যন্ত্র। শক্তি পূজার সকল অনুষ্ঠানের পশ্চাতে সক্রিয় এই অদ্বয় বুদ্ধি—তিনি 'অব্যক্তা', 'সনাতনী', 'আদিদেবী'।

দক্ষিণ রাঢ়ায় সংখ্যায় সবচেয়ে বেশী শিবের থান বা শিব মন্দির। এখানকার চালামন্দির, পঞ্চচূড়, নবরত্ন মন্দিরগুলি অপূর্ব শিল্প-ভাস্কর্যের নিদর্শন। শিবস্থানরূপে এই অঞ্চলে অতি বিখ্যাত যুগপ্রাচীন 'মহানাদ'।[৮] এটি শৈব গোরক্ষপন্থীদের কেন্দ্র। সবচেয়ে প্রসিদ্ধ 'শৈবতীর্থ তারকেশ্বর', এটি দশনামী সম্প্রদায়ের কেন্দ্র। মহানাদে 'মানাদের জাত' এবং তারকেশ্বরের 'চড়ক' দেশখ্যাত উৎসব। তাছাড়া রয়েছে দশঘড়ার বুড়োশিব, সোমসপুরের 'বুড়ো দামান', রামমোহনের নিজ অঞ্চল খানাকুলের অনাদি স্বয়ম্ভুলিঙ্গ ঘণ্টেশ্বর প্রভৃতি। শিবের নামবৈচিত্র্যও লক্ষণীয়—জটেশ্বর, টাটেশ্বর, ফুলেশ্বর, লোকনাথ, তারকনাথ। লোকায়ত শৈব যোগীদের অদ্ভুত কৃচ্ছ্র সাধনার অন্তরালে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ একটি মত—শিবই 'একনাথ', 'পরম ঈশান', 'আদিদেব'। এ ধর্মে জাতি-বর্ণের গণনা নেই, শিবের নামে যাঁরা সন্ন্যাস নেন, তাঁরা জাতি গোত্রহারা—'সন্ন্যাসীদের কোন জাত নেই।

লৌকিক দেবতাদের ভিতর রাঢ় অঞ্চলের বিশিষ্ট দেবতা ধর্মঠাকুর। ধর্মঠাকুরের বার্মতি রাঢ় অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ; ধর্মমঙ্গল কাব্যও রাঢ়ের বাইরে লেখা হয়নি। এখানে বিভিন্ন গ্রামে ধর্মঠাকুরের থান রয়েছে। বিভিন্ন থানে ধর্মঠাকুর বিভিন্ন নামে পরিচিত, যেমন বন্দীপুরের 'শ্যামরায়', ভুরশুট পরগণার হায়াৎপুরের 'যাত্রাসিদ্ধি', বলাগড়-রাধানগর ও জাড়াগ্রামের 'কালুরায়', রামমোহনের নিজস্ব এলাকা জাহানাবাদের (বর্তমান আরামবাগ) বদনগঞ্জ শ্যামবাজারের 'দলু রায়', বেলডিহা গ্রামের 'শীতল সিংহ', গোঘাটের কূর্মাকৃতি 'স্বরূপনারায়ণ' প্রভৃতি। ধর্মের প্রথম পুরোহিত রামাই পণ্ডিত একজন প্রবাদ-পুরুষ। তিনি পণ্ডিত, কিন্তু সংস্কারপতিত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত। ধর্মঠাকুর ডোমদেরই দেবতা। ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন, চতুর্বেদবাহ্য পঞ্চমবেদীয় লোকশাখা দ্বারাই ধর্মঠাকুরের গাজন প্রথম দক্ষিণরাঢ়ে প্রচলিত হয় (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, অপরার্ধ)। বাংলার মঙ্গল দেবতাদের ভিতর ধর্মঠাকুরই একটি দেবতা, যিনি স্পষ্ট 'শূন্যমূর্তিনিরঞ্জন'। তাঁর হস্তপদবিশিষ্ট কোন মূর্তি নেই, আছে শুধু অনির্দেশ্য পাথরপ্রতীক। আসলে তিনি

"এক ব্রহ্ম সনাতন নৈরাকার নিরঞ্জন
নির্গুণ নিদান শূন্যভর।"

রামমোহনের উদ্দিষ্ট নিরাকার একেশ্বর এই শূন্যমূর্তি ধর্মের মধ্যেই গুপ্ত ছিলেন।

রাঢ় অঞ্চলের অপর বিখ্যাত লোকায়ত ধর্ম সম্প্রদায় 'বাউল'। অক্ষয়কুমার বলেন, 'বাউল শব্দ বাতুলের প্রাকৃত বই আর কিছুই নয়'; তিনি আরও বলেন, 'খ্যাপা ও বাউল উভয়ই একার্থ শব্দ' (ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়)। সুরী হেমচন্দ্র

'দেশীনামমালা'য় বাউল শব্দটির অর্থ করেছেন 'প্রলপনশীল'—'বাউল্লো পলবিরএ' (৭.৫৬)। প্রাচীন বাংলার চর্যাগানে (চর্যা. ২০) 'বায়ুড়া' শব্দটির প্রয়োগ পাওয়া যায়; টীকাকার মুনিদত্ত তার অর্থ করেছেন, ('বাসনাবয়াকী ন বিদ্যতে')। স্মরণীয়কালে বৌদ্ধ সহজিয়ারাই বাংলার আদি বাউল। পরবর্তীকালে বৈষ্ণব ও সুফীমতের মিশ্রণে তত্ত্বপাগল কতকগুলি সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়, যেমন, সহজী, ন্যাড়া, কর্তাভজা—দরবেশ, সাঁই, ফকীর। এরা সকলেই সহজপথের পথিক ও ব্যাপকার্থে বাউল। এই বাউলিয়া সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট কেন্দ্র রাঢ়াভূমি। কেঁদুলি, বক্রেশ্বর, পাথরচাপড়ি (বীরভূম), অগ্রদ্বীপ, বৈরাগীতলা (বর্ধমান), সোনামুখী (বাঁকুড়া), বাঁশবেড়িয়া, পাঁচঘরা (হুগলী) প্রভৃতি স্থানে বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষ্যে বাউল সমাবেশ ঘটে। হুগলী জেলার ইতিহাসকার সুধীরকুমার মিত্র বলেন, রামমোহনের নিজ অঞ্চল খানাকুল কৃষ্ণনগরে অভিরাম গোস্বামীর যে পাট রয়েছে, আদৌ সেটি ছিল বৈষ্ণব সহজ ভাবের কেন্দ্র।

সহজ বাউলদের সাধন-ক্রিয়া নয়, তাঁদের পরমতত্ত্ব ও উদার মানবধর্মী ধর্মমতের সঙ্গে রামমোহনের মিল রয়েছে। বাউলেরা নিজের দেহের ভিতর 'মনের মানুষ'কে খোঁজেন; তাঁরা বলেন, 'আছে এই মানুষে সত্যনিত্য চিদানন্দময়'। রবীন্দ্রনাথ তাঁর Oxford বক্তৃতামালায় Religion of Man-এর কথা বলতে গিয়ে এই তত্ত্বটিকে উপনিষদের 'ব্রহ্ম' বা 'ঈশা' বলে ব্যাখ্যা করেছেন। বাউলদের মনের মানুষের কোন রূপ নেই; তাঁরা দেহ-দেবালয় ছাড়া বাইরের মন্দির-মসজিদকেও স্বীকার করেন না। বাউলেরা শাস্ত্রবিধিও মানেন না। তাঁদের ভিতর কোন জাতি বা বর্ণভেদও নেই। বাউলদের ধর্মের এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'It gives us a clue to the inner meaning of all religions' (*Religion of Man*, Chap. I).

রামমোহনের পূর্বে ও সমকালে কৈবর্ত বলা, ভুঁইমালী বিশা, নমশূদ্র গঙ্গারাম, আউলচাঁদ, মদন বাউল প্রভৃতির গান প্রচলিত ছিল। মদন বাউলের 'পথ ঢাইক্যাছে মন্দিরে মসজিদে' তো রামমোহনেরই ধর্মভাবের কথা। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী বলেন, "রামমোহন ভারতের সাধনাকাশে এক আকস্মিক উপদ্রব নহেন। ভারতীয় সনাতন ধারারই তিনি যুগগত পরিপূর্ণতা।" (যুগগুরু রামমোহন)।

রামমোহনের নিজ দেশের অনেকগুলি নদীকে বলা হয় 'কাণা নদী'; মূল নদ-নদীর বিশাল স্রোত মজে-বুজে যাওয়ায় নাম 'কাণা নদী'। তেমনই ভারতীয় একেশ্বরবাদ ও সর্বধর্মসমীকরণী চেষ্টা মজে-বুজে এই লোকায়ত ধর্মগুলিতে ফল্গুর মত প্রবহমাণ। প্রাচীন বাংলার চর্যাগানে শ্লিষ্ট অর্থে 'অদয় বঙ্গাল' শব্দটির প্রয়োগ রয়েছে (চর্যা. ৪৯); তার অন্তর্নিহিত অর্থ—অদ্বয়বাদী বঙ্গাল, যার ভিতর বিকল্পবুদ্ধি অভিন্নকৃত (দ্রষ্টব্য ৪৯ সংখ্যক চর্যা টীকা)। কি তত্ত্বের দিক থেকে, কি আচরণের দিক থেকে এই অদ্বয়বোধ রাঢ়-বঙ্গের লোকায়ত জীবন ও ধর্মের বিশিষ্ট লক্ষণ। যার জন্য পরবর্তীকালে এই লৌকিক ধর্মাচারীদের কেউ কেউ বলেছেন, 'গ্রাম্য

রামমোহন'। পূর্ব থেকেই এই গ্রাম্য রামমোহনের দল যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছিলেন, রাজা রামমোহন সেই ক্ষেত্রের অনুশীলিত ফসল।

১। "In Bengal, however, the Brahmanas never memorized even one of the Vedas. They memorized only such of the Mantras as were used in their religious performances, but insisted on knowing their meaning." (প্রাচীন বঙ্গে বেদচর্চা: দুর্গামোহন ভট্টাচার্য—হরপ্রসাদ সম্বর্দ্ধন লেখমালা ২য় খণ্ড)।

২। "এতে চ ভিক্ষামাত্রার্থং গৃহীতযতিব্রতা মুণ্ডিতমুণ্ডাঃ পণ্ডিতম্মন্যা বেদান্তশাস্ত্রং ব্যাকুলয়ন্তি। (বিহস্য)

প্রত্যক্ষাদি প্রমাসিদ্ধ বিরুদ্ধার্থাভিধায়িনঃ।
বেদান্তা যদি শাস্ত্রাণি বৌদ্ধৈঃ কিমপরাধ্যতে॥ (প্রবোধচন্দ্রোদয়, ২য় অঙ্ক)

৩। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বলেন, রাজা ৫৯ বছর বেঁচেছিলেন। ব্রিস্টল শহরে রামমোহনের সমাধি ফলকেও উৎকীর্ণ রয়েছে তাঁর জীবৎকাল ১৭৭৪-১৮৩৩। কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ কর্তৃক প্রকাশিত কুমারী কলেটের রামমোহন-জীবনীর সম্পাদকদ্বয় অন্যান্য প্রমাণ উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন, রামমোহনের জন্ম ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে। তাই যদি হয়, ব্রিস্টলের সমাধি ফলকে এই পরিবর্তিত তারিখ কি গৃহীত হয়েছে?

৪। "জ্বলন্নিবাভিমানেন গ্রসন্নিব জগৎত্রয়ম।
ভর্ৎসয়ন্নিব বাগ্‌জালৈঃ প্রজ্ঞয়োপহসন্নিব॥
তথা তর্কয়ামি। নূনময়ং দক্ষিণরাঢ়া প্রদেশাদাগতো ভবিষ্যতি।" (দ্বিতীয় অঙ্ক)

৫। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার, কালাপাহাড় যে হিন্দু ছিলেন, এই কাহিনীকে অবিশ্বাস করেন। তিনি বলেন, "সুলেমান কররানীর সেনাপতি কালাপাহাড় হিন্দু রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান এবং হিন্দুদের মন্দির ও দেবমূর্তি ধ্বংস করার জন্য ইতিহাসে খ্যাত হইয়া আছেন। ইনি প্রথম জীবনে হিন্দু ও ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং পরবর্তীকালে মুসলমান হইয়াছিলেন বলিয়া কিংবদন্তী আছে। কিন্তু এই কিংবদন্তীর কোন ভিত্তি নাই। ...প্রামাণিক ভাবে জানিতে পারা যায় যে, কালাপাহাড় জন্ম-মুসলমান ও আফগান ছিলেন। তাঁহার নামান্তর 'রাজু'...(তাই) অনেকে তাঁহাকে হিন্দু মনে করিয়াছেন। (বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ)।

কিন্তু ঐতিহাসিক সুধীরকুমার মিত্র বলেন, "ভারতবর্ষের অসংখ্য হিন্দু মন্দির ধ্বংসকারী ইতিহাস-বিশ্রুত কালাপাহাড় ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজকুল সম্ভূত ছিলেন। তাঁহার নাম ছিল রাজীবলোচন রায়। সুলেমান কররানী রাজীবলোচনের বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে গৌড় আক্রমণ করিতে লইয়া যান। নবাব কন্যা তাঁহার প্রেমে পড়েন। রাজীবলোচন তাঁহাকে বিবাহ করেন। হিন্দু হইয়া মুসলমানকে বিবাহ করায় তিনি স্ব-সমাজ কর্তৃক অপমানিত ও.ধিক্কৃত হন। ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া তিনি মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হন এবং দারুণ হিন্দুবিদ্বেষী হইয়া পড়েন।" (হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ)।

"ভারতকোষ" (দ্বিতীয় খণ্ড) সুকুমার রায় লিখিত প্রবন্ধেও এই মতের সমর্থন আছে।

৬। রামমোহনের প্রতি 'নগরান্তবাসী' বিশেষণটি প্রয়োগ করেছেন তাঁর প্রতিপক্ষ 'পাষণ্ডপীড়ন'-এর লেখক। বিশেষণটির লক্ষ্যার্থ হন অস্পৃশ্য চণ্ডাল। মনুসংহিতায় বলা হয়েছে চণ্ডালের আশ্রয় হবে গ্রামের বহির্ভাগে—"চণ্ডালশ্বপচনান্ত বহির্গ্রামাৎ প্রতিশ্রয়ঃ' (মনু. ১০. ৫১)।

৭। (ক) "শিয়াখালার দেউল আছে উত্তর দুয়ার।" (কবিকঙ্কণ)
(খ) "রাজবলহাটে বন্দে শ্রীরাজবল্লভী" (রূপরাম)

৮। অক্ষয়কুমার দত্তের 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থে মহানাদের বিস্তৃত বিবরণ আছে।

কেশবচন্দ্র সেন ঃ ব্যক্তিত্ব ও গদ্যশিল্প

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

॥ ১ ॥ কথারম্ভ ॥

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন (১৯ নভেম্বর ১৮৩৮—৮ জানুআরি ১৮৮৪) তাঁর প্রাপ্য পরবর্তী প্রজন্মসমূহের বাঙালিদের কাছে পান নি। তাঁর জন্মশতবর্ষপূর্তি বছরে (১৯৩৮) তাঁকে নিয়ে যেসব আলোচনা, সভা, ভাষণ, অনুষ্ঠান হয়েছে তা খুব দ্রুত বাঙালির মন থেকে মুছে গেছে। ছেচল্লিশ বছরের জীবনে কেশবচন্দ্র অসাধ্যসাধন করেছিলেন, কোনোরূপ অত্যুক্তি না করে তা বলা যায়। বাগ্মী, সংগঠক, প্রচারক, ধর্মব্যাখ্যাতা, আচার্য ও প্রচারক রূপে পঁচিশ বছরের কর্মবহুল জীবনে তিনি যা করে গেছেন তা আজো আমাদের বিস্মিত করে। সচেতন সাহিত্যচর্চা তাঁর ক্ষেত্রে ছিল না। তবু বাংলা গদ্যচর্চায় ও ধর্মসাহিত্যরচনায় তাঁর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। গদ্যশিল্পী কেশবচন্দ্রকে আমরা সম্পূর্ণ অবহেলা করেছি। বাংলা গদ্য নিয়ে যাঁরা বিস্তারিত কাজ করেছেন তাঁরা, তাঁর সম্পর্কে বিশেষ চিন্তাভাবনা করেন নি। 'বাঙ্গলা সাহিত্যে গদ্য'-এর লেখক ডঃ সুকুমার সেন, 'বাংলা গদ্যের পদাংক' সংকলক ও ভূমিকা-লেখক ডঃ প্রমথনাথ বিশি, 'উনিশ শতকের বাংলা গদ্য সাহিত্য ঃ ইংরেজি প্রভাব' গ্রন্থের লেখক ডঃ অপূর্বকুমার রায়, 'বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস' রচয়িতা বর্তমান নিবন্ধকার, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-রচয়িতা ডঃ সুকুমার সেন ও ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা গদ্যশৈলীর বিভিন্ন আলোচক (ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত, ডঃ শিশির দাশ, ডঃ পবিত্র সরকার, ডাঃ প্রণয় কুণ্ডু, ডঃ অরুণ বসু) গদ্যশিল্পী কেশবচন্দ্র সম্পর্কে সচেতন ভাবনার পরিচয় দেন নি। আমার গবেষক-ছাত্র শ্রীমান অনিলবরণ দে-র কেশবচন্দ্র সম্পর্কিত গবেষণাকর্ম উপলক্ষে আমি এ বিষয়ে সর্বপ্রথম সচেতন হই। তিনি এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, আশা করি অচিরে তা মুদ্রিত হবে।

কেশবচন্দ্র একটি আকর্ষণীয় প্রবল ব্যক্তিত্ব। তাঁর ব্যক্তিত্বের বিচিত্রমুখিতা ও ও বর্ণবহুলতা দেখে বিস্মিত হই। প্রস্তুত নিবন্ধে এই বিচিত্রকর্মা ব্যক্তিত্বের ও গদ্যশিল্পীর প্রাথমিক পরিচয় সাধনের প্রয়াস করা হয়েছে। কেশবচন্দ্রের মৃত্যুশতবর্ষ-পূর্তি (৮ জানুআরি ১৯৮৪) লগ্ন আসন্ন। আশা করি, তার পূর্বেই বাঙালি জাতি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনকে প্রাপ্য মর্যাদা দেবেন।

॥ ২ ॥ দুই বন্ধু ॥

একই বছরে (১৮৩৮) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও কেশবচন্দ্র সেনের জন্ম হয়। বঙ্কিমচন্দ্র নৈহাটি-কাঁঠালপাড়ার গোঁড়া হিন্দু চট্টোপাধ্যায় বংশের সন্তান। কেশবচন্দ্র

কলকাতা কলুটোলার বৈষ্ণব বৈদ্য সেনবংশের সন্তান। বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজ ও প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়েছিলেন। কেশবচন্দ্র হিন্দু কলেজ স্কুল বিভাগ, হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ ও হিন্দু কলেজ সিনিয়র বিভাগে পড়েন। বঙ্কিমচন্দ্র ও কেশবচন্দ্র একই সময়ে (১৮৫৬-১৮৫৭) প্রেসিডেন্সি কলেজের আইন বিভাগের ছাত্র ছিলেন। তখন থেকেই তাঁদের বন্ধুত্বের সূত্রপাত। তাতে ছেদ পড়ে কেশবের মৃত্যুতে (৮ জানুআরি ১৮৮৪)। বঙ্কিমের মৃত্যু হয় দশ বছর পরে (৮ এপ্রিল ১৮৯৪)।

সমবয়সী দুই কৃতী বাঙালি—কেশবচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র পরস্পরের গুণগ্রাহী ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দের দ্বিতীয়ার্ধে দুই বন্ধু বাংলা গদ্যসাহিত্যের দুটি ধারায় নেতৃত্ব দেন; ধর্মসাহিত্যের ধারায় কেশবচন্দ্র, রসসাহিত্যের ধারায় বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্র ও কেশবচন্দ্র কলকাতার কলুটোলায় কাছাকাছি বাস করতেন। কিন্তু দুজনের পথ ছিল ভিন্ন। বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যগুরু, উপন্যাসলেখক, সাহিত্যসমালোচক, সাহিত্যপত্র-সম্পাদক, সাহিত্যগোষ্ঠীনেতা, প্রবন্ধলেখক, ইতিহাসবেত্তা, সমাজ-নির্দেশক। কেশবচন্দ্র ধর্মগুরু, ধর্মপ্রচারক, ধর্মব্যাখ্যাতা, বাগ্মী, সাংবাদিক, সমাজ-সংস্কারক। বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের মাধ্যমে, কেশবচন্দ্র ধর্মের মাধ্যমে সমাজের সেবা করেছেন। দুজনের জীবনদৃষ্টি, ধ্যানধারণা ও মানসিকতায় গুরুতর পার্থক্য আছে। দুজনেই নিজ নিজ বক্তব্য প্রচারের জন্য বাংলা গদ্যভাষা ব্যবহার করেছেন। তার ফলে বাংলা গদ্যের সমৃদ্ধি ঘটেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কলমে কথা-গদ্য ও প্রবন্ধ-গদ্যের উন্নতি ঘটেছে, কেশবচন্দ্রের লেখায় ও ভাষণে, প্রার্থনা ও উপদেশনায় সাংবাদিকের গদ্য, বাগ্মীর গদ্য, ভাবুকের গদ্য নব ঐশ্বর্যে ভূষিত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের একদা সহচর কালীনাথ দত্ত লিখেছেন,

"যখন তাঁহার দুর্গেশনন্দিনী আলোকের মুখদর্শন পর্যন্ত করে নাই, সেই সময় কলিকাতার কোন স্থলে একদিন কেশববাবুর সঙ্গে বঙ্কিমবাবুর সাক্ষাৎ হইলে বঙ্কিমচন্দ্র কেশবচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেন—'I wish to know how far you have outgone me',—একথা কেশববাবুর নিজ মুখেই শুনিয়াছি।" ('বঙ্কিমচন্দ্র', 'প্রদীপ', দ্বিতীয় ভাগ, নবম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩০৬ বঙ্গাব্দ)

উত্তর-জীবনে দুই বন্ধু পরস্পরকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখতেন, এই প্রশ্নের উত্তরে দুটি সাক্ষ্য উপস্থিত করা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্মতত্ত্ব। প্রথম ভাগ। অনুশীলন' (১৮৮৮) গ্রন্থে ব্রাহ্মণকে ভক্তিপ্রসঙ্গে গুরু-শিষ্য সংবাদে যে কথা লিখেছিলেন তা প্রণিধানযোগ্য।—

শিষ্য। অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে আর ভক্তি করা হইবে না?

গুরু। ঠিক তাহা নহে। যে ব্রাহ্মণের গুণ আছে, অর্থাৎ যিনি ধার্মিক, বিদ্বান, নিষ্কাম, লোকের শিক্ষক, তাঁহাকে ভক্তি করিব; যিনি তাহা নহেন, তাঁহাকে ভক্তি করিব না। তৎপরিবর্তে যে শূদ্র ব্রাহ্মণের গুণযুক্ত, অর্থাৎ যিনি ধার্মিক, বিদ্বান, নিষ্কাম লোকের শিক্ষক, তাঁহাকেও ব্রাহ্মণের মত ভক্তি করিব।

শিষ্য। অর্থাৎ বৈদ্য কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মণশিষ্য, ইহা আপনি সঙ্গত মনে করেন?

গুরু। কেন করিব না? ঐ মহাত্মা সুব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ গুণসকলে ভূষিত ছিলেন। তিনি সকল ব্রাহ্মণের ভক্তির যোগ্য পাত্র।

শিষ্য। আপনার এরূপ হিন্দুয়ানিতে কোন হিন্দু মত দিবে না।

গুরু। না দিক, কিন্তু ইহাই ধর্মের যথার্থ মর্ম।"

(ধর্মতত্ত্ব। দশম অধ্যায়। পৃ ৬১৮। বঙ্কিম রচনাবলী। সাহিত্য সংসদ সংস্করণ। চতুর্থ মুদ্রণ বৈশাখ ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ)।

এখানে বঙ্কিমচন্দ্র কেশবচন্দ্রকে "সুব্রাহ্মণের গুণে ভূষিত" ও "সকল ব্রাহ্মণের ভক্তির যোগ্যপাত্র" বলেছেন।

মধ্যজীবনে কেশবচন্দ্র কলুটোলার পৈতৃক-বাড়ি ছেড়ে উঠে যান শিয়ালদহর পশ্চিমে কমল-কুটীরে (লিলি কটেজ, আপার সার্কুলার রোড, বর্তমান আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডে অবস্থিত ভিক্টোরিয়া স্কুল-বাড়ি)। খুব একটা যাওয়া-আসা না থাকলেও দুই বন্ধু পরস্পরের সংবাদ রাখতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের চাকুরী-জীবনে বড় বিপদের সময় কেশবচন্দ্র তাঁকে রক্ষা করেন।

বঙ্কিম-অনুজ সঞ্জীবচন্দ্র-সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে আনন্দমঠ উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় (চৈত্র ১২৮৭-জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯/১৮৮১-৮২ খ্রী) এবং তারপরেই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় (১৮৮২)। বঙ্কিমের জীবিতকালে আনন্দমঠের পাঁচটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

আনন্দমঠ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতি বৃটিশ কর্তৃপক্ষের রোষ-নজর পড়ে। বাংলার ছোট লাট ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছে আনন্দমঠে রাজদ্রোহে উসকানি দেবার অভিযোগ পাঠান ও কৈফিয়ৎ তলব করেন। যেদিন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্র সমীপে ছোট লাটের বার্তা প্রেরিত হয় সেদিন বঙ্কিমচন্দ্র কলকাতাতেই ছিলেন। বার্তায় আরো লেখা ছিল, কৈফিয়ৎ আগামী সকালেই চাই এবং তা ছোট লাট সমীপে প্রেরিত হওয়া চাই। সেই রাতেই বঙ্কিমচন্দ্র কলুটোলায় কেশবচন্দ্রের পৈতৃক-ভবনে কেশব-অনুজ কৃষ্ণবিহারীর সঙ্গে দেখা করেন ও তাঁর সঙ্গে কমল-কুটীরে কেশবের কাছে হাজির হন। সহপাঠী-বন্ধু বঙ্কিমচন্দ্রের এই বিপদে কেশবচন্দ্র যে কোন রকম সাহায্য করতে রাজি হন এবং বঙ্কিমের অনুরোধমত তখনই আনন্দমঠ সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত লিখে দেন। তখন বৃটিশ সরকারের কাছে কেশবচন্দ্র সেনের যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল। পরদিন সকালে বঙ্কিমচন্দ্র কেশব-স্বাক্ষরিত সেই ইংরেজি অভিমত নিয়ে ছোট লাটের সঙ্গে দেখা করেন। ছোট লাট কেশব-অভিমত সমেত বঙ্কিমের কৈফিয়ৎ গ্রাহ্য করেন। তার ফলে বঙ্কিমচন্দ্রের চাকুরি যায় না বটে, তবে তিনি সরকারী প্রধান দপ্তর (রাইটার্স) থেকে পুনর্বার মফঃস্বলে প্রেরিত হন। এবং কেশবের সেই অভিমত সঙ্গে সঙ্গেই কেশবচন্দ্রের

"দি লিবারেল" সাপ্তাহিক পত্রে কেশব-অনুজ কৃষ্ণবিহারী সেনের নামে প্রকাশিত হয় ৮ এপ্রিল ১৮৮২ তারিখের সংখ্যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠের 'দ্বিতায় বারের বিজ্ঞাপনে' (দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায়) লেখেন :

"প্রথম বারের বিজ্ঞাপনে যাহা লিখিয়াছিলাম,* তাহার টীকাস্বরূপ কোন বিজ্ঞ সমালোচকের কথা অপর পৃষ্ঠে উদ্ধৃত করিলাম।" অভিমতটি এই—

"The leading idea of the plot is this—should the national mind feel justified in harbouring violent thoughts against the British violent ? or to present the question in another form, is the establishment of English supremacy providential in any sense ? or to put it in a still more final and conclusive form, with what purpose and with which immediate end in view did providence send the British to this country ? The immediate object is thus briefly described in the preface—To put an end to Moslem tyranny and anarchy in Bengal ; and the mission is thus strikingly pictured in the last chapter :—"The Physician said, Satyanand, be not crest fallen. Whatever is, is for the best. It is so written that the English should first rule over the country before there could be a revival of the Aryan faith. Harken into the counsels of Providence. The faith of the Aryas consisteth not in the worship of three hundred and thirty millions of gods and goddesses ; as a matter of fact that is a popular degradation of religion—that which has brought about the death of the true Arya faith, the so-called Hinduism of the Mlechhas. True Hinduism is grounded on knowledge, and not on works. Knowledge is of two kinds—external and internal. The internal knowledge constitutes the chief part of Hinduism. But internal knowledge cannot grow unless there is a development of the external knowledge. The spiritual cannot be known unless you know the material. External knowledge has for a long time disppeared from the country, and with it vanished the

---

* আনন্দমঠের 'প্রথমবারের বিজ্ঞাপনে' বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন—

"বাঙ্গালীর স্ত্রী অনেক অবস্থাতেই বাঙ্গালীর সহায়। অনেক সময় নয়। সমাজ-বিপ্লব অনেক সময়েই আত্মপীড়ন মাত্র। বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী। ইংরেজেরা বাঙ্গলা দেশ অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। এই সকল কথা এই গ্রন্থে বুঝান গেল।"

Aryá faith. To bring about a revival, we should first of all disseminate physical or external knowledge. Now there is none to teach that ; we ourselves cannot teach it. We must need get it from other countries. The English are profound masters of physical knowledge; and they are apt teachers too. Let us then make them kings. English education will give our men a knowledge of physical science, and this will enable them to grapple with the problems of their inner nature. Thus the chief obstacles to the dissemination of Arya faith will be removed, and true religion will sparkle into life spontaneously and of its own accord. The British Government shall remain indestructible so long as the Hindus do not once more become great in knowledge, virtue and power. Hence, O Wise man, refrain from fighting and follow me." This passage embodies the most recent and the most enlightened views of the educated Hindus, and happening as it does in a novel powerfully conceived and wisely executed, it will influence the whole race for good. The author's dictum we heartily accept as it is one which already forms the creed of English education. We may state it in this form : India is bound to accept the scientific method of the West and apply it to the elucidation of all truth. This idea beautifully expressed, forms a silver thread as it were, and runs through the tissue of the whole work."—'The Liberal', 8 April 1882 issue.

বঙ্কিমচন্দ্রের বিপদে বন্ধু কেশবচন্দ্রের এই সাহায্যের কথা আমি শুনেছি নববিধান পাবলিকেশন কমিটির ভূতপূর্ব সচিব শ্রীসতীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছে, আর তিনি শুনেছিলেন কেশব-অনুজ কৃষ্ণবিহারী সেনের পুত্র জ্যোতিপ্রকাশ সেনের কাছে।

কেশবচন্দ্রের 'দি লিবারেল' সাপ্তাহিক পত্রে আনন্দমঠ সম্পর্কে এই 'অভিমত' প্রকাশিত হয় ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ৮ এপ্রিল সংখ্যায়। চারমাসের মধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্র যাজপুরে (কটক) বদলি হয়ে যান (আগষ্ট ১৮৮২)। সেখান থেকে ফিরে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ ফেব্রুআরী হাওড়ায় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদে যোগ দেন। সরকারি চাকুরীতে থাকাকালীন (অবসর গ্রহণ—১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৯১) আর কোনোদিন বঙ্কিমচন্দ্র রাইটার্সে ফিরে আসতে পারেন নি।

॥ ৩ ॥ দুই কবি

শোনা যায়, রবীন্দ্রনাথের জন্মকালে (৮ মে ১৮৬১ খ্রী:) জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির

বৈঠকখানায় বসে প্রবীণ ও নবীন ব্রাহ্ম নেতা, দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র গল্প করছিলেন। তখন অন্দরমহল থেকে সংবাদ এল, এইমাত্র দেবেন্দ্রনাথের এক পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়েছে। সংবাদ শুনে প্রীত হয়ে কেশবচন্দ্র তাঁর নেতা দেবেন্দ্রনাথকে বলেন,— আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি, আপনার এই পুত্র রবির ন্যায় যশোরাশি বিকীর্ণ করবে, ইন্দ্রের ন্যায় প্রতাপশালী হবে। একথা শুনে দেবেন্দ্রনাথ নবজাতকের নাম রাখলেন,— রবীন্দ্রনাথ। সে সময় সস্ত্রীক কেশবচন্দ্র জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে সাময়িক অবস্থান করছিলেন।

কেশবচন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে এই ঘটনা স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ এক বাণীতে লেখেন—

Uttarayan,
Santiniketan,
17th November, 1937.

The first opening of my eyes to the light of the sun closely coincided with my first meeting with Brahmananda Keshub Chunder Sen when he came to our Jorasanko house and made it his home for sometime at the early period of his life consecrated to the service of God. I was fortunate enough to receive his affectionate caresses at the moment when he was cherishing his dream of a great future of spiritual illumination. Since then I have journeyed on across a long stretch of time through the vicissitudes of amazing experiences of creative religion in Bengal which greatly owes its evolution to the dynamic power of the devotional genius of Keshab Chunder, till at last the opportunity is given me nearly at the end of my days when I could bring the offering of reverent homage in my own name and in that of my countrymen to the sacred memory of Brahmananda on the occasion of his centenary celebrations.

Rabindranath Tagore.

(শ্রীসতীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'সমন্বয়মার্গ' গ্রন্থে মুদ্রিত, পৃ. ২৮৫)

কেশবচন্দ্রের ঐশীপ্রেরণার বিদ্যুৎশক্তি সমন্বিত প্রতিভার প্রতি রবীন্দ্রনাথ এই বাণীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। কেশবকে সৃষ্টিশীল ধর্মবীর, ঈশ্বরসেবায় উৎসর্গীকৃত জীবন ও ঐশীশক্তিবিশিষ্ট প্রতিভারূপে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন। কেশবের প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদনের সুযোগ এলো নিজ জীবন-সায়াহ্নে—এই আক্ষেপ এখানে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্ত করেছেন।

কথাটা ঠিক নয়, এর পূর্বে ও পরে রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মানন্দ সম্পর্কে আরো তিনটি অভিমত দিয়েছিলেন। তিনটিই বাংলায় রচিত।

প্রথমটি এক ভাষণের ('ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকা ১২ মাঘ ১৩১৬ বঙ্গাব্দ, ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ সংখ্যায় মুদ্রিত। শ্রীসতীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'সমন্বয়মার্গ' গ্রন্থে—১৩৬৭—উদ্ধৃত, পৃ. ২৪-২৫) অংশবিশেষ—

"কেশবচন্দ্রের কর্মজীবনের যখন উজ্জ্বল উদীয়মান অবস্থা, তখন আমার বয়স অল্প ছিল। সে সময়ে কেশবচন্দ্র যখন বিদেশী সাধু ঈশার জীবনের কথা বিবৃত করিয়া তাঁহার প্রতি অনুরাগ, ভক্তি ও দেশে তাঁহার ধর্ম ও ধর্মজীবনের গুরুত্ব ও বিশেষত্ব প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, তখন আমার মনে সহজেই এই ভাবের উদয় হইল, বিদেশী সাধুজীবনের গৌরব ভারতে প্রচার করিতে যাইয়া ভারতের সাধু মহাজনদিগের গৌরবের হানি করিতেছেন। শেষে আমার পরবর্তী জীবনে কেশব-জীবনের শিক্ষা, সাধনা ও সিদ্ধিলাভের আলোচনা করিতে যাইয়া আমি পূর্ব সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি,.........পরবর্তী সময়ে আমি কেশবের জীবনের সাধনার বিষয় আলোচনা করিতে যাইয়া দেখিলাম, ঋষিগণ যেভাবে সকল ভুবনে ঈশ্বরের আবির্ভাব, ঈশ্বরের প্রকাশ উপলব্ধি করিয়াছেন, কেশব সেই ভাবের প্রকাশ উপলব্ধি করিতে যাইয়া স্বদেশী বিদেশী সকল সাধু মহাজনদিগের জীবনে তাঁহার প্রকাশ ও বিশেষ লীলা প্রত্যক্ষ করিলেন।........এইরূপে স্বদেশের বিদেশের সকলকে গ্রহণ করিতে যাইয়া, তিনি ধর্মের ও ধর্ম-সাধনের এক উচ্চতর, প্রশস্ততর স্তরে, সার্বভৌমিক স্তরে উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহার জীবনের ও সাধনের বিশেষত্ব বুঝিলাম, স্বীকার করিতে বাধ্য হইলাম।"

দ্বিতীয়টি স্কটিশচার্চ কলেজে কেশব-তিরোভাব-দিবসে স্মরণ-সভায় সভাপতির ভাষণ, ৮ জানুআরি ১৯১০ | 'ধর্মতত্ত্ব', ১২ মাঘ ১৩২৬ বঙ্গাব্দ সংখ্যায় মুদ্রিত। জি. সি. ব্যানার্জি-সংকলিত Brahmananda Keshub Chunder Sen, Vol I, Bengali portion—p 69-70, Allahabad 1934 থেকে গৃহীত।

"কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে বিরোধ-ভঞ্জন

যিনি বিধাতা, তিনি বিধান ক'রলেন, তিনি কবি—আনন্দে সমস্ত বিশ্বসংসারকে সৃষ্টি ক'রলেন। তিনি মনীষী—মনকে তিনি শাসন ক'চ্ছেন। অব্যাহত তাঁর কবিত্ব প্রকাশ হচ্ছে তাঁর সৃষ্টিতে, তাঁর ঐশী শক্তি প্রকাশ হ'চ্ছে আমাদের মনের মধ্যে। আমাদের ইচ্ছার উপর তাঁর ইচ্ছা জয়ী হ'চ্ছে, তাই তিনি মনীষী। তিনি কবি ও মনীষী। তাঁর বিধান অনন্তকালের বিধান, সেই কথা যে মহাপুরুষ (কেশবচন্দ্র) প্রকাশ ক'রেছেন, সর্বোচ্চ বাণী তিনি জীবনের মধ্য দিয়ে নূতন ক'রে প্রকাশ করেছেন। 'নববিধান' পুরাতনকে নূতন ক'রে গ্রহণ করে প্রকাশ করা। কোনও

পুরাতন জিনিষকে যখন নূতন ক'রে কেউ দেখতে চাইবে না, কখনও তাঁরা সেই জিনিষে কিছু নূতন দেখতে পারেন না। প্রভাতকাল অতি পুরাতন, দিবা, রাত্রি, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহমণ্ডল অতি পুরাতন, প্রত্যহ আসা যাওয়া ক'চ্ছে। কিন্তু কবি যখন একদিন প্রভাতকে নূতন ভাবে দেখতে পান, তখন তিনি মনে করেন এ বুঝি কখনও আগে দেখেন নি, এমনটি বুঝি কেউ কখনও দেখেন নি। ভারতবর্ষে যে সাধনা করে সে সত্যকে লাভ করেছে, আমরা বলব তিনি তা ম্লান কত্তে দাঁড়িয়েছেন? আমরা বিরোধ দ্বারা কিছুতেই তাঁকে গ্রহণ কত্তে পার্বো না। আমরা অন্য ধর্মকে ঘৃণা কত্তে আরম্ভ ক'রেছি, সেই সত্যের বিদ্রোহ পতাকা আমরা তুলেছি, যিনি সে সত্য প্রচার কত্তে দাঁড়িয়েছেন তাঁকে আমরা শত্রু ব'লে মনে করি। গুরু নানক, মহম্মদ প্রভৃতি-কেও বিরুদ্ধবাদী ব'লে মনে ক'রেছি। আমাদের যেটুকু সাধনা, সেটুকু নিয়েই আমরা নিজের ধর্মমন্দিরের মধ্যে, নিজের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকি। তাতে আর কারুকে প্রবেশ কত্তে দিই না, তা নিয়ে আর কোন স্থানে যাই না। যিনি সত্যস্বরূপ, তাঁকে সকল ধর্মের মধ্যে প্রকাশ করা, গ্রহণ করা এই কথা সত্য, ব্রহ্মানন্দের মনের কথা, এবং তাই নূতন ক'রে তিনি লাভ ক'রে 'নববিধান' বলে প্রকাশ করেছেন। এ যখন বুঝলুম, সে বিরোধ আমার ঘুচে গেল। আমি তাই আজ তাঁকে ভক্তি নিবেদন ক'ত্তে এসেছি।"

তৃতীয়টি কেশব-জন্মশতবর্ষে রবীন্দ্রনাথের বাংলায় বাণী (শ্রীসতীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'সমন্বয়মার্গ' পৃ ২৮৫ থেকে গৃহীত)—

ওঁ

"আমাদের দেশে আশীর্বাদ করে শতায়ু হও। সে আশীর্বাদ দৈবাৎ হয়তো কখনো ফলে, কখনো ফলে না। কিন্তু বিধাতা যাঁকে আশীর্বাদ করেন, তিনি দেহ-যাত্রার সীমা অতিক্রম করে শত শত শতাব্দীর আয়ু লাভ করে থাকেন। সেই বর লাভ করেছেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। উপনিষদ বলেন—য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি। যাঁরা তাঁকে জানেন, তাঁরা মৃত্যুর অতীত হন। এই অমৃত তাঁর জীবনে পেয়েছেন কেশবচন্দ্র। সেই অমৃত তিনি বিশ্বজনকে নিবেদন করেছেন, সেই তাঁর প্রসাদ স্মরণ করে তাঁর আগামী বহু শতবার্ষিকীর প্রথম শতবার্ষিকীর দিনে সেই অমিতায়ুকে আমাদের অভিনন্দন জানাই।

১৩ই পৌষ ১৩৪৫। ১৯৩৮॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর শ্রদ্ধা এই চারটি বাণী ও ভাষণ থেকে প্রমাণিত হয়।

রবীন্দ্রসাহিত্যে কোথাও কি ব্রহ্মানন্দের ছায়া পড়েছে? রবীন্দ্রনাথ কেশবকে বলেছেন—কবি, মনীষী, ঐশীশক্তিবিশিষ্ট প্রতিভা, অমৃতপ্রাপ্ত অমিতায়ু, সাধক। আমার মনে হয় চতুরঙ্গ উপন্যাসের নায়ক শচীশের উপর ব্রহ্মানন্দের ছায়া পড়েছে। হিন্দু কলেজের ছাত্র শচীশের সঙ্গে হিন্দু কলেজ জুনিয়র ও সিনিয়র বিভাগের ছাত্র

কেশবের মিল দুর্লক্ষ্য নয়। শচীশের ঈশ্বর-অন্বেষণের বিভিন্ন পর্বের সঙ্গে কেশবের ঈশ্বর-অন্বেষণের বিভিন্ন পর্বকে মিলিয়ে নেওয়া যায়। চতুরঙ্গে যেসব ভাবনার তরঙ্গের ওঠা-নামা হয়েছে তার সঙ্গে কেশবের 'জীবনবেদ' গ্রন্থের ভাব-তরঙ্গের মিল দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনবেদ' পড়েছিলেন, তা বলা যায়। স্কটিশচার্চ কলেজে প্রদত্ত সদ্য-উদ্ধৃত রবীন্দ্র-ভাষণের (১৯১০) সঙ্গে শচীশের একটি উক্তিকে (চতুরঙ্গ ১৯১৬) মিলিয়ে নেওয়া যায়: "আমি (শ্রীবিলাস) বলিলাম, যে কবি সে মনের ভিতর হইতে কবিতা পায়, যে কবি নয় সে অন্যের কাছ হইতে কবিতা নেয়। শচীশ অম্লান মুখে বলিল, আমি কবি।" শচীশের আত্মসাধনার কোনো প্রতিরূপ সংসারে যদি রবীন্দ্র-দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়ে থাকে, তার নাম ব্রহ্মানন্দের আত্মসাধনা।

॥ ৪ ॥ 'ধর্মপিতা'-'ধর্মপুত্র'

কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বলতেন 'ধর্মপিতা'। দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন হিন্দু কলেজের জুনিয়র বিভাগে (১৮৫০)। কিছুদিন হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজে (১৮৫৩-৫৪) পড়ার পর কেশবচন্দ্র ফিরে আসেন হিন্দু কলেজে সিনিয়র বিভাগে (১৮৫৪)। তিন বছর হিন্দু তথা প্রেসিডেন্সি কলেজে (১৮৫৫-৫৮) অধ্যয়ন করেন। কেশবচন্দ্রের বিবাহ হয় ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে। এ সময়ে (১৮৫৬) মেটকাফ হলে স্থাপিত কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরিতে তিনি নিয়মিত যেতেন। দর্শনগ্রন্থপাঠে তখনই তাঁর অনুরাগ দেখা যায়। এ সময়েই (১৮৫৭) প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রেরা স্থাপন করেন "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি"—সভাপতি ছিলেন কলেজের অধ্যাপক হেলিউর। সোসাইটির উদ্দেশ্য ছিল "সাহিত্য ও বিজ্ঞান অনুশীলন"। কেশবচন্দ্র এর উদ্যোগী সদস্য ছিলেন। কেশব-অগ্রজ নবীনচন্দ্রের নেতৃত্বে কলুটোলার সেন-পরিবারের ছেলেরা স্থাপন করলেন "কলুটোলা ইভনিং স্কুল" (১৮৫৬)। এখানে কেশব নিয়মিত পড়াতেন। এই নৈশ বিদ্যালয় চলেছিল চার বছর (১৮৫৬-৬০)।

এ সময়ে (১৮৫৬-৫৭) তরুণ কেশবচন্দ্র অধ্যাত্মজিজ্ঞাসায় ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। তখন রামমোহন রায়-প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে গণ্ডগোল দেখা দেয়। তত্ত্ব-বোধিনী সভা ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পরিচালনা নিয়ে কর্মাধ্যক্ষদের সঙ্গে প্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তীব্র মতভেদ ঘটে। দেবেন্দ্রনাথ এই গণ্ডগোলকে বলতেন 'ব্রহ্মগোল'। শেষে বিরক্ত হয়ে হিমালয় ভ্রমণে চলে যান (১৮৫৬), কলকাতায় ফিরে আসেন আড়াই বছর বাদে (১৫ নভেম্বর ১৮৫৮)।

ঠিক এ সময়ে (১৮৫৭) কেশবচন্দ্র ব্রাহ্ম সমাজে প্রবেশ করবার জন্য গোপনে প্রতিজ্ঞাপত্র লিখে ডাকে পাঠান। রাজনারায়ণ বসুর লেখা একটি পুস্তিকা পাঠ করে তরুণ কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের সম্বন্ধে প্রথম কিছু জানেন। এই পুস্তিকার 'ব্রাহ্মধর্ম কি?' অধ্যায় পড়ে তাঁর অন্তরের জিজ্ঞাসার সঙ্গে ঐক্য বোধ করেন ও ব্রাহ্মসমাজে

প্রবেশে আগ্রহী হন। এ সময় অর্থাৎ আঠারো থেকে কুড়ি বছর বয়সে (১৮৫৬-৫৮) তাঁর মনোভাব কী ছিল, 'জীবনবেদ' (১৮৮৩) গ্রন্থে কেশবচন্দ্র তার বিবরণ দিয়েছেন। কেশবচন্দ্রের জীবন প্রার্থনার জীবন। তার সূচনা হয় এই সময়ে। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন। তার অল্পকাল পরে তিনি 'প্রাতঃকালের প্রার্থনা' ও 'সন্ধ্যাকালের প্রার্থনা' লিখে মুদ্রিত করে "রেলগাড়ীতে এবং চুঁচুড়া থিয়েটারে বিতরণ" করেন ('ধর্মতত্ত্ব' ১৬ চৈত্র ১৭৯৭ শক) (দ্রঃ 'আচার্যের প্রার্থনা' প্রথম খণ্ড—পাদটীকা, পৃ ১, শতবার্ষিকী সংস্করণ ১৯৩৯)।

এ সময়ে কলুটোলা-ভবনে কেশবচন্দ্র একটি ক্ষুদ্র সভা স্থাপন করেন—'দি গুডউইল ফ্রেটার্নিটি' (১৮৫৭)। এই সভায় কমবয়সী যুবকরা 'ঈশ্বর আমাদের পিতা, আমরা পরস্পর ভাই' এই বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রার্থনায় বসতেন। এই সভা দুবছর (১৮৫৭-৫৯) চলেছিল। এই সভার কোন অধিবেশনে দেবেন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম কেশবচন্দ্রকে দেখেন (১৮৫৮-র শেষে)। তখন দেবেন্দ্রনাথের বয়স একচল্লিশ, কেশবচন্দ্রের উনিশ। প্রথম দর্শনে তাঁরা পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হন। সে অনুরাগ শেষ পর্যন্ত ছিল।

হিমালয় থেকে ফিরে এসে (১৫ নভেম্বর ১৮৫৮) দেবেন্দ্রনাথের প্রথম কাজ—'গুড-উইল ফ্রেটার্নিটি'র অধিবেশনে যোগদান। দ্বিতীয় কাজ—'তত্ত্ববোধিনী সভা' রহিতকরণ (মে ১৮৫৯)। তৃতীয় কাজ—কেশবের সহযোগিতায় 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা (৮ মে ১৮৫৯)। চতুর্থ কাজ—পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ও শিষ্য কেশবের সঙ্গে সিংহল ভ্রমণ (সেপ্টেম্বর অক্টোবর ১৮৫৯)। পঞ্চম কাজ—কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের পুনর্গঠন নভেম্বর ১৮৫৯)। এক বছরের মধ্যে (নভেম্বর ১৮৫৮—নভেম্বর ১৮৫৯) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এইসব কাজের ফল ব্রাহ্মসমাজ, বঙ্গসমাজ ও ভারতীয় সমাজের পক্ষে সুদূরপ্রসারী হয়েছিল।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের "অধ্যক্ষসভা" ১৮৫৯-এর ২৫ ডিসেম্বর পুনর্গঠিত হল। নূতন অধ্যক্ষ-সভার সভাপতি হলেন রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ রায়। সম্পাদক হলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেন। এযাবৎ ব্রাহ্মসভা তত্ত্ববোধিনী সভার অধীন ছিল। তত্ত্ববোধিনী সভা রহিত করে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজকে স্বয়ং সম্পূর্ণসভা রূপে পরিচালনার সুযোগ দিলেন। বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ান-পদের চাকুরি ছেড়ে কেশবচন্দ্র সর্বসময়ের জন্য ব্রাহ্মসমাজের কাজে আত্মনিয়োগ করেন ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১ জুলাই। হিমালয় ভ্রমণকালে দেবেন্দ্রনাথ অমৃতসরে শিখদের স্বর্ণমন্দির ও সঙ্গতসভা দেখে আসেন। তারই আদর্শে প্রধানত কেশবচন্দ্রের উৎসাহে স্থাপিত হয় "সঙ্গতসভা" (সেপ্টেম্বর ১৮৬০)। দুবছর পরে স্থাপিত হয় "ব্রাহ্মবন্ধু-সভা" (১৮৬৩)। এই দুই সভায় কেশবচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথের বহু গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। এসময় (১৮৬১) কলুটোলা সেনবংশের অভিভাবক ও কেশবের জ্যেষ্ঠতাত হরিমোহন সেন বৈষ্ণব কুলগুরুর কাছে অন্য ভাইদের সঙ্গে কেশবের দীক্ষার আয়োজন করেন। দীক্ষা গ্রহণের দিন ভোরে কেশব বাড়ি ছেড়ে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে আশ্রয় নেন।

দেবেন্দ্রনাথ ১৮৬২-র ১৩ এপ্রিল (১ বৈশাখ ১৭৮৪ শক) এক বিশেষ অনুষ্ঠানে কেশবচন্দ্রকে "ব্রহ্মানন্দ" উপাধিতে ভূষিত করেন। সেদিনই কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের "আচার্য" পদ পেলেন, দেবেন্দ্রনাথ হলেন "প্রধান আচার্য"।

এই বিশেষ অনুষ্ঠানের তিনমাস পূর্বে সপত্নীক কেশবচন্দ্র জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়িতে মাঘোৎসব অনুষ্ঠানে (১৮৬২) যোগ দিতে আসেন। সেই উপলক্ষে "অতিরিক্ত" প্রার্থনা সভা "অন্তঃপুরে" মহিলাদের সামনে অনুষ্ঠিত হয় (১১ মাঘ ১৭৮৩ শক, ২৩ জানুয়ারী ১৮৬২)। এই অনুষ্ঠানে দেবেন্দ্রনাথের প্রার্থনা ও তার উত্তরে কেশবচন্দ্রের প্রার্থনা (প্রথম লিখিত প্রার্থনা) এখানে উদ্ধার করি। (এ দুটি বিরলদৃষ্ট প্রার্থনা। দেবেন্দ্রনাথের প্রার্থনা 'স্তুতিমালা' পুস্তকে, সম্বত ১৯১৯, প্রথম মুদ্রিত, 'নববিধানে' ১৮ ফেব্রুআরি ১৯২৬-সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত। কেশবের প্রার্থনা গৌর-গোবিন্দ উপাধ্যায়ের 'আচার্য কেশবচন্দ্র' প্রথম খণ্ড, ১৬২-৬৩ পৃষ্ঠায় প্রথম মুদ্রিত। দুটিই যামিনীকান্ত কোঁয়ার-কর্তৃক ইংরেজি অনুবাদসহ মার্চ ১৯৩৫-এ 'টু ডকুমেণ্টস রিপ্রিনটেড' নামে মুদ্রিত ও পীস কটেজ, ৮৪ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা থেকে প্রকাশিত। এই প্রার্থনা সম্ভবত ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে প্রথম অন্তঃপুর-প্রার্থনা।)

। দেবেন্দ্রনাথের প্রার্থনা ।

১১ মাঘ ১৭৮৩ শক।

ব্রাহ্মধর্ম প্রচার বিষয়ে ঈশ্বরের কৃপা জন্য ধন্যবাদ।

(অন্তঃপুর)

"হে পরমাত্মন! তোমার যে অনুগত, তুমি তাহাদিগকে আশাতীত ফল প্রদান কর। আমার যাহা আশা ছিল, তাহার অতীত ফল প্রদান করিয়াছ। প্রথমে আমি কেবল একেলাই তোমাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল থাকিয়া তোমাকে অন্বেষণ করিয়াছিলাম, অন্যের জন্য ব্যাকুলতা কিছুই ছিল না। তুমি আমার সেই তৃষিত আত্মাকে তোমার অমৃত বারিতে শীতল করিলে। যখনই সংতৃপ্ত হইলাম, তখনই সেই অমৃত আবার অন্যের নিকট প্রচার করিতে মন উৎসুক হইল। আমি নিশ্চয় জানি যে, তোমার সেই গুরুভার বহন করিতে আমার কোন সাধ্য নাই, তথাপি না করিয়াই বা কি করি, আমার হৃদয়ে তুমি বারংবার একটি উদ্বোধন করিতে লাগিলে যে, আমার এই অমৃত সলিল তুমি সকলকে পরিবেশন কর; আমি কি করি আমি ক্ষুদ্র, আমি কিরূপে এই ভার অন্যকে উত্তোলন করিয়া দিব, অথচ দিতেই হইবে; আমি আপনি অবশ হইয়া তাবল্লোকেরই সহায়তা প্রার্থনা করিলাম, কাহারও নিকট হইতে প্রকৃত সাহায্য প্রাপ্ত হইলাম না, মনে হইল তুমি যে ভার আমাকে অর্পণ করিলে, তাহা বুঝি আমি সিদ্ধ করিতে পারিলাম না। তেমন সহায় পাইলাম না, তেমন কোন লোক পাইলাম না, আমি একেলা কিরূপে তোমার সেই গুরুভার বহন

করিয়া অন্যকে আস্বাদন দিব, কাহাকেই বা দিব ? অন্তরে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, বলি সে অগ্নি কোথায়, বুঝি তাহা বঙ্গদেশে প্রস্তুত হইল না। হে অগ্নি! কেন তুমি আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয় কোটরেই আবদ্ধ রহিয়াছ ? তুমি উৎসের ন্যায় উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়, ভারতভূমির মোহান্ধকার ও কলুষিত বায়ুকে বিনাশিত কর, পৃথিবীকে এক দাবানলময়ে আবেষ্টন কর। এই প্রকার আর্তনিনাদে বক্ষস্থল আর্দ্র করিতে লাগিলাম ; তুমি আশ্বাস দিলে ও কোমল হস্তে আমার অশ্রুজল মোচন করিতে লাগিলে। এতদিন পরে তোমার প্রসাদে তোমার প্রেরিত সাধুজনকে দর্শন করিয়া আমার আশা বৃদ্ধি হইল। সেই সাধু যুবা যিনি অদ্য আমার আলয়ে সস্ত্রীক আসিয়া আমার গৃহকে উজ্জ্বল করিলেন, তাঁর সঙ্গে যতই সহবাস করি, ততই আমার আশা বৃদ্ধি হয়, ততই কৃতার্থ হই। তিনি, যিনি আমার পুত্র হইতেও প্রিয়তর, আমার অভিন্ন হৃদয়, এক হৃদয়, যিনি ঈশ্বরের পরিশুদ্ধ ব্রহ্মানন্দ নিয়তই পান করিতেছেন। আমি যত লোকের সঙ্গে সহবাস করিয়াছি, এমত পবিত্র, এমত দৃঢ়ব্রত, এমত জ্ঞানালোকে ধর্মবলে বিভূষিত ব্রহ্মপরায়ণ কোথাও দেখি নাই, তিনি আজ সস্ত্রীক হইয়া আমার গৃহকে উজ্জ্বল করিলেন।

প্রথমে কেবল আমি একেলাই ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, এখন আমার উত্তরাধিকারী পুত্র, কন্যা, পুত্রবধূ, পৌত্র, প্রপৌত্র সকলেই আমার ভাগের অংশ পাইবেন। প্রথমে ধর্মপ্রচারের প্রতি আমার কিছুমাত্র লক্ষ্য ছিল না, কিসে নিজে তোমাকে প্রাপ্ত হই, কিসে আপনাকে আমি পবিত্র করি, এই আমার পরম লক্ষ্য ছিল ; কিন্তু যখনই তোমাকে লাভ করিয়াছি, তখনই আমার হস্ত তোমার সুধা পরিবেশন করিতে ব্যগ্র হইয়াছে। অমনি আমার জিহ্বা তোমার মহিমা ঘোষণা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এক্ষণে হে পরমাত্মন্, তুমি যে সাধুসজ্জনকে এই পৃথিবীর উন্নতির নিমিত্ত এখানে প্রেরণ করিয়াছ, তাঁর দুর্বল শরীরে বল বিধান কর, তাঁকে জ্ঞান প্রীতি ও পবিত্রভাবে দিন দিন উন্নত কর, তোমার কৃপাতে ইনি আমার এই বৃদ্ধ বয়সের অবলম্বন হইয়া আমার সহায়তা করুন।

যাঁহারা তোমার উপাসনার নিমিত্ত অদ্য সদ্ভাবে সম্মিলিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের হৃদয়কে তোমার প্রতি আকর্ষণ কর। তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি প্রীতিভাবকে সমুজ্জ্বল কর। ভ্রাতায় ভ্রাতায়, ভ্রাতায় ভগিনীতে অকৃত্রিম সৌহার্দতার বিস্তার কর। পুত্র-দিগের পিতা মাতার প্রতি ভক্তিভাব প্রেরণ কর। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অনুরাগ ও স্ত্রীর প্রতি স্বামীর প্রেমকে উজ্জ্বল কর। কেহই যেন এই সংসারের দুঃখ শোকসন্তাপে অমঙ্গল আশঙ্কা না করে এবং তোমার অনুরাগে বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যেও তোমাকে লাভ করে।"

কেশবের প্রার্থনা

"জগদীশ! আমি অদ্য পিতা মাতা* ভগিনী ও স্ত্রীতে পরিবেষ্টিত হইয়া

* কেশবচন্দ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে ধর্মপিতা, তাঁহার পত্নীকে ধর্মমাতা, এবং তাঁহাদের কন্যাগণকে ভগিনী বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তাই এস্থলে পিতামাতা ভগিনী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

তোমাকে পরম পিতারূপে সর্বত্রই প্রত্যক্ষ করিতেছি। তুমি আমার পরমপিতা, হৃদয়ের ঈশ্বর। চিরকাল তুমি আমাদিগকে তোমার ক্রোড়ে লইয়া মাতার ন্যায় লালন-পালন করিয়াছ, কতপ্রকারে সুখী করিয়াছ, কত রাশি রাশি বিঘ্ন হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছ। গতবর্ষ এই পরিবারের কত প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল, কত লোক ইহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল, কিন্তু বাস্তবিক আমাদিগের কোন বিঘ্ন হয় নাই। যেখানে মঙ্গলময় স্বয়ং আশ্রয় দিতেছেন, সেখানে আবার বিঘ্ন কি? অনেকেই আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে বটে, কিন্তু তুমি যখন এ পরিবারের গৃহদেবতা, তখন আর আমাদিগের ভয় কি? তুমি যখন আমাদের সহায়, তখন আমাদের মঙ্গলই হইবে সন্দেহ নাই। এ পরিবার তোমারই পরিবার।

অদ্য আমরা সেই জীবনদাতাকে প্রত্যক্ষ করিয়া জীবন সার্থক করিতেছি। আমরা এখন কি দেখিতেছি,—না, চতুর্দিকে মঙ্গলের উন্নতি, ব্রাহ্মধর্মের উন্নতি। আমাদের যে একটি আশা আছে যে, সমুদায় পৃথিবী এক পরিবারে বদ্ধ হইবে, এ আশা বৃথা হইবার নহে। যথাক্রমে গৃহে গৃহে যোগ হইয়া সকলেই প্রীতিরসে মিলিত হইবে, সকল পরিবারই এক হইবে। অদ্য এই বঙ্গদেশের মধ্যে তাহার সূত্রপাত হইল।

হে জগদীশ! এ সংসারে এ পরিবারকে রক্ষা করিবার আর কেহই নাই, তুমিই ইহাকে রক্ষা কর। তুমি যে গৃহের অধিদেবতা, তাহার আর অমঙ্গল কোথায়? এ পরিবারই তাহার প্রমাণ। সহস্র সহস্র বিঘ্ন আসিয়া ইহাকে পরিবেষ্টন করিতেছে, অথচ ইহা সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তোমারই ক্রোড়ে অগ্রসর হইতেছে। এ বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যেও আমাদের ক্লেশ নাই, ভয় নাই, কেবল আমাদেরই উৎসব উৎসারিত হইতেছে। কি আশ্চর্য! আমরা মাতা পিতা ভ্রাতা ভগিনী স্ত্রী সকলেই এখানে একত্র হইয়া ঈশ্বরের চরণে পূজা উপহার দিতেছি।

ধন্য পরম পিতা, আশ্চর্য তোমার করুণা, পৃথিবীর এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্যন্ত তোমারই মহিমা ঘোষণা হউক, বিশুদ্ধ প্রেম ও পবিত্র ভাব চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ হউক। আমরা যেন লোকভয়ে ভীত না হই। আমরা যেন সাংসারিক সুখের জন্য লালায়িত না হই, আমাদের আত্মা যেন সাংসারিক সকল বিষয়েই শান্ত ভাব অবলম্বন করে। তোমাকে পাওয়াই যেন আমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য থাকে।"

তিন মাস পরে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ এপ্রিল (১ বৈশাখ ১৭৮৪ শক) এক বিশেষ অনুষ্ঠানে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়িতে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে কেশবচন্দ্রকে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধিতে ভূষিত করেন ও ব্রাহ্মসমাজের আচার্যপদে প্রতিষ্ঠিত করেন।

ব্রহ্মানন্দকে সম্বোধন করে মহর্ষি বলেন—

"শ্রীমান্ কেশবচন্দ্র! তুমি মহভার গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ। আমি জানিতেছি যে তাহাতে তোমার দ্বারা এ ধর্মের অশেষ উন্নতি হইবে। তুমি এই গুরুভার অপরাজিতচিত্ত হইয়া অহোরাত্র বহন করিবে। কিসে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ

উন্নত হয়, কিসে ব্রাহ্মদিগের মনের মালিন্য দূর হয়, এ প্রকার যত্ন করিবে। অন্য কোনও প্রচলিত ধর্মের প্রতি দ্বেষ কি নিন্দাবাদ করিবে না, কিন্তু যাহাতে সকল ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ঐক্যবন্ধন হয়, এমত উপদেশ দিবে। আপনার আন্তরিক ভাব অকপট হৃদয়ে নির্ভয়ে ব্যক্ত করিবে, সদা নম্র স্বভাব হইবে। বৃদ্ধদিগকে সমাদর করিবে। যাহার যে প্রকার মর্যাদা তাহাকে সেই প্রকার মর্যাদা দিবে। তুমি যে কর্মে অগ্রসর হইয়াছ, এ অতি দুরূহ কর্ম। কিন্তু অল্পবয়স্ক মনে করিয়া আপনাকে অবজ্ঞা করিও না। আমাদের ব্রাহ্ম ধর্মের প্রবর্তক মহাত্মা রামমোহন রায় ধর্মের জন্য ষোড়শ বৎসরে দেশত্যাগী হইয়াছিলেন। সেই ষোড়শ বৎসরে তিনি যে ভাব দ্বারা নীয়মান হইয়াছিলেন, সেই ভাব তাঁহার হৃদয়ে চিরদিনই ছিল। প্রথম বয়সে যাঁহারা ধর্মের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেন, তাঁহারা কদাপি অবসন্ন হন না। তুমি আপনার ইচ্ছার সহিত প্রাণ হৃদয় মন সকলি ঈশ্বরেতে সমর্পণ কর। না ধনের দ্বারা, না পূজার দ্বারা, কিন্তু কেবল ত্যাগের দ্বারাই তাঁহাকে লাভ করা যায়। ধর্মের জন্য ত্যাগ স্বীকার করিতে ক্ষুব্ধ হইবে না। কলিকাতার ব্রাহ্মদিগের হৃদয়ে ব্রাহ্মধর্ম বীজ প্রাণপণে রোপণ করিবে।

এক্ষণে তুমি আপনার আত্মাকে সেই অমৃত সাগরে নিমগ্ন কর। সেই জগত-প্রসবিতা পরমদেবতার বরণীয় শক্তি ধ্যান কর, যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন।

ঈশ্বর তোমাকে এক্ষণে আপনার অমৃত সলিলে অভিষিক্ত করিতেছেন। তাঁহার আদেশে আমিও তোমাকে এই আচার্যপদে অভিষিক্ত করিতেছি। তুমি কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের আচার্যপদ ধারণ করিয়া চতুর্দিকে শুভ ফল বিস্তার কর।

এই ব্রাহ্মধর্ম-গ্রন্থ গ্রহণ কর। যদিও হিমালয় চূর্ণ হইয়া ভূমিসাৎ হয়, তথাপি ইহার একটিমাত্র সত্য বিনষ্ট হইবে না। যদি দক্ষিণ-সাগর শুষ্ক হইয়া যায়, তথাপি ইহার একটি সত্যেরও অন্যথা হইবে না। যে প্রকারে পূর্বে অগ্নিহোত্রীরা অগ্নিকে রক্ষা করিতেন, তুমি এই ব্রাহ্মধর্মকে তদ্রূপ রক্ষা করিবে।

হে ব্রাহ্মগণ! তোমরা অদ্যাবধি এই কলিকাতার আচার্যের প্রতি অনুকূল হইয়া ইঁহার কথা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিবে, তাহাতে ব্রাহ্মধর্মের অবশ্যই গৌরব বৃদ্ধি হইবে॥"

এখানে পুনঃস্মর্তব্য ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে স্থাপিত হয় 'সঙ্গত সভা'।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বরে প্রকাশিত হয় কেশবচন্দ্রের "ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান"। এই পুস্তিকাটি "সঙ্গতের এক বৎসরের আলোচনার ফল। ইহাতে পৌত্তলিকতা শীর্ষক আলোচনায় সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে উপবীত গ্রহণ করিবে না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহা পাঠ করিয়া উপবীত পরিত্যাগ করেন। গঃ—"

প্রকাশক গণেশপ্রসাদের এই পাদটীকায় জানা যায় সঙ্গতসভায় নানা বিষয়ে তরুণ ব্রাহ্মেরা আলোচনা ও সিদ্ধান্ত করতেন। "ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান" পুস্তিকার

প্রসঙ্গগুলির নাম এখানে দিই : উপাসনা, আত্ম-পরীক্ষা, আমোদ, অর্থব্যয়, অভ্যর্থনা, সময়, সত্য বাক্য, নির্ভর, কর্তৃত্ব, কৌতূহল, পৌত্তলিকতা, সংসার, প্রীতি, মোহ, ভ্রাতৃ-সৌহার্দ, পবিত্রতা, জীবনের লক্ষ্য, কর্তব্যশ্রেণী, লোকভয়, ত্যাগস্বীকার, উপদেষ্টার কর্তব্য। এইসব প্রসঙ্গের আলোচনায় নেতৃত্ব দিতেন কেশবচন্দ্র, এবং কোন সন্দেহ নেই, তাঁর বক্তব্যই শেষে গৃহীত হ'ত।

সঙ্গতসভার এই আলোচনা বঙ্গীয় যুবকসমাজে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। কেশবচন্দ্র কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজকে স্থাণু ঘরোয়া প্রতিষ্ঠান না রেখে গতিশীল প্রকাশ্য সংগঠন রূপে গড়ে তুললেন।

১৮৬১ থেকে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দ—পাঁচ বছরের মধ্যে 'ধর্মপিতা' ও 'ধর্মপুত্রে'র মধ্যে গুরুতর মতান্তর ঘটল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে কেশবচন্দ্র প্রমুখ নবীন ব্রাহ্মদের সংঘর্ষ বাধল তিন কারণে। "প্রথম, মহর্ষির ধর্মসাধনের সঙ্কীর্ণতা, দ্বিতীয়, মহর্ষির ধর্মমতের একদেশদর্শিতা, তৃতীয়, ব্রাহ্মসমাজের কার্যপরিচালনায় মহর্ষির একতন্ত্রতা বা অটোক্রাসি। মহর্ষি ব্রাহ্মধর্মকে কেবল ব্রহ্মোপাসনার মধ্যেই কার্যতঃ আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। ব্রাহ্ম মতবাদকে জীবনের সকল কর্মে এবং সকল সম্বন্ধের মধ্যে গড়িয়া তুলিতে হইবে, এ ভাবটা তখনও ব্রাহ্মসমাজে প্রবল হয় নাই। কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার বন্ধুগণ ব্রাহ্ম মতবাদের আদর্শে ব্রাহ্মদিগের জীবন গড়িয়া তুলিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা কহিলেন, ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া ব্রহ্মোপাসনার সময়ে এক কথা কহিব, এক ভাবেতে অনুশীলন করিব, মনে মনে এক আদর্শের ধ্যান করিব, আর মন্দির হইতে ফিরিয়া বাড়ী যাইয়া পরিবারে এবং সমাজে অনুরূপ আচার আচরণ করিব, ইহা সঙ্গত নহে। ইহাতে সত্যের প্রতি সম্যক্ মর্যাদা প্রকাশ হয় না। যাহা সত্য বুঝিব তাহা জীবনের সর্ববিধ ব্যাপারে মানিয়া চলিব। অন্তরের ধর্মবুদ্ধির বা বিবেক বা conscience অনুযায়ী সমগ্র জীবনকে গড়িয়া তুলিতে হইবে, ইহাই ব্রাহ্মধর্মের সত্য আদর্শ। এই লইয়াই মহর্ষির সঙ্গে তাঁহাদের বিরোধ বাধে।" (বিপিনচন্দ্র পাল—'ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র', বঙ্গবাণী ১৩২৯/১৯২২ খৃ/ বাংলার নবযুগের কথা)।

এই বিরোধের ফল কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ (আদি ব্রাহ্মসমাজ) থেকে কেশবচন্দ্রের বিচ্ছিন্ন হওয়া ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা (১১ নভেম্বর ১৮৬৬)। অতঃপর দুজনের সংগঠন ও পথ ভিন্ন হয়ে যায়।

দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র আমরণ পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধানুরক্ত ছিলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বৈশাখ, ১৮৫৫ শকাব্দ, ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দ এপ্রিল সংখ্যায় কেশবকে লিখিত মহর্ষির দুখানি পত্র মুদ্রিত হয়। পত্রিকা-সম্পাদকের মন্তব্য—"ব্রহ্মানন্দের প্রতি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের যে কিরূপ সম্প্রীতি ও গভীর অনুরাগ ছিল নিম্ন প্রকাশিত দুইখানি পত্রে উহার পরিচয় সম্যক প্রকাশ পাইবে। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে উভয়ের মধ্যে এই অনুরাগ একটি আশ্চর্য ঘটনা।......এগুলি সম্ভবত কেশবচন্দ্রের

ব্রহ্মানন্দ উপাধিলাভের পরেই লিখিত হইয়াছিল।" পত্র রচনার অনুমিত কাল— ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি।

(১) কেশবকে লিখিত দেবেন্দ্রনাথের প্রথম পত্র (কর্তিত):

ওঁ

প্রাণাধিক কেশবচন্দ্র—

তোমার ৩রা শ্রাবণের পত্র গতকল্য পাইয়া অতিশয় ব্যাকুলিত হইলাম। অদ্যাপি তোমার পীড়ার শান্তি হইল না, আর ইহারই মধ্যে তুমি এই বাটী ভাড়া করিয়া থাকিতে বাধিত হইতেছ। ইহা ব্যতীত যখন আর কোন সদুপায় উপলব্ধি হইতেছে না, তখন আর ইহাতে কথা নাই। এখন আমার মনের সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করিবার তোমার সময় নহে।

[ইহার পরবর্তী অংশ কর্তিত]

(২) কেশবকে লিখিত দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পত্র (* চিহ্নিত অংশ কর্তিত):

প্রাণাধিক কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দ সমীপেষু—

তোমার ১০ই ভাদ্রের পত্র পাইয়া অতীব বিষণ্ণ ও ব্যাকুল হইলাম। "যে ক্ষুদ্র গৃহে পরিবার অবস্থিতি করিতে দেখেন, সেই গৃহে গত শুক্রবারে আসিয়াছি"—এই পংক্তি আমার হৃদয়ে যেন বজ্রাঘাততুল্য বোধ হইল। আমি কখনো মনে করি নাই যে, তুমি এই তোমার রুগ্‌ণ শরীর লইয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিবে। তুমি সহজে যে একেবারে স্বীকার করিলে, তাহা শুনিয়া আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়। তোমার জন্যে এই কলিকাতায় এমন গৃহ আর পাওয়া গেল না, যেখানে তুমি সুস্থ মনে বায়ু সেবন …………এবং প্রশস্ত মনে সপরিবারে থাকিতে পার! তোমার এ দুর্বল শরীর লইয়া সে ক্ষুদ্র গৃহে যাওয়া কদাপি যুক্তিসিদ্ধ হয় নাই। তুমি মনে করিলে ইহা হইতে উত্তম গৃহে যাইতে পারিবে। তোমার শরীরের উপর এমন অযত্ন দেখিয়া আমি নিতান্ত অবসন্ন হইয়াছি। আমি……… আর আমার……. বাটী অবারিত……। আমি তোমার কোন কার্যে আইলাম না; এই পীড়ার সময়ে তোমার থাকিবার জন্যে একটি উপযুক্ত গৃহ দিতে পারিলাম না। তুমি যাতে মনের শক্তিতে এবং শরীরের আরামে থাকিতে পার সেই উপায়ই অবলম্বন করিবে। এজন্য তোমার প্রতি আমার নিতান্ত অনুরোধ। একথা আমার এখনো অত্যুক্তি নয় যে, তোমার মঙ্গল ও সুখের সঙ্গে আমার মঙ্গল ও সুখ অনুবিদ্ধ হইয়া গিয়াছে; তুমি আপনার অন্তর দেখিলেই আমার একথায় সায় দিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যদিও বর্তমান অবস্থাতে বাটী ভাড়া করিবার………নাই, সকল অপেক্ষা উত্তম কল্প স্থির হয়, তথাপি আমার এই কথাটী রক্ষা করিবে। যে পর্যন্ত তোমার আরোগ্যলাভ না হয়, সে পর্যন্ত সেই গৃহ-নির্বাচনভার সম্পূর্ণরূপে আপনার উপর লইবে না। যে সামগ্রীর প্রয়োজন হয়, কৈলাস

মুখোপাধ্যায়কে * তাহার আদেশ দিবে। পীড়ার সময়ে নূতন গৃহকর্মের ভার লইয়া ব্যস্তসমস্ত হইবে না।

আমরা পূর্বদিন যে তোমার আরোগ্য দেখিয়া আমরা সকলে উৎসাহপূর্বক তোমাকে নূতন গৃহ-প্রবেশ করাইতাম তাহা হইল না। এই কাল আমাদের প্রতিকূল হয়েছে। সেই ঈশ্বর যেমন আমাদের পূর্বেও অনুকূল এখনও অনুকূল। তিনি অবশ্য সকল অবস্থা ও সকল ঘটনার মধ্যে মঙ্গলেরই বিধান করিবেন। তুমি অসহ্য শারীরিক ও মানসিক ক্লেশে যেরূপ সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তা অভ্যাস করিয়াছ, ইহাতে ঈশ্বরপ্রসাদে ধর্মযুদ্ধে তুমি অদ্বিতীয় সেনাপতি হইবে। যেন এই ঘোর বিপত্তিকালে তোমার জীবনসহায় তোমার সহায় হউন; তোমার হৃদয়ে আলোক ও ধৈর্য প্রেরণ করিয়া সংসার-সঙ্কট হইতে রক্ষা করুন। তিনি তোমার ঔষধ, তিনি তোমার বল, তিনি তোমার আনন্দ হউন, তিনি তোমাকে রক্ষা করুন।

তদীয় শুভানুধ্যায়িনঃ
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্মণঃ

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র 'নববিধান' ঘোষণা করেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'মাঘোৎসব' গ্রন্থখানি। নববিধানাচার্য রূপে কেশবচন্দ্র যে প্রার্থনান্তিক ভাষণ দিতেন, তারই সংকলন এই গ্রন্থ। 'মাঘোৎসব'-এর প্রথম প্রার্থনা-ভাষণটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ ভাষণে 'ধর্ম-পিতামহ' রামমোহন ও 'ধর্মপিতা' দেবেন্দ্রনাথের প্রতি কেশব তাঁর গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। এই ভাষণের শিরোনাম—"মহাত্মা রামমোহন রায় ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর" (ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে প্রদত্ত ভাষণ। শনিবার ১৮ পৌষ ১৮০২ শক। ১ জানুআরি ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ)। এখানে স্মর্তব্য কয়েকটি সাল-তারিখ: রামমোহন কর্তৃক ব্রহ্মসভা স্থাপন (১৮২৮)। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন (১৮৩০)। উনিশ বছর বয়সে কেশবের ব্রাহ্মসমাজে যোগদান (১৮৫৭)। কেশব-কর্তৃক ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন (১৮৬৬), নববিধান ঘোষণা (১৮৮০)।

নববিধানাচার্যের ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ১ জানুআরির প্রার্থনান্তিক ভাষণের প্রাসঙ্গিক অংশ:

"সাধুভক্তি যদি আমাদিগের প্রতি ঈশ্বরের আদেশ হয়, তবে আমরা কি রামমোহনকে বিদায় দিতে পারি?......ভয়ানক পৌত্তলিকতার বন কাটিয়া তিনি এক খণ্ড ভূমি আবাদ করিলেন। সেখানে কতকগুলি প্রজার বসতি করিয়া দিলেন। .... এই ব্রাহ্মসমাজের তিনি ধর্মপিতামহ, তিনি পরলোকে আছেন, তাঁহার জন্য প্রার্থনা করিব। পরাৎপর পরব্রহ্ম তাঁহার ঈশ্বর।.........তাঁহার স্তবস্তুতিতে, বিদ্যা-

* দেবেন্দ্রনাথের স্বাক্ষর। পত্রটি G. C. Banerji (compiled) Brahmananda Keshab Chandra Sen—Testiomonies in Memoriam, Vol I (1934) থেকে গৃহীত।

বুদ্ধিতে পবিত্র ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হইল, এইজন্য তাঁহার নাম কৃতজ্ঞতাফুলে গলায় জড়াইয়া রাখি।.........আমাদিগের ধর্মপিতা পরে আসিলেন। তিনি জীবিত আছেন। পিতামহকে বিস্মরণ হওয়া যেমন অসম্ভব, পিতাকে বিস্মৃত হওয়া তেমন অসম্ভব। তাঁহার ঋষিভাব, যোগভাব, বিশুদ্ধ প্রীতির ভাবের নূতন সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে যুক্ত হইলাম। তিনি তাঁহার পূর্বপুরুষগণের নিকট যাহা পাইয়াছিলেন, তাহার তিনি নিয়মাদি স্থির করিলেন। একটি অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসকমণ্ডলীর রাজ্য স্থাপিত হইল।.........ইনি বর্তমান ভারতবর্ষীয় ঋষি আত্মা। এই পবিত্র ঋষি আত্মা—দেবেন্দ্রনাথের আত্মা, বঙ্গবাসীর মন সবল ও সুস্থ করিল।"

জীবনের শেষ প্রহরে কেশবচন্দ্র এভাবেই ধর্মপিতা দেবেন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা জানিয়েছেন (১ জানুআরি ১৮৮১)। এর ঠিক চার বছর পরে (৮ জানুআরি ১৮৮৪) কেশবচন্দ্র লোকান্তরিত হন।

॥ ৫ ॥ কেশবের গদ্যরচনার প্রথম পর্ব (১৮৫৭-১৮৭২) ॥

কেশবচন্দ্র সেনের বাংলা রচনার ব্যাপ্তি পঁচিশ বৎসর (১৮৫৯-১৮৮৪)। তার পূর্বেই তিনি যে সামান্য বাংলা গদ্য (প্রাতঃকালের প্রার্থনা, সন্ধ্যাকালের প্রার্থনা) লেখেন তা রচিত হয় কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে যোগদানের (১৮৫৭) পরেই। 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকায় (১৬ই চৈত্র ১৭৯৭ শক-সংখ্যায়) এই সংবাদ মুদ্রিত হয়। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে যে ভ্রাতৃসভা স্থাপিত হয়, তারই নাম সঙ্গতসভা। শিখদের ধর্মপ্রসঙ্গের সভার নামানুযায়ী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সভার নামকরণ করেন। কলুটোলায় কেশবচন্দ্রের ভবনে, কলুটোলায় অপর এক স্থানে, আর সিমলা-অঞ্চলে তিনটি সঙ্গতসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। "এই তিনটি সঙ্গত সভার একত্রে একটি মাসিক অধিবেশন হইবে স্থির হইল। এই মাসিক সভা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ভবনে হইত। কিছুদিন এইরূপে কার্য চলিল বটে, কিন্তু ক্রমেই সকলের উৎসাহ এবং সৎপ্রসঙ্গের বিষয় শেষ হইয়া আসিল। এবং এইরূপে সিমলা ও কলুটোলার সঙ্গত সভা কালগ্রাসে নিপতিত হইল। কিন্তু উৎসাহের অবতার ব্রহ্মানন্দের উৎসাহ আর কমে না, বরং দিন দিন প্রবল হইতে লাগিল। সেই অদম্য উৎসাহ লইয়া স্বীয় ভবনে প্রিয় সঙ্গতের কার্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। তিনিই এই সঙ্গতের সভাপতি ছিলেন। প্রতি সপ্তাহে একদিন বিশেষ ভাবে ইহার অধিবেশন হইত। কিন্তু ব্রহ্মানন্দের গৃহে কলুটোলায় প্রতিদিনই ধর্মপ্রসঙ্গের মহোৎসাহ চলিত। বৈকাল ৫টা হইলেই যুবকদের সমাগম আরম্ভ হইত। উৎসাহ উদ্যম আর হ্রাস হইত না। রাত্রি ২টা ৩টা পর্যন্ত ক্রমাগত এইরূপ চলিত। কখনও কখনও রাত্রি ভোর হইয়া যাইত। প্রায় সমস্ত রাত্রি কেবল উপরে যাওয়া এবং নীচে আসার শব্দ। বাড়ীর কর্তারা বিরক্ত হইয়া বলিতেন, "এদের কি বাড়ী ঘর দুয়ার নাই? কেশব এদের করলে কি?" এই উৎসাহ উদ্যমের ভিতর দিয়া, সঙ্গতের প্রথম বৎসরের ফল 'ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান' প্রকাশিত হয়। ইহা ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ, নবেম্বর মাস—১৭৮৩ শক,

অগ্রহায়ণ মাসের তত্ত্ববোধিনীতে প্রথম মুদ্রিত হয়। পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ।" (সঙ্গত। নববিধানাচার্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। ১ম সং। ব্রাহ্ম ট্রাক্ট সোসাইটী। ৭৮নং অপার সারকিউলার রোড। কলিকাতা। ১৮৩৮ শক—১৯১৬ খৃষ্টাব্দ। প্রকাশক গণেশ প্রসাদের ভূমিকা, ১লা জুন ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ।)

এই বিবরণ থেকে জানা যায়, ১৮৬০-১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র-প্রদত্ত আলোচনা "ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান" নামে প্রকাশিত।

কেশবচন্দ্রের, নিজের কথায়, রামমোহন তাঁর 'ধর্মপিতামহ' আর দেবেন্দ্রনাথ 'ধর্মপিতা'। রামমোহনের গদ্যের দ্বারা তিনি কোনমতেই প্রভাবিত নন। রামমোহন রায় ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের গদ্যচর্চার পরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হাতেই বাংলাগদ্য অর্জন করে শিল্পগত সৌষ্ঠব, স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তা। বাংলাগদ্যবাক্যে খণ্ডবাক্যের সজ্জা (clause-arrangement) ও সুষ্ঠু পদান্বয় (syntax) বিদ্যাসাগরের কীর্তি। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার উপদেষ্টা ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত ও বিদ্যাসাগর। ত্রয়ীর মধ্যে গদ্যশিল্পীরূপে অগ্রগণ্য বিদ্যাসাগর। একই সময়ে বাংলা গদ্যক্ষেত্রে দেখা দেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়। এসময়েই বাংলা গদ্যক্ষেত্রে কেশবচন্দ্রের আগমন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সহপাঠী-বন্ধু। তাঁরা প্রেসিডেন্সি কলেজের আইন বিভাগে পড়তেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভাব দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাস (১৮৬৫) নিয়ে। বাংলাগদ্যের প্রধান রূপকার-নিয়ামক ও বঙ্গসাহিত্য-নিয়ন্তা রূপে তিনি দেখা দিলেন যখন তিনি বঙ্গদর্শন-সম্পাদক (১৮৭২-৭৬)। তার পূর্বেই কেশবচন্দ্রের নিজস্ব গদ্যরীতি মোটামুটি তৈরি হয়ে যায়। পনের বছরে (১৮৫৭-১৮৭২) কেশবচন্দ্রের গদ্যের ধারাবাহিক পরিচয় থেকে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। স্মর্তব্য, ১৮৭২-এ ভারতাশ্রম স্থাপনের সময় পর্যন্ত কেশবচন্দ্র তাঁর সব বাংলা লেখা স্বহস্তে লিখতেন। এরপর থেকে তিনি এত কর্মব্যস্ত হয়ে পড়েন যে আর সম্ভব হয় না। অনুলেখকরা তা লিখে নিতেন। তবে "ধর্মতত্ত্ব" ও "ধর্মসাধন" পত্রিকায় প্রকাশের পূর্বে কেশবচন্দ্র তা দেখে নিতেন। তাঁর অনুমোদন ব্যতীত তা প্রকাশিত হত না, একথা জানা যায় কেশব-জীবনী থেকে।

পনের বছরে (১৮৫৭-১৮৭২) কেশবচন্দ্রের গদ্যের ক্রমবিকাশের একটি স্পষ্ট রূপ এখানে উপস্থিত করছি। এ থেকে প্রমাণ হবে, তিনি বঙ্কিমের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বা বঙ্কিমী গদ্যকে আদর্শ করে গদ্যচর্চা শুরু করেন নি।

উদ্ধৃত গদ্যাংশের তালিকা: [১] সন্ধ্যাকালের প্রার্থনা (১৮৫৭)—উৎস: 'আচার্যের প্রার্থনা ১ম ভাগ': শতবার্ষিকী সংস্করণ ১৯৩৯, পৃ ১, [২] কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ সম্পাদকের প্রতিবেদন (২২ ডিসেম্বর ১৮৬১)—'অধিবেশন' ১ম সং ১৯১৭, পৃ ৭, [৩] জীবনের লক্ষ্য। 'ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান' (১৮৬১)—'সঙ্গত', ১ম সং, ১৯১৬; পৃ ১৯-২০, [৪] চিরজীবন সখা (২৩ জানুআরি ১৮৬২)—'আচার্যের প্রার্থনা ১ম ভাগ' পৃ ২-৩, [৫] অভাববোধ (১৮ জুলাই ১৮৬৪)—'সঙ্গত', পৃ ৩-৪,

[৬] কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ প্রতিনিধিসভায় সম্পাদকের ভাষণ (৩০ অক্টোবর ১৮৬৪)—অধিবেশন, পৃ ১১-১২, [৭] স্ত্রীর প্রতি উপদেশ। প্রথম উপদেশ (১৮৬৫)—'স্ত্রীর প্রতি উপদেশ' ৯ম সং, ১৮৮৮, পৃ ২-৪, [৮] ব্রাহ্মসমাজের বর্তমান অবস্থা (জানুআরি ১৮৬৮)—সঙ্গত, পৃ ৬-৭, [৯] ব্রহ্মোৎসব—প্রার্থনা (নভেম্বর ১৮৬৭)—ব্রহ্মোৎসব, —, পৃ ৭-৮, [১০] প্রার্থনা (২৪ জানুআরি ১৮৬৮) 'আচার্যের উপদেশ ১ম খণ্ড' ১ম সং, ১৯১৬, পৃ ৩৩-৩৫, [১১] শুষ্কতা (৩ জুলাই ১৮৬৯)—সঙ্গত, পৃ ১৬-১৭, [১২] কার্য এবং আধ্যাত্মিকতা (২১ অক্টোবর ১৮৭০)-সঙ্গত, পৃ ৬০-৬১, [১৩] পাপ এককালে অসম্ভব হয় কিনা? (৯ নভেম্বর ১৮৭১)-সঙ্গত, পৃ ১২১-২২, [১৪] ভারতাশ্রম স্থাপনের উদ্দেশ্য (২০ জুন ১৮৭২)—সঙ্গত, পৃ ১৯৭-১৯৮।

(১) সন্ধ্যাকালের প্রার্থনা (১৮৫৭)—

হে পরমেশ্বর, আমাদের জীবনের একদিন অতীত হইল। হা! অন্ধ মহামোহে মুগ্ধ হইয়া কত শত পাপকর্ম করিয়াছি। অকৃতজ্ঞ ও অপ্রেমিক হইয়া তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচারণ করিয়াছি ও তোমার সুমধুর উপদেশ অবহেলা করিয়াছি। এক্ষণে কাতরভাবে এই নিবেদন করিতেছি যে, হে করুণাসিন্ধু, আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর ও আমরা যেন সেই সকল পাপে আর নিপতিত না হই, এই কামনা সিদ্ধ কর। আমাদিগকে তোমার সাহায্য প্রদান কর, যেন উত্তরোত্তর ঐহিক ব্যাপার হইতে উন্নত ও তোমার সন্নিহিত হইতে থাকি। অদ্য যে সকল সুখ সম্ভোগ করিয়াছি ও ধর্মকর্ম করিয়াছি, তজ্জন্য তোমাকে বার বার নমস্কার করিতেছি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

[প্রকাশকের পাদটীকা: "ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিবার অল্পকাল পরে আচার্যদেব এই দুইটি প্রার্থনা (প্রাতঃকালের প্রার্থনা ও সন্ধ্যাকালের প্রার্থনা) রচনা ও মুদ্রিত করিয়া রেলগাড়ীতে এবং চুঁচুড়া থিয়েটারে বিতরণ করিয়াছিলেন। ('ধর্মতত্ত্ব', ১৬ই চৈত্র, ১৭৯৭ শক।) আচার্যদেব ১৮৫৭ খৃঃ ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন।]

(২) কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের প্রতিবেদন (১৮৬১)—

আমার দ্বিতীয় প্রস্তাব এই যে, ব্রাহ্মসমাজের অধীনে একটী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তাহাতে অপরাবিদ্যার সহিত সুপ্রণালীতে ব্রহ্মবিদ্যার শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহা দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের যে অনেক সুবিধা হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। কলিকাতা ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ে সপ্তাহে একবার মাত্র উপদেশ দেওয়া হয়, এবং তাহাতে অতি অল্প লোক উপস্থিত থাকেন, অতএব ইহা দ্বারা আশানুরূপ ফললাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু সাধারণের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া, অনেকগুলি ছাত্রকে অন্যান্য বিদ্যার

সহিত ব্রাহ্মধর্মের উপদেশ দিলে এবং বাল্যকাল অবধি কোমল হৃদয়ে ব্রহ্মজ্ঞান মুদ্রিত করিলে, এদেশে শীঘ্রই কাল্পনিক ধর্ম ও কুসংস্কারের উচ্ছেদ হইবে, এবং সত্যের রাজ্য বিস্তৃত হইতে থাকিবে। প্রায় দুই মাস হইল, আমরা ইংলণ্ডে নিউম্যান্ সাহেবের নিকট বিদ্যাশিক্ষা-বিষয়ক যে আবেদনপত্র প্রেরণ করিয়াছিলাম, তাহাতেই কি আমরা নিশ্চিন্ত হইব, তাহাতেই কি আমাদিগের কার্যের পরিসমাপ্তি হইল? ব্রাহ্মদিগের উচিত যে, তাঁহারা শুভকর ব্যাপারে যেমন অন্যের সাহায্য প্রার্থনা করিবেন, সেইরূপ আপনারাও সাধ্যানুসারে তাহা সম্পাদন করিতে চেষ্টা করিবেন। অতএব যাহাতে এরূপ একটী বিদ্যালয় হয়, সে বিষয়ে সকলের সাহায্য দেওয়া উচিত।

(৩) জীবনের লক্ষ্য (১৮৬১)—

১। জীবনের কর্ম নানা প্রকার, অবস্থা নানা প্রকার কিন্তু ইহার লক্ষ্য এক—ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া।

২। যিনি সকল কার্যেতে একমাত্র ঈশ্বরকে লক্ষ্য করেন ও সমুদয় জীবন তাঁহাতে সমর্পণ করেন, তিনিই ব্রাহ্ম। সংক্ষেপে ব্রাহ্মের এই লক্ষণ জানিবে।

৩। ব্রাহ্ম যিনি তিনি কি আমোদ করেন না, না বিষয়কর্ম করেন না? করেন, কিন্তু তিনি বিষয়ী লোকের ন্যায় আমোদের জন্য আমোদ বা অর্থের জন্য বিষয়কর্ম করেন না; তাঁহার লক্ষ্য দিগ্‌দর্শনের শলাকার ন্যায় অহোরাত্র কেবল ঈশ্বরের দিকে স্থির রহিয়াছে।

৪। গ্রহগণ যেরূপ সূর্যের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে, এবং তাহাদের স্ব স্ব নির্দিষ্ট পথ কখনও অতিক্রম করে না, সেইরূপ ব্রাহ্মের জীবন ঈশ্বরকে মধ্যস্থলে রাখিয়া তাঁহার চতুর্দিকে বিচরণ করে ও দিন দিন সমুন্নত হয়।

৫। যখন এই লক্ষ্যটী জীবনের মধ্যদেশে থাকে, তখন সকল কার্যের সহিত ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ থাকে, কার্যই এক ভাব ধারণ করে, কিছুই বিচ্ছিন্ন বা বিশৃঙ্খল থাকে না। আমোদ ও ধনসংগ্রহ এমন যে নীচ কার্য, তাহা অবধি আর ঈশ্বরের উপাসনা ও ধর্মানুষ্ঠান পর্যন্ত একই কর্তব্যের মধ্যে আইসে।

৬। জীবনের কর্ম তিন প্রকার, স্বকীয়, পরকীয় এবং ধর্ম সম্বন্ধীয়। আপনার জন্য যে সকল কার্য করি, তাহা সামান্যতঃ চারি প্রকার,—শারীরিক কর্ম, আমোদ, বিদ্যাভ্যাস ও অর্থোপার্জন। অন্যের জন্য যাহা করি তাহা—গৃহকর্ম বা সামাজিক কর্ম, এবং ধর্ম সম্বন্ধীয় কার্য,—উপাসনা ও ধর্মানুষ্ঠান। এই সমুদয় কর্মের লক্ষ্য কেবল ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া। এই লক্ষ্যটী মধ্যবিন্দু এবং জীবনের সকল কার্য ইহার পরিধি-স্বরূপ হইয়া ইহাকে আবেষ্টন করিয়া থাকিবে॥

[প্রকাশকের পাদটীকা: "ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান" (১৮৬০-৬১) এই শিরোনামের অধীনে বিশটী বিষয় আলোচিত, তার অন্যতম 'জীবনের লক্ষ্য'। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ সেপ্টেম্বর মাসে সঙ্গতসভা স্থাপিত হয়। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ নভেম্বর মাসে "ব্রাহ্মধর্মের

অনুষ্ঠান" প্রকাশিত হয়। ইহা সঙ্গতের এক বৎসরের আলোচনার ফল। ইহাতে পৌত্তলিকতা শীর্ষক আলোচনার সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে উপবীত গ্রহণ করিবে না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহা পাঠ করিয়া উপবীত পরিত্যাগ করেন। পঃ—(গণেশ প্রসাদ, ব্রাহ্ম ট্রাক্ট সোসাইটির পক্ষে প্রকাশক।)]

(৪) চিরজীবনসখা (১৮৬২)—

হে পরমাত্মন, তোমার চরণের মঙ্গলচ্ছায়াতে আমাদিগকে রক্ষা কর। আমাদের সকলের আত্মাকে তোমার পবিত্র জ্যোতিতে পবিত্র কর। অদ্যকার উৎসাহ যেন অদ্যই অবসন্ন না হয়। তুমি যেমন অদ্য আমাদিগকে দেখা দিতেছ, এইরূপ চিরদিন নয়নের সমক্ষে থাকিয়া, সর্বদা পাপ তাপ বিঘ্ন হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। এই পৃথিবীতে আমাদের রক্ষা করিবার আর কেহ নাই। তুমিই আমাদের পিতামাতা, তুমিই আমাদের সুহৃদ। সংসারের অন্ধকার মধ্যে তুমি আমাদের আলোক; ভয় ও দুর্বলতার মধ্যে তুমি আমাদের বল; অনিত্য সম্পদের মধ্যে তুমি আমাদের চিরসম্পদ। নাথ, যখন তোমার পথের পথিক বলিয়া, তাবৎ সংসারী আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবে, তখন তুমি একাকী নিকটে থাকিয়া, চিরজীবনসখা চিরসুহৃদ বলিয়া আমাদিগকে আশ্রয় দিবে। তোমার ন্যায় সুহৃদ আর কোথায় পাইব? সংসার কেবল যন্ত্রণারই আধার, ইহার সুখ কেবল দুঃখের কারণ। অতএব, হে জীবনের জীবন, আমাদিগকে সংসারপাশ হইতে মুক্ত কর, এবং আমাদের সমুদয় প্রীতি তোমাতে স্থাপিত কর। তোমার নাম প্রত্যেক পরিবারে কীর্তিত হউক; সর্বত্র তোমার মহিমা মহীয়ান্ হউক। হৃদয়নাথ, তুমিই ধন্য, তুমিই ধন্য, তুমিই ধন্য।

[প্রকাশকের বিজ্ঞপ্তি : 'আদি ব্রাহ্মসমাজ—দ্বাত্রিংশ সাম্বৎসরিক, বৃহস্পতিবার, ১১ই মাঘ ১৭৮৩ শক; ২৩শে জানুয়ারি, ১৮৬২ খৃঃ।']

(৫) অভাববোধ (১৮৬৪)—

অভাব থাকিলে চিন্তা করিতে হয়, কিন্তু মনের সন্তোষ থাকিলে চিন্তাস্রোত হ্রাস পায়। অভাববোধ হইলে কখনই স্থির থাকিতে পারা যায় না। অভাববোধ হওয়া যে উচিত তাহা যেন এত কালের পর আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে; ইহা আমাদের মঙ্গলের একটি চিহ্ন বলিতে হইবে। যেমন শরীরের রোগ উপলব্ধি করিতে পারিলে তৎ প্রতীকারে চেষ্টা হয়, কিন্তু রোগ নাই এরূপ সিদ্ধান্ত করিলে প্রতীকারের কোন চেষ্টাই করা হয় না—এবং যেমন কোন কোন পীড়ায় অঙ্গবিশেষে ঔষধ প্রদান করিলে যদি তথায় কষ্ট অনুভূত হয়, তাহা হইলে চিকিৎসকেরা পীড়া শান্তির আশা করিয়া থাকেন - তদ্রূপ অন্তরের অভাব ও যন্ত্রণা উপলব্ধি করিতে পারিলে তাহার আরোগ্যের প্রতি আশারূঢ় হওয়া যায়। অভাববোধ হইলে কখনই নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। কিন্তু

মনুষ্য সুখপ্রিয়, সর্বদাই কষ্ট হইতে দূরে থাকিতে ইচ্ছা করে। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ সময়ে আমাদের অনেক অভাব বোধ হইয়াছিল, আমাদিগকে অনেক প্রকার কষ্টে পতিত হইতে হইয়াছিল, গুরুজনের তিরস্কার লোকের অত্যুক্তি ও উপহাস সহ্য করিতে হইয়াছিল। পরে ঈশ্বরপ্রসাদে আমরা যেমন ধর্মপথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলাম, তাহার সঙ্গে সঙ্গে কষ্টেরও পরিমাণ অধিক হইতে লাগিল। যখন আমরা অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলাম, আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সকলে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, এবং আমাদের অন্যান্য কত ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে বোধহয় আর সে সকল কষ্ট নাই, সে সমস্ত বিপদের দিন অবসান হইয়াছে, এখন আমরা কিছুদিন সুখে যাপন করিতে অভিলাষী হইতেছি। পূর্বে আমাদের যে সকল অভাববোধ হইত এক্ষণে তাহা আর হয় না। পূর্বে লোকে যেমন ভর্ৎসনা ও চরিত্রে দোষারোপ করিত, এক্ষণে আর সেরূপ করে না; এইজন্য আমাদের মনে কিঞ্চিৎ আত্মগৌরব হইয়াছে। আমরা আপনাদের দোষ আর অনুসন্ধান করি না। সময়ের সহিত অথবা লোকের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে, আমাদের অনেক উন্নতি হইয়াছে বোধ হইবে; কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে তুলনা করিলে প্রতীতি হইবে যে অতি অল্পই হইয়াছে।

(৬) সাধারণ প্রতিনিধি সভায় সম্পাদকের ভাষণ (১৮৬৪)—

[এইরূপে ব্রাহ্মদিগের মতের ঐক্য এবং সময়ের সহিত ব্রাহ্মধর্মের উন্নতির সমসূত্রতার বিষয় স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন করিয়া, সম্পাদক মহাশয় (কেশবচন্দ্র) ব্রাহ্ম-সমাজের বর্তমান অবস্থার বিষয় উল্লেখ করিয়া কহিলেন :]

এই উন্নতির সময় ব্রাহ্মধর্ম সংসারের কর্মক্ষেত্রে যতই প্রবেশ করিতেছেন, ততই সামাজিক অনুষ্ঠানাদি বিষয়ে আমাদের মতভেদ দৃষ্ট হইতেছে। ধর্মের মূল বিশ্বাস আমাদের সকলেরই এক, কিন্তু ব্রাহ্মধর্মের এমনই উন্নত স্বাধীন ভাব যে, সকলপ্রকার সামাজিক ব্যবহার ও অনুষ্ঠান বিষয়ে ঐক্যরক্ষা হওয়া অসম্ভব। একদিকে আমাদের মূল বিশ্বাসে একতা থাকিবে, অপরদিকে প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজ নিজ যুক্তি বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিতে হইবে। এই যোগ এবং স্বাধীনতার সামঞ্জস্য-ভাব কেবল ব্রাহ্মধর্মেই দৃষ্ট হইয়া থাকে, এবং ইহাতেই ব্রাহ্মধর্মের প্রকৃত মহত্ত্ব। ব্রাহ্মধর্মের এই উদারভাব যাহাতে রক্ষা পায়, যাহাতে সকল ব্রাহ্মসমাজ একাত্ম হইয়া ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করতঃ সকলের সাধারণ উদ্দেশ্য সংসাধনে কৃতকার্য হন, ইহার প্রতি আমাদিগের সর্বদা দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। যে ধর্ম অনন্ত উন্নতি অঙ্গীকার করিতেছে, এই অপরিব্যক্ত মুকুলাবস্থাতে তাহাকে আবদ্ধ করিবার কাহারও সাধ্য নাই। এই উন্নতির সময়ে যথার্থ ধার্মিক ব্যক্তি সামাজিক উন্নতির প্রতি দৃষ্টি না করিয়া থাকিতে পারে না। স্ত্রীজাতির উন্নতি সাধন করা, সাধারণ মধ্যে বিদ্যালোক বিকীর্ণ করা, জাতিভেদ ও তাহার অনুচর কুসংস্কার সকল বিনাশ করা, উদ্বাহের নিয়ম পরিশুদ্ধ করা প্রভৃতি

কত প্রকার গুরুতর কার্য ব্রাহ্মদিগের হস্তে রহিয়াছে। ঈশ্বরের রাজ্যে উন্নতিই নিয়ম। পরিবর্তন দিন দিন লক্ষিত হইবে, নব নব সত্য আমাদের নিকট প্রকাশিত হইতে থাকিবে। এক্ষণে যে সকল সামাজিক নিয়ম ব্রাহ্মমণ্ডলীর মধ্যে প্রচলিত আছে, বর্ষৈক পরে তাহাই যে থাকিবে, কে নিশ্চয় বলিতে পারেন? ব্রাহ্মদিগের মূল বিশ্বাসে কখনই অনৈক্য হইবে না, কিন্তু সামাজিক বিষয়ে দুই ব্যক্তির মত হয়ত এক না হইতে পারে। আত্মার উন্নতিকেই বা কে প্রতিষেধ করিতে পারেন? সহস্র বিঘ্ন থাকিলেও ঈশ্বরপ্রসাদে মনুষ্য প্রীতি, পবিত্রতা ও সাধুভাবে দেবতুল্য হইতে পারেন। হিমগিরির শৃঙ্গসকল যেমন নিজবলে স্বাধীনরূপে আকাশে উত্থিত হইতে থাকে অথচ তাহারা মূলে এক; ব্রাহ্মদিগকেও তেমনই স্বাধীন হইয়া উন্নত হইতে হইবে। অথচ বিশ্বাস ও প্রীতিসূত্রে পরস্পরের সহিত আবদ্ধ থাকিতে হইবে। ধনী দরিদ্র, যুবা বৃদ্ধ, দুর্বল সবল এই সভাতে সকলেরই প্রতিনিধি থাকিবে। কিন্তু এখানে তর্কের বিষয় কখনও যেন উত্থিত না হয়। আমরা একাত্ম হইয়া ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের উপায় অন্বেষণ করিব; এই উদ্দেশ্যে একটি প্রতিনিধি সভা সংস্থাপন করা আবশ্যক। আপনারা এবিষয় বিবেচনা করিয়া যথাবিহিত বিধান করুন।

(৭) স্ত্রীর প্রতি উপদেশ (১৮৬৫)—প্রথম উপদেশ—

তোমার প্রতি আমার প্রথম উপদেশ এই যে, তুমি সর্বদা এই বিশ্বাসটী হৃদয়ে জাগ্রত রাখিবে যে আমাদের সম্বন্ধ সাংসারিক সম্বন্ধ নহে ঐহিক অনিত্য ইন্দ্রিয়সুখ লাভ অপেক্ষা উচ্চতর মহত্তর ইহার লক্ষ্য। এই সম্বন্ধ স্বয়ং ঈশ্বর সংস্থাপন করিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, আমরা বিশুদ্ধ প্রণয়ে সম্বদ্ধ হইয়া চিরজীবন পরস্পরের উন্নতি ও মঙ্গল সাধন করিব এবং উভয়ে মিলিয়া পরব্রহ্মের উপাসনা করতঃ তাঁহার আদেশানুসারে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিব। ধন মান প্রভৃতি নীচ লক্ষ্য সকল পরিত্যাগ করিয়া কেবল সেই পরম পরিশুদ্ধ পিতার কার্য সাধনে আমরা যেন সর্বদা যত্নশীল থাকি। যিনি আমাদিগকে দূর হইতে নিকটে আনিয়া প্রীতিশৃঙ্খলে বদ্ধ করিলেন; একত্র হইয়া আনন্দমনে চিরদিন তাঁহার উপাসনা করিব, একত্র তাঁহার চরণসেবা করিব, একত্র তাঁহার আজ্ঞা পালন করিয়া জীবন সার্থক করিব, ইহাই যেন নিয়ত আমাদের উদ্দেশ্য থাকে। ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি আছে? আমাদের সংসার যেন ধর্মের সংসার হয়; ইহা যেন মধুস্বরূপ ব্রাহ্মধর্মের মধুরভাবে পরিপূরিত হয়। আমাদের সংসার যেন বিষয়কোলাহল বিষয়জঞ্জালশূন্য হইয়া ঈশ্বরের মঙ্গল নিয়মে সুশাসিত হয়, তাঁহার সত্যজ্যোতিতে উজ্জ্বল হয় এবং তাঁহার অমৃতরসে প্লাবিত হয়।

স্ত্রীর নাম সহধর্মিণী; ধর্মই আমাদের লক্ষ্য, ধর্মই আমাদের বন্ধন, ধর্মই আমাদের চিরজীবনের কার্য। ধর্মের পথে তুমি আমার সহায় ও সহচরী হইবে॥

(৮) ব্রাহ্মসমাজের বর্তমান অবস্থা (১৮৬৬)—

এখন ব্রাহ্মসমাজের একটি বিশেষ অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। পূর্বের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে প্রতিপন্ন হইবে যে, এরূপ অবস্থা আর কখনও হয় নাই। এই ভয়ানক অবস্থাটী বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। সকলেই অবগত আছেন যে, এক্ষণে পূর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক বিষয় ব্রাহ্মধর্মের উন্নতির প্রতিকূল হইয়াছে, আমাদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব হ্রাস হইতেছে, পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ বৃদ্ধি হইতেছে। এমন কি পূর্বে আমাদের হৃদয়ে যথার্থ ভ্রাতৃভাবের সঞ্চার হইয়াছিল কিনা, তদ্বিষয়ে এখন বিলক্ষণ সংশয় উপস্থিত হইতেছে। বিশ্বাসের একতা, মতের অভিন্নতা ব্যতীত যথার্থ ভ্রাতৃভাব হওয়া অসম্ভব। যাঁহারা সমবেতযত্ন হইয়া এক লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যেই যথার্থ ভ্রাতৃভাব বিরাজমান, অন্যথা প্রকৃত ভ্রাতৃভাব হইতে পারে না। আমাদের মধ্যে সেই সমবেত চেষ্টার অভাব হইয়াছে। বিশেষ যত্ন ও সতর্কতার সহিত না চলিলে এখন অনেক অনিষ্টকর বিষয় সংঘটিত হইতে পারে। এখনকার এই রোগ নিবারণের ঔষধ কি? যেরূপ যখন কোন সাধু-ব্যক্তির জীবনে চতুর্দ্দিক হইতে বিঘ্ন বিপত্তি আসিয়া উপনীত হয়, যখন সকল ঘটনাই প্রতিকূল হয়, সকল সাধু উদ্দেশ্য প্রতিষিদ্ধ হয়, তখন সেই অবস্থার মধ্যে ঈশ্বরের মঙ্গলভাব দেখা কর্তব্য; সেইরূপ এই বর্তমান ভ্রাতৃবিচ্ছেদ, অসৎভাব, নীচভাব যাহা চতুর্দ্দিকে দৃষ্ট হইতেছে তাহাতেও সেইরূপ ঈশ্বরের মঙ্গলাভিপ্রায় উপলব্ধি করিতে হইবে। সামান্য মতভেদ সকল তুচ্ছ করিয়া, সমবেত চেষ্টা দ্বারা সাধারণ লক্ষ্য সিদ্ধ করাই এখনকার বিশেষ কর্তব্য বলিয়া লক্ষিত হইতেছে। এখন যিনি উন্নতির স্রোতকে অবরুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিবেন তাঁহার আয়াস বিফল হইবে সন্দেহ নাই; আর যিনি উন্নতিস্রোতে আপনাকে নিক্ষেপ করিবেন তিনিই কৃতকার্য হইবেন। সত্যের জয় হইবেই, ইহা নিঃসংশয়॥

(৯) ব্রাহ্মোৎসব (১৮৬৭)—

প্রার্থনা।

অসতো মা সদ্‌গময় তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মামৃতং গময় আবীরাবীর্ম এধি
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।

অসত্য হইতে আমাদিগকে সত্যেতে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাদিগকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাদিগকে অমৃতেতে লইয়া যাও; হে স্বপ্রকাশ! আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হও; রুদ্র! তোমার যে প্রসন্ন মুখ তাহা দ্বারা আমাদিগকে সর্বদা রক্ষা কর। অসত্য হইতে আমাদিগকে সত্যেতে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাদিগকে জ্যোতিতে লইয়া যাও; মৃত্যু হইতে আমাদিগকে

অমৃতেতে লইয়া যাও; হে স্বপ্রকাশ! আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হও; রুদ্র! তোমার যে প্রসন্ন মুখ তাহা দ্বারা আমাদিগকে সর্বদা রক্ষা কর। অসত্য হইতে আমাদিগকে সত্যেতে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাদিগকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাদিগকে অমৃতেতে লইয়া যাও; হে স্বপ্রকাশ! আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হও; রুদ্র! তোমার যে প্রসন্ন মুখ তাহা দ্বারা আমাদিগকে সর্বদা রক্ষা কর॥

[ইহা আচার্য কেশবচন্দ্রের প্রথম বাঙ্গলা উপাসনার অংশবিশেষ]

(১০) প্রার্থনা (১৮৬৮)—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাং॥ —কঠোপনিষৎ॥

"যাচ্ঞা কর, তোমাদিগকে দেওয়া হইবে; অন্বেষণ কর, তোমরা প্রাপ্ত হইবে; আঘাত কর, তোমাদের জন্য দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে; কারণ যে কেহ যাচ্ঞা করে সে লাভ করে; যে অন্বেষণ করে সে প্রাপ্ত হয়; এবং যে আঘাত করে তাহার প্রতি দ্বার উন্মুক্ত হয়।"—বাইবেল।

"নিত্য উপাসনা কর, কারণ উপাসনা মনুষ্যকে জঘন্য অপরাধ এবং যাহা কিছু দূষণীয় তাহা হইতে রক্ষা করে। আর ঈশ্বরকে স্মরণ করা নিশ্চয়ই মনুষ্যের একটি অতি গুরুতর কর্তব্য।"—কোরাণ।

"প্রার্থনাতে আমরা আনন্দিত হই, প্রার্থনাকে আমরা অভিলাষ করি, আমরা আপনাদিগকে প্রার্থনার অধীন করি, প্রার্থনাকেই আমরা ডাকি।"—জেন্দাভেস্তা।

কঠোপনিষদের বচনে এই একটী অমূল্য সত্য লাভ করিতেছি যে, অনেক উত্তম বচন, মেধা অথবা বহু শ্রবণ দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না; কিন্তু যে তাঁহাকে প্রার্থনা করে সেই তাঁহাকে লাভ করে। এই সত্যের ভূরি ভূরি প্রমাণ তাবৎ ধর্মশাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। খৃষ্টীয়ান, মুসলমান প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ হইতে যে কয়েকটী শ্লোক পঠিত হইল, তাহাতে এই সত্যটী পাওয়া যাইতেছে। প্রার্থনা ভিন্ন যে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না পুরাকালের ঋষিরা যেমন বলিয়া গিয়াছেন, এখনকার পণ্ডিতেরাও এক বাক্য হইয়া তাহা স্বীকার করিতেছেন। কিন্তু কেবল প্রার্থনার বচন উচ্চারণ করিলে ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না, এবং অপরের প্রার্থনা শ্রবণ করাও কখন ঈশ্বর লাভের উপায় হইতে পারে না। বুদ্ধি দ্বারা যে প্রার্থনাকার্য করা যায়, তৎকর্তৃকও ঈশ্বর আবিষ্কৃত হন না, কোন প্রকার উত্তম বচন, কোন সুন্দর স্বারা ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। প্রার্থনা শ্রবণ দ্বারা তাহাকে পাওয়া যায় না। যদি তোমরা দশ বৎসর কাল প্রার্থনা করিয়া থাক, তবে গম্ভীরভাবে সেই প্রশ্ন আসিতেছে। কি জন্য প্রার্থনা করিয়াও তাঁহাকে পাও নাই? ভিক্ষা করিবা মাত্র ক্ষুধার শান্তি হয়, কিন্তু প্রার্থনা করিয়াও হৃদয় পবিত্র হয় না ইহার কারণ কি?

বাচনিক প্রার্থনার দ্বারা ঈশ্বর লব্ধ হয়েন না। বহু আলোচনার পর স্বীকার করিয়া যে প্রার্থনা করা যায় তদ্দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না। হয়ত একপ্রকার প্রার্থনা অনেকবার শ্রবণ করিয়াও লোকে ঈশ্বরকে লাভ করিতে অসমর্থ হয়। বিষয়ীর ত কথাই নাই; তাহারা কি প্রকারে পরমেশ্বরকে লাভ করিতে পারিবে? কিন্তু যাঁহারা ব্রাহ্ম, তাঁহারা কেন ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারেন না; তাঁহাদের হৃদয়ে সংসারের জঞ্জাল কেন থাকে? সে অন্ধকার, সে জঞ্জাল দূর করিবার উপায় একমাত্র প্রার্থনা। অথচ প্রার্থনা করিয়াও জঞ্জাল নিঃসারিত হইতেছে না। ইহার কারণ এই যে সকলে তাঁহাকে সেরূপ হৃদয়ের সহিত প্রার্থনা করেন না, যেরূপ ঈশ্বর তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হন॥

[গোপাল মল্লিকের বাড়ী, চিৎপুর। ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তি-স্থাপনের পর প্রার্থনা। মধ্যাহ্ন, শুক্রবার, ১১ মাঘ ১৭৮৯ শক, ২৪ জানুয়ারি ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ।]

(১১) শুষ্কতা (১৮৬৯)—

প্রশ্ন। অনেকদিন উপাসনার সময় মন অত্যন্ত শুষ্ক বোধ হয়, অভাব বোধ হয় না এবং তজ্জন্য উত্তমরূপে প্রার্থনা হয় না, কিরূপে এই শুষ্কতা দূর হয়?

উত্তর। অভাব আমাদিগের সর্বদাই আছে। আমরা উত্তমরূপ চিন্তা করিলেই তাহা দেখিতে পাই। ভালরূপে হৃদয়ের দিকে দেখি না বলিয়াই অভাব জানিতে পারি না। আমাদিগের শুষ্কতার আর একটি কারণ এই, আমরা নিজে যেমন শুষ্ক আমাদিগের দেবতাকেও সেইরূপ শুষ্ক আকার প্রদান করি। এই কল্পনাই আমাদের সর্বনাশের মূল। আমরা ঈশ্বরকে কেবল জ্ঞানস্বরূপ, সত্যস্বরূপ, সর্বব্যাপী এবম্বিধ কতকগুলি জ্ঞানবিষয়ক গুণবিশিষ্ট বলিয়া চিন্তা করি। নীরস জ্ঞানে হৃদয় নীরস হয়। আমাদিগের উচিত তাঁহার সরল গুণগুলিও দেখি, তাঁহাকে প্রেমচন্দ্র, দয়াময়, পুত্রবৎসল, অধমতারণ বলিয়া ভাবি।

প্রশ্ন। একটি পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য বারবার 'পিতা রক্ষা কর' বলিয়া ডাকিলাম, কিন্তু মুক্তি পাইলাম না। সুতরাং মন নিরাশ হয় এবং প্রার্থনার প্রতি উপেক্ষা জন্মে। এ অবস্থায় কি করা উচিত?

উত্তর। এ অতি ভয়ানক অবস্থা। ইহার মূলে অবিশ্বাস নিহিত আছে। মুখে বলি দয়াময়, কিন্তু অন্তরে বিশ্বাস করি না, এই নিমিত্ত এরূপ নিরাশা জন্মে। 'দয়াময়' শব্দের যথার্থ অর্থ বুঝিলে কখনই নিরাশ হইতে হয় না; তখন মনে হয়—'চেয়ে থাক তাঁর পানে অবশ্য মিলিবে তাঁয়।' আমরা যত পাপী হই না কেন, পিতা কখনই পরিত্যাগ করিবেন না, এ বিশ্বাস যাঁহার হৃদয়ে দৃঢ় সংলগ্ন আছে তিনি কখনই নিরাশ হইবেন না। সর্বদাই সাবধানে থাকিবে, অবিশ্বাস করিয়া এরূপ নিরাশায় যেন পতিত না হও॥

(১২) কার্য এবং আধ্যাত্মিকতা (১৮৭০)—

[শুক্রবার ৫ কার্তিক ১৭৯২ শক ; ২১ অক্টোবর ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ। ব্রহ্মানন্দ সঙ্গতের পূর্বদিন ৪ কার্তিক বৃহস্পতিবার, ইংলণ্ড হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হন।

শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ব্রাহ্মদিগের বর্তমান কর্তব্য বিষয়ে এই সার কথাগুলি বলিলেন।]

আমি এ বয়সে কি এখানে কি ইংলণ্ডে পরীক্ষা দ্বারা যত বিষয় জানিলাম তাহার সারকথা এই, অধিক আধ্যাত্মিক হইতে গেলে কাজের বাহির হইতে হয় এবং কাজে অধিক ব্যাপৃত হইলে আধ্যাত্মিক ভাব শুষ্ক হইয়া যায়। কার্য এবং আধ্যাত্মিকতা এই উভয়ের যোগে পরিত্রাণ। যখন খুব কাজ করিতেছি তখন হৃদয় যদি ঈশ্বরের সংযুক্ত হইয়া থাকে, এবং যখন হৃদয় তাঁহাতে নিমগ্ন থাকে তখন যদি উৎসাহাগ্নিতে প্রজ্বলিত হইয়া কার্যের জন্য প্রস্তুত হইতে পারি, তাহা হইলেই পূর্ণভাবে ধর্ম সাধন হয়। ধ্যান প্রার্থনা ইত্যাদি আধ্যাত্মিক সুখাদ্য আমরা অধিক ভালবাসি, এবং তাহাতে সময় সময় উপকারও দর্শে দেখিয়াছি ; কিন্তু সকল সময় সেই আহারের লোভী হইয়া থাকিলে চলিবে না। আমাদিগকে ঈশ্বরের সেবা করিতে হইবে ; ডাল ভাত খাইয়াও যাহাতে প্রাণ ধারণ করিতে পারি, এ প্রকারে সকল সময় প্রস্তুত থাকিতে হইবে। আমরা সমস্ত সময়ে বিশেষ বিশেষ প্রণালী করিয়া ধর্মজীবন রক্ষা করিতে যাই, কিন্তু কেবল প্রণালী রক্ষা করিয়া মন সতেজ থাকিবে কেন ?

……অনেকে মনে করেন ইংলণ্ডে গেলে স্বদেশের প্রতি স্নেহ যায় এবং বিজাতীয় হইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়। কিন্তু আমি বলি দেশীয় হৃদয় লইয়া গেলে বিলাত হইতে আরও দেশীয় হইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়। বিলাতে গিয়া মাতৃভূমি ভারতবর্ষ যেরূপ মধুর বুঝিতে পারিয়াছি এরূপ আর কখনই পারি নাই। মূল্যবান কোন বস্তু হইতে কিছুকাল বঞ্চিত না হইলে তাহার মর্যাদা বুঝা যায় না। স্বদেশ এখন একটি মায়ার সামগ্রী হইয়াছে। এইসকল ভাব দৃঢ়রূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য আমি বিলাত হইতে যে সকল চিঠি আনিয়াছি তাহা সকলকে পড়িতে হইবে। যাহাতে পূর্ব পশ্চিমের দৃঢ় যোগ সংসাধিত হয়, "মিরার" দ্বারা তাহা চেষ্টা করিতে হইবে।

(১৩) পাপ এককালে অসম্ভব হয় কিনা ? (১৮৭১)—

প্রশ্ন। মানুষের পক্ষে পাপ এককালে অসম্ভব হয় কিনা ?

উত্তর। মন সম্পূর্ণ পবিত্র না হইলে পাপ তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব হইতে পারে না। মানবপ্রকৃতিতে এরূপ ভাব কখনই সম্ভবপর নহে। তবে ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে বিশেষ বিশেষ গুণের যে পরিমাণে উন্নতি হয়, বিশেষ বিশেষ পাপও তাহার পক্ষে সেই পরিমাণে অসম্ভব হইতে পারে। আমরা যাঁহাদিগের উন্নত ধর্ম জীবন দেখিতে পাই, লোকের ঘরে সিঁদ দেওয়া কি খুন করা তাঁহাদিগের পক্ষে অসম্ভব—ইহা কি

বলিতে পারি না ? কিন্তু এরূপ অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে। যাঁহারা অনেক দিন পর্যন্ত ধর্মজীবনের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন, তাঁহারাই আবার অতি জঘন্য কার্য করিয়া থাকেন। ইহার কারণ এই, পূর্বে তাঁহারা যে লোক ছিলেন, এখন সে লোক নহেন। আমার আমিত্ব যদি যায়, আমার জীবনেরও ভাবান্তর হইবে আশ্চর্য কি ?

কোন্ পাপ আমাদিগের পক্ষে কতদূর অসম্ভব হইয়াছে, মূলেই বুঝা যায় না এরূপ নহে। আপনার দোষ অল্প ও গুণ অধিক ভাবিয়া যত আমরা আত্ম-প্রতারিত হই না কেন, মনে মনে স্থির চিন্তা করিলে আপনার দৌড় অনেকটা বুঝা যায়। লোভ কত কমিয়াছে যাঁহার বুঝিবার প্রয়োজন—তিনি মনে মনে জিজ্ঞাসা করুন দেখি, পাঁচ টাকা পঞ্চাশ টাকা না হয় পাঁচ হাজার টাকা, না হয় পাঁচ লক্ষ টাকার জন্যও তিনি পাপ করিতে পারেন কি না? যতক্ষণ উর্দ্ধতম সংখ্যাতেও তাঁহার মন না টলিবে, ততক্ষণ লোভ পাপ তাঁহার পক্ষে অসম্ভব বলিতে পারা যায়॥

(১৪) ভারতাশ্রম স্থাপনের উদ্দেশ্য (১৮৭২)—

প্রশ্ন। ব্রাহ্মেরা ভ্রাতৃভাব সাধনে অগ্রসর নহেন কেন ?

উত্তর। ভ্রাতৃভাব সাধনের অর্থ কাম, ক্রোধ, লোভ, অহঙ্কার, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি সকল কুভাব ত্যাগ করা অর্থাৎ ধার্মিক হওয়া। ইহাতে হৃদয়ের এমন স্থানে হাত পড়ে যে অত্যন্ত ব্যথা লাগে। যাহাতে নিজের কষ্ট হয়, তাহাতে লোকে সহজে অগ্রসর হইতে চান না।

প্রশ্ন। আমরা ভ্রাতৃভাব রক্ষার জন্য যে প্রতিজ্ঞা করি তা স্থায়ী ও দৃঢ় হয় না কেন ?

উত্তর। বিশ্বাস ও ধৈর্যের অভাব ইহার কারণ। কোন ভ্রাতা আমার বিরুদ্ধাচরণ করিলে মনে রাগ হইল, কিন্তু প্রথমে দুই একবার ব্রাহ্ম হইয়াছি ভাবিয়া রাগটা চাপিয়া গেলাম এবং অতি কষ্টে 'তোমাকে ক্ষমা করিতেছি' বলিলাম। কিন্তু অধিকবার সেইরূপ আচরণ দেখিলে আর ধৈর্য ধারণ করা যায় না; শেষে একগুণ চাপা রাগ দশগুণ প্রকাশ করিয়া তাহার সমুচিত দণ্ড দিই এবং স্থায়ীভাবে বৈর-নির্যাতনে প্রবৃত্ত হই। ক্ষমা দ্বারা লোক বশীভূত হয়, যদি এ বিশ্বাস থাকে—এবং আর একবার ক্ষমা করি বলিয়া, প্রত্যেক বারে যদি চেষ্টা করি—তাহা হইলে দুই চারি বৎসর ধৈর্য অবলম্বন করিয়া, এইরূপ চেষ্টা করিলে উভয়েরই পরম মঙ্গল হয়। যে কার্য নিশ্চয় হইবে বলিয়া বিশ্বাস থাকে, তাহাতে দৃঢ়ব্রত হওয়া যায়; যাহাতে অবিশ্বাস ও নিরাশা তাহাতে দৃঢ়তা থাকিতে পারে না।

প্রশ্ন। আমাদের মনে ক্রোধ কি এককালে থাকিবে না ?

উত্তর। যাহা কিছু ঈশ্বর দিয়াছেন, সে সকলই ভাল; তাহার রক্ষণ ও সদ্ব্যবহার করা আমাদের কর্তব্য, অসদ্ব্যবহার করাই দোষ। আপনার বা অন্যের অন্যায় ব্যবহার

সংশোধন করা ক্রোধের উদ্দেশ্য। আপনার যে কু-প্রবৃত্তি বা কু-অভ্যাস কিছুতেই নিবারিত হয় না, ক্রোধ দ্বারা-তাহার দমন হয়। এই পৃথিবীতে মানুষের প্রতি মানুষের অনেক অন্যায়াচরণ দেখা যায়, সে সকল স্থলে ক্রোধ না করা অন্যায়। এক দুঃখী প্রজা কোন দুর্দান্ত জমিদারের অর্থলালসা পূরণ করিতে পারে নাই বলিয়া, তিনি যদি তাহার পরিবারের উপর অত্যাচার করেন এবং তাহার একটি নির্দোষ শিশু-সন্তানের পা আগুনে পোড়াইতে থাকেন, ইহা দেখিলে ক্রোধ আপনা আপনি জ্বলিয়া উঠিবে, স্বর্গের আগুনে শরীর মনকে উৎসাহিত করিবে। অন্যায়-অসহিষ্ণু ব্যক্তি অতি দুর্বল ও অক্ষম হইলেও এই ক্রোধের প্রভাবে শতগুণে বল ধারণ করিবে, চারিদিকের লোক একত্র করিয়া জমীদারের অত্যাচারের প্রতীকার না হইলে ছাড়িবে না। এরূপ ক্রোধ ঈশ্বরের ভৃত্য ও আমাদিগের বন্ধু, ইহা জগতের মঙ্গলের জন্য প্রেরিত হয়। যথার্থ রাগের পরীক্ষা—সে অবস্থায় ঈশ্বরের উপাসনা করা যায় কিনা ? তাঁহার আদেশ পালন করিতেছি বলিয়া, মনে শান্তি পাওয়া যায় কিনা ?

[প্রকাশকের পাদটীকা : ভারতাশ্রম ১৭৯৩ শক—৫ ফেব্রুয়ারী ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বেলঘরিয়া উদ্যানে স্থাপিত হয়। এপ্রিল বা মে মাসে কলিকাতায় মির্জাপুর স্ট্রীটে উঠিয়া আসে। এই রচনাটি "ধর্মসাধন" পত্রিকায় ৭ আষাঢ় ১৭৯৪ শকে, ২০ জুন ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।]

পনের বছরে (১৮৫৭-১৮৭২ খ্রী:) কেশবচন্দ্রের গদ্যরচনার একটি স্পষ্ট ক্রমবিকাশ-চিত্র এইসব গদ্যাংশ থেকে পাওয়া যায়। এর থেকে কয়েকটি তথ্য আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে :

(১) বিদ্যাসাগর বাংলাগদ্যবাক্যের খণ্ডবাক্যসজ্জা (arrangement of clauses) ও পদান্বয় (syntax) নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাজনারায়ণ বসু (কেশবচন্দ্রের প্রেরণাস্থল), অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাসাগর-নির্ধারিত পথেই বাংলা গদ্যচর্চা করেছিলেন।

(২) কেশবচন্দ্রও এই পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। আর সেই সঙ্গে বঙ্কিম-পূর্ববর্তী ও বঙ্কিম-প্রভাবমুক্ত গদ্যলেখকরূপে তাঁর একটি স্বতন্ত্র ভূমিকা আছে। গদ্যলেখকরূপে তাঁর ক্রমবিকাশ একান্তভাবে তাঁরই। বঙ্গদর্শন (১৮৭২) প্রকাশের পূর্বেই কেশবচন্দ্র তাঁর প্রার্থনা, উপাসনা, প্রার্থনান্তিক ও প্রকাশ্য ভাষণে যে গদ্যকে ব্যবহার করেছেন তার রূপ সম্পর্কে তাঁর কোনো দ্বিধা ছিল না। স্মর্তব্য, বেলঘরিয়ায় ভারতাশ্রম স্থাপনের (৫ ফেব্রুঅরি ১৮৭২ খ্রী:) সময় পর্যন্ত এই সব ভাষণ কেশবচন্দ্র স্বহস্তে লিখতেন।

৩। ক্রিয়াপদের ব্যবহার, খণ্ডবাক্যসজ্জা, যতিচিহ্নাদির প্রয়োগে বিদ্যাসাগর-প্রবর্তিত পথে কেশবচন্দ্র অগ্রসর হয়েছিলেন। এবং নিজস্ব বাক্যরীতি নির্মাণে অনেকটাই এগিয়েছিলেন, যার পূর্ণতা দেখা গেল পরবর্তী দশ বছরের (১৮৭২-৮২) গদ্যরচনায়, বিশেষত: 'জীবনবেদ' গ্রন্থে (১৮৮৩)।

(৪) সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রের সম্পাদক ও পরিচালকরূপে কেশবচন্দ্র সাংবাদিক গদ্যরচনায় সাফল্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। 'ধর্মতত্ত্ব' (১৮৬৪) ও 'ধর্মসাধন' (১৮৭২) পত্রিকার ভাববাহী আবেগস্পন্দিত গদ্য ও 'সুলভ সমাচারে'র (১৮৭০) লঘু দ্রুতগতি গদ্য ব্যবহারে তার পরিচয় পাই।

কেশবচন্দ্রের প্রধান বাংলাগ্রন্থ বারোটি :

১. আচার্যের প্রার্থনা (৪ খণ্ড) : ১৮৫৭-১৮৮৩
২. সঙ্গত (২ খণ্ড) : ১৮৬০-১৮৮২
৩. আচার্যের উপদেশ (১০ খণ্ড) : ১৮৬২-১৮৮৩
৪. বিধান ভগ্নীসভ্য : ১৮৬৫-১৮৮২
৫. বিশ্বাস ও ভক্তিযোগ : ১৮৬৭
৬. দৈনিক উপাসনা : ১৮৭৫
৭. ব্রহ্মগীতোপনিষৎ : ১৮৭৬-৮০
৮. সেবকের নিবেদন (২ খণ্ড) : ১৮৮০-৮৩
৯. সাধু সমাগম : ১৮৮০
১০. মাঘোৎসব : ১৮৮১
১১. জীবনবেদ : ১৮৮৩
১২. নবসংহিতা : ১৮৮৪

কেশবচন্দ্র আটটি বাংলা সাময়িকপত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন :

১. বামাবোধিনী পত্রিকা (আগষ্ট ১৮৬৩/মাসিক)
২. ধর্মতত্ত্ব (১৮৬৪/মাসিক, পরে পাক্ষিক)
৩. সুলভ সমাচার (১৫ নভেম্বর ১৮৭০/সাপ্তাহিক)
৪. মদ না গরল (এপ্রিল ১৮৭১/মাসিক)
৫. ধর্মসাধন (১৮৭২/মাসিক)
৬. বালকবন্ধু (এপ্রিল ১৮৭২/পাক্ষিক)
৭. পরিচারিকা (জুন ১৮৭৭/মাসিক)
৮. বিষ-বৈরী (এপ্রিল ১৮৮০/মাসিক)

কেশবচন্দ্র যে-সব ইংরেজি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তার মধ্যে প্রধান দুটি— 'দি ইনডিয়ান মিরার' ও 'দি লিবারেল'।

ঊনবিংশ শতাব্দের দ্বিতীয়ার্ধে কেশবচন্দ্রের কর্মকাণ্ড ব্যাপ্ত ছিল। এসময়েই বিদ্যাসাগরের গদ্যরচনা (১৮৪৭-১৮৮৬), অক্ষয়কুমার দত্তের গদ্যরচনা (১৮৫১-১৮৮৩), ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের গদ্যরচনা (১৮৫৭-১৯০৫), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গদ্যরচনা (১৮৫৯-১৮৯৮) ও বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যরচনা (১৮৬৫-১৮৯৪)। এঁদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র এসেছেন সবশেষে, বঙ্গদর্শন-সম্পাদক-গোষ্ঠীনেতা রূপে তিনি বাংলা কথাসাহিত্য ও প্রবন্ধ সাহিত্যের পথনির্দেশ করেন ও বাংলা সাধুগদ্যের একটি আদর্শ

(মডেল) গড়ে তোলেন। কেশবচন্দ্র তার পূর্বে গড়ে তুলেছিলেন তাঁর নিজস্ব গদ্যরীতি, যা পূর্ণতা পেল পরবর্তী দশ বছরে (১৮৭২-১৮৮২)।

॥ ৬ ॥ কেশবের গদ্যরচনার দ্বিতীয়পর্ব (১৮৭২-১৮৮২) ॥

কেশবের বাংলা গদ্যগ্রন্থের যে-তালিকা আমরা সদ্য পেশ করেছি তার থেকে দেখা দেখা যায় তাঁর গদ্যরচনার দ্বিতীয় ও শেষ পর্বটি কালব্যাপ্তিতে ঈষৎ সংকীর্ণ হলেও রচনার পরিমাণে ও গুণে তা প্রথম পর্বকে ছাপিয়ে যায়। আচার্যের প্রার্থনা, সঙ্গত, আচার্যের উপদেশ, বিধান ভগ্নীসভ্য, দৈনিক উপাসনা, ব্রহ্মগীতোপনিষৎ, সেবকের নিবেদন, সাধু সমাগম, মাঘোৎসব, জীবনবেদ ও নবসংহিতার অধিকাংশ রচনা এই পর্বে লিখিত।

কেশবের গদ্য মুখ্যত তিন শাখায় বিভক্ত—ধর্মোপদেশের গদ্য, সামাজিক-রাষ্ট্রীয় বিষয়ে প্রদত্ত ভাষণের গদ্য, প্রাত্যহিক সমস্যা ও ঘটনার বিবরণাত্মক ও মন্তব্যকারী লঘু গদ্য। কেশবচন্দ্রের বাগ্মিতা-গুণ তাঁর গদ্যে প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কালীপ্রসন্ন ঘোষের বাগ্মিতাগুণ যেখানে তাঁকে বর্ণাঢ্য অলঙ্কৃত তৎসমশব্দবহুল ধ্বনিরোলসমন্বিত দীর্ঘ পরম্পরিত বাক্যরচনায় প্ররোচিত করেছে, সেস্থলে কেশবচন্দ্র অলঙ্কৃত তৎসমশব্দবহুল হ্রস্ব বাক্যরচনায় উৎসাহিত হয়েছেন। ইংরেজি অর্থালঙ্কার ব্যবহারে কেশবের বিশেষ নৈপুণ্য ছিল। অ্যান্টিথিসিস্ অলঙ্কার ব্যবহারে তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল। খণ্ডবাক্য (Clause) সজ্জায় তিনি নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন। সুলভসমাচারে কেশব যে গদ্য ব্যবহার করেছিলেন তা বিশেষ মনোযোগ দাবি করে। তাতে কেশব এনেছিলেন কথ্যগদ্যের গতিবেগ ও ধাবৎশক্তি। বাস্তবের নিখুঁত অনুপুঙ্খ বর্ণনায়, সাধারণ গরীব মানুষ ও ইতর প্রাণীর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশে, নগরজীবনের বিচিত্র চলচ্ছবি অঙ্কনে কেশবচন্দ্রের সামর্থ্যের পরিচয় পাওয়া যায় সুলভ সমাচার পত্রিকায়। একটিমাত্র সংখ্যার (২৫ আষাঢ় ১২৮০/১৮৭৩) এক বিবরণাত্মক লঘু গদ্যচিত্র থেকে তিনটি অংশ এখানে উদ্ধার করি—

ক ॥ ড্রেনেজ, গ্যাস, জলের কলে শহরের অনেক উপকার করিয়াছে সত্য বটে, কিন্তু বিধিমতে বাঙ্গালীটোলাতে পথ চলিবার যে কি দুর্দশা ঘটাইয়াছে যাহারা পদব্রজে পথ চলে তাহারাই জানে, একটা স্থান না একটা স্থান খুঁড়িয়া রাখিয়াছে।

খ ॥ পাহারাওয়ালা-ভায়াও দুই একটা চ্যুতফলের লোভে পূজাবাড়ীর কুকুরের মত এদিক-ওদিক করিতেছে।

গ ॥ মানুষ বৃষ্টি বৃষ্টি করিয়া পাগল হইয়াছিল, এতদিনের পর বৃষ্টি পড়িল। ইহা অপেক্ষা অধিক পড়িলে আমরাও সন্তুষ্ট হই, চাষীরাও সন্তুষ্ট হয়; কিন্তু কলিকাতার কেরানীবাবুরা সন্তুষ্ট হয়েন কিনা সন্দেহ।

'কেরানী ও রাজপথ'—দৈনন্দিন জীবনের এই চিত্রটি লঘুগতি ধাবৎশক্তিসম্পন্ন

গদ্যে রচিত। এই গদ্যাংশগুলি থেকে কেশবচন্দ্রের সাংবাদিক গদ্যরচনার পরিচয় পাই। এখানে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য অনুধাবনযোগ্য :

(১) দ্রুতগতি হাল্‌কাচালের গদ্যনির্মাণে দক্ষতা। এই দ্রুতগতি ও হাল্‌কা চাল এসেছে সজাগ পর্যবেক্ষণের ফলে ও শব্দব্যবহার-ঔদার্যে। ইংরেজি শব্দ (ড্রেনেজ, গ্যাস), ফার্সি শব্দ (পাহারাওয়ালা, টোলা, শহর) নিপুণভাবে মিশ্রিত হয়েছে তৎসম শব্দ (উপকার, দুর্দশা, বৃষ্টি, সন্তুষ্ট) ও তদ্ভব শব্দের (কুকুর, পূজাবাড়ী) সঙ্গে। আবার বিষম শব্দের একযোগে ব্যবহারও (পাহারাওয়ালা/চ্যুতফলের লোভে) বিচিত্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। 'হয়েন' ছাড়া আর কোনো ক্রিয়াপদ গদ্যের লঘুগতিতে বাধা সৃষ্টি করেনি। 'এদিক-ওদিক', 'বৃষ্টি বৃষ্টি করিয়া পাগল' প্রভৃতি শব্দসজ্জা অনুকারধ্বনিমূলক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।

কেশবচন্দ্রের শেষ পর্যায়ের গদ্যরচনা (বিশেষত 'ব্রহ্মগীতোপনিষৎ' ও 'জীবনবেদ', রচনাকাল ১৮৭৬-৮২) থেকে একটিমাত্র গদ্যাংশ উদ্ধার করে কেশবচন্দ্রের গদ্যরীতির বিচার করে আলোচনায় ছেদ টানি।

"বৈরাগ্যের হেতু কি? মনুষ্য কেন বৈরাগী হয়? এক, অসার বলে সংসারকে ভাল না বাসা, আর এক, সংসার ইন্দ্রিয়াসক্তির উত্তেজক, পাপের কারণ, এই জন্য সংসারকে ঘৃণা করা; তৃতীয়তঃ, ইন্দ্রিয়সুখাসক্ত যদি না হওয়া যায়, তদ্দারা জগতের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়া জগতের মঙ্গল করা; এই তিনভাব হইতে বৈরাগ্যের উদয় হয়। তৃতীয় প্রকার বৈরাগ্য ভক্তি-বিভাগের। প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার বৈরাগ্য যোগশাস্ত্রের। সমস্ত জগতের কল্যাণের জন্য বৈরাগী হওয়া এইটি ভক্তির ব্যাপার।" ('ব্রহ্মগীতোপনিষৎ'। 'বৈরাগ্য কি', ২৮ মার্চ ১৮৭৬, কলুটোলা]

॥ (ক) বাক্যনির্মিতির পরিচয় ॥

মোট বাক্যসংখ্যা—৬

বাক্যের আয়তন : হ্রস্ব—৫

দীর্ঘ—১ [চারটি হ্রস্ববাক্যের সমাহার]

অনুপাত—৫ : ১

॥ (খ) শব্দব্যবহারের পরিচয় ॥

মোট শব্দসংখ্যা—৬৬

তৎসম (অপ্রচলিত সমেত)—৬১

শতকরা হার— ৮৭%

তদ্ভব (দেশী সমেত)— ৫

শতকরা হার— ১৩%

অন্যান্য— ×

শতকরা হার— ×

॥ (গ) অনুচ্ছেদটির বৈশিষ্ট্য ॥

১. বাক্যনির্মিতি : উদ্দেশ্য + বিধেয় + ক্রিয়া। বাক্যাংশগুলির স্পষ্টতা।

২. বাক্যগঠনে ইংরেজি বাক্যবন্ধের প্রভাব।

৩. ক্রিয়াপদের রূপ : যৌগিক ও তদ্ভব রূপে অসমাপিকা।

৪. বিরামচিহ্ন : পূর্ণচ্ছেদ, প্রশ্নবোধক ছেদচিহ্ন, কমা, সেমিকোলন।

৫. সংযোজক রূপে শব্দ ও অব্যয়ে ব্যবহার : এক, আর এক, এবং।

৬. Copula ('হওয়া' ক্রিয়া)-র ব্যবহার—'বৈরাগ্যের উদয় হয়'।

গদ্যশিল্পী কেশবচন্দ্র যে মনোযোগ পান নি তা দিতে আমাদের আর বিলম্ব করা উচিত নয়।

॥ ৭ ॥ কথাশেষ : কে. সি. এস. আই. ॥

কেশবচন্দ্র ছয় মাসের জন্য (মার্চ-সেপ্টেম্বর ১৮৭০) বিলাত ভ্রমণে যান। কমপক্ষে সত্তরটি সমাবেশে চল্লিশ হাজার শ্রোতার সামনে কেশব তাঁর বক্তব্য পেশ করেন। ইংলাণ্ড স্কটলাণ্ডের ধনী দরিদ্র, উচ্চ নীচ, পাপী তাপী, সৎ অসৎ বিভিন্ন রকম শ্রোতার কাছে ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে তিনি ভাষণ দেন। সর্বত্রই শ্রোতারা চমৎকৃত ও মুগ্ধ হন।

বিলাতে কেশব-প্রদত্ত ভাষণের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ উল্লেখ্য। মেট্রোপলিটান টেবার্ণকলে (২৪ মে ১৮৭০) প্রদত্ত ভাষণের বিষয় 'England's duties to India'। ভারত শাসনব্যাপারে ইংলাণ্ডের ভূমিকা সম্বন্ধে তাঁর অভিমত কেশব সেদিন নির্ভয়ে ব্যক্ত করে বলেন,

'You cannot hold India for the interest of Manchester, nor for the welfare of any other community here (England), nay, for the advantage of those merchants who go to India, live as birds of passage for a time and never feel any abiding interest in the country ; because really they cannot do so...... . Those days are gone never to return when men thought of holding India at the point of bayonet. If England seeks to crush down two hundred millions of people in this glorious country, to destroy their nationality, to extinguish the fire of noble antiquity and the thrill of ancient patriotism and if England's object of governing the people of India is simply to make money, then I say, perish British rule this moment.

এই নির্ভীকচিত্ততা ও স্বদেশপ্রাণতার পরিচয় গত শতাব্দে বিরলদৃষ্ট ছিল। নির্ভীক স্বদেশপ্রাণ কেশব ছিলেন ঈশ্বর-সমর্পিত-চিত্ত।

কেশব-চরিত্রে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সদাহাস্যময়তা ও পরিহাসপ্রবণতা। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছিলেন, "একবার আমার একটি বন্ধুর কন্যার নামকরণে তাঁহার উপাসনা করিবার কথা। সন্ধ্যা ৭টার সময় উপাসনা আরম্ভ হইবে, এইরূপ স্থির ছিল। আমরা বসিয়া আছি, তিনি আর আসেন না। তিনি গবর্নর জেনারেলের বাড়িতে এক সান্ধ্য সমিতিতে গিয়াছেন। বলিয়া গিয়াছেন, তিনি একবার দেখা দিয়াই চলিয়া আসিবেন। এদিকে ৮টা বাজিয়া গেল, ৮॥টা বাজিয়া গেল, তাঁহার দেখা নাই। অবশেষে প্রায় ৯টার সময় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি হাসিয়া বলিলাম, 'আপনি বড়লোকের সঙ্গে সঙ্গে বেড়ান কেন? কই, আপনাকে তো কোন টাইটেল দেয় না?' তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'কেন হে বাপু? কে. সি. এস. আই. (অর্থাৎ কেশবচন্দ্র সেন আমি), আমার টাইটেলের অপ্রতুল কি?'" (আত্মচরিত, শিবনাথ রচনাসংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৭৬, সাক্ষরতা প্রকাশন, পৃ ৮১)।

সত্যি তাই, কেশব সেন কেশব সেন। তাঁর অন্য টাইটেলের দরকার নেই। মহর্ষি তরুণ কেশবকে টাইটেল দিয়েছিলেন—ব্রহ্মানন্দ। তা-ই যথেষ্ট। এই পরিচয়ে আমরা তাঁকে মনে রাখছি, মনে রাখব। *

---

* নববিধান পাবলিকেশন কমিটির প্রাক্তন সচিব শ্রীসতীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সাহায্যের জন্য তাঁর কাছে লেখক কৃতজ্ঞ। এই সঙ্গে মুদ্রিত কেশবচন্দ্রের ছবিটিও তাঁর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

শ্রী কেশবচন্দ্র সেন

বিলাতে—১৮৭০

স্কুলশিক্ষা ও মাতৃভাষা বাঙলা*

শ্রীপরেশচন্দ্র মজুমদার

॥ ১ ॥
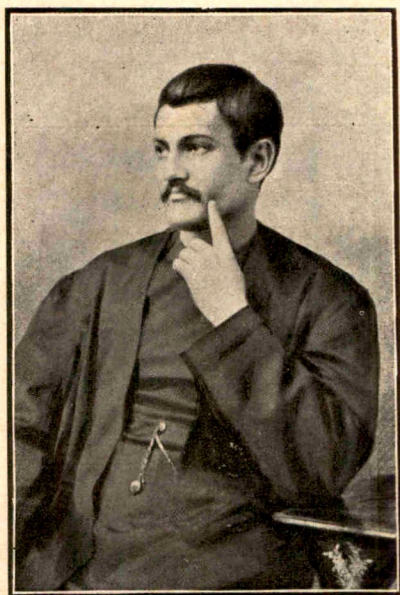
আজ থেকে ৪০।৫০ বছর আগে আমার মতো অনেকেরই প্রাথমিক শিক্ষার শুরু হতো বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়, সরল ধারাপাত আর অবশ্যই সেই সঙ্গে গুরুমশায়ের ছিপছিপে একখানি রাখালিয়া বেত দিয়ে। সেই বেত্রদণ্ড সম্পর্কে আজ বঙ্কিমচন্দ্রীয় রীতিতে বলতে হয়, 'হায় বেত্র, তোমার দিন ফুরাইয়াছে।' আগেকার সেই সরল ধারাপাতও আজ আর ছাত্রের ধারাবর্ষণ ঘটায় না—কড়া-গণ্ডা-বুড়ি-পণ অথবা মন-সের-ছটাক-কাঁচ্চা হিসেবের কড়া-ক্রান্তি গোলকধাঁধা থেকে মুক্তি পেয়ে সে গ্রাম-কিলোগ্রাম বা টাকা-পয়সার আন্তর্জাতিক বাজারে পৌঁছতে পেরেছে। কিন্তু হায় বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়-মানসিকতা থেকে বাঙালী পড়ুয়ার মুক্তি আজও ঘটেনি। তদানীন্তন পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ধন্যবাদ—তাঁরা প্রথম শিক্ষার্থী বাঙালী শিশুকে নীরস গদ্যের নীতি-জর্জরিত বিষয়বস্তু থেকে উদ্ধার করেছেন রবিঠাকুরের 'সহজ পাঠে'র ছড়ার জগতে। কিন্তু এতেও কি শিক্ষার উদ্দেশ্য পুরোপুরি সফল হয়েছে? না, তা হয় নি, কারণ প্রাথমিক শিক্ষার আসল উদ্দেশ্যই আমাদের কাছে অস্পষ্ট রয়ে গেছে। তাই বর্ণপরিচয়ের পাশাপাশি আর একখানা পাঠ্যপুস্তক সহ-অবস্থান করছে মাত্র।

বস্তুত, মাতৃভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য বলতে আমরা এখনও বুঝি, প্রাথমিক স্তরে হয় বানানশিক্ষা নতুবা কিছু নীতিসর্বস্ব উপদেশ, আর মাধ্যমিক স্তরে তা কেবল ব্যাকরণময় বিভীষিকা। তাই যে-ছাত্র যত বেশি কঠিন শব্দের বানান অথবা ততোধিক কঠিন শব্দের অর্থ অবলীলাক্রমে ব'লে যেতে পারবে, সেই হবে ক্লাসের মনিটর। ভাষারচনায় গুরুচণ্ডালী দোষ যাতে না ঘটে, সে-বিষয়ে ছাত্রের দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখবেন মাস্টারমশাই। ঘরে-বাইরে আমরা ভাষার যে-রীতি ব্যবহার করি, সে-শেখা শেখাই নয়, কারণ তা শুনেই শেখা যায়! যে লেখা বা পড়ায় বিশেষ পারিপাট্য আছে, তাকে আটপৌরে ছোঁয়াচ থেকে সযত্নে বাঁচিয়ে রাখাই হলো প্রকৃত ভাষাশিক্ষা। আবার শিক্ষার উঁচু স্তরে, চিকিৎসাবিদ্যা, এঞ্জিনিয়ারিং বা বিজ্ঞান যদি হয় লক্ষ্য বস্তু, তবে আমরা মনে করি, ভাষাশিক্ষার তেমন প্রয়োজনই নেই, কারণ ভাষাশিক্ষা হলো মানবিকী বিদ্যা অর্থাৎ তা Arts বা Humanities-এর অন্তর্গত, Science-এর নয়।

ভাষাশিক্ষার উদ্দেশ্য বা রীতিনীতি আবিষ্কার করা পরের কথা, আগে দেখতে

---

* Central Institute of Indian Languages (Mysore) এবং Anthropological Society of India (Calcutta) সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনা-চক্রে পঠিত (১২. ১২. ৮১)।

হবে আমাদের গোড়ার গলদ কোথায়। আসলে আমরা বুঝতেই চাই না যে সনাতন ভাষাশিক্ষণ-রীতি বলে কিছু নেই। যুগধর্ম ও লোকধর্ম অনুযায়ী সে-রীতি বদলাবেই। স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গের কথাই ধরা যাক। স্বাধীনতা-পূর্ব যুগের বাঙালী সমাজব্যবস্থা অথবা সামাজিক চেতনা কী এমন এক কনে বউ যাকে পিঁড়ি ক'রে ধ'রে নিয়ে বর্তমানের আসরে বসিয়ে দিলেই শুভকার্য সমাধা হবে? মনে রাখা দরকার, স্বাধীনতা লাভের পর এপার বাঙলায় এক নিদারুণ বিপর্যয় এবং দ্রুত পরিবর্তন ঘটে গেছে—যার তুলনা ভারতের অন্যান্য রাজ্যে মেলা ভার। স্বাধীনতার বিনিময় মূল্যে বাঙালী এক চরম ঐতিহাসিক শিক্ষা লাভ করেছে। তাই সাম্প্রদায়িক বিভেদ আর জাত-পাতের পংক্তি বিচার এদেশের সাধারণ মানুষের মনে অন্তত এখন আর তেমন আলোড়ন তোলে না। আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা অথবা জমিদারিতন্ত্রের অলস জীবনচর্চা আজ অবক্ষয়ের মুখে। যৌথ পরিবার এখন অতীতের কিউরিও-শালা। অর্থনৈতিক ভাঙনের ফলে সামাজিক স্তরভেদ বিপর্যয়ের সম্মুখীন অথচ এরই আড়ালে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক বিচ্ছিন্নতার স্বর্গে বাস ক'রে আর্য কৌলীন্যের স্বপ্ন-সিঁড়ি ভেঙে চলেন।

বাঙালী সমাজের সবচেয়ে বড়ো পরিবর্তন বোধহয় নাগরিক চেতনার ক্রমবিকাশ (Urbanisation) এবং সেইসঙ্গে যন্ত্রশিল্পের সম্প্রসারণ (Industrialisation)। আজ আর বাঙলা দেশে খাঁটি গ্রাম বোধহয় কোথায়ও তেমন নেই। কারণ সেগুলি ক্রমশই শহরতলী হয়ে উঠছে—জনসংখ্যার বিস্ফোরণে অথবা শহুরে মানসিকতায়—পোষাকে-আশাকে, শিক্ষায় দীক্ষায়, চাল ও চলনে। গ্রাম ও শহরতলীর খুব কম পরিবারেই এমনটি দেখা যাবে যেখানে কোন-না-কোন শিক্ষিত বেকার যুবক শিল্প-শ্রমিক হিসেবে কলকারখানায় কাজ করতে লজ্জাবোধ করেন অথবা প্রয়োজনবোধে তাঁর নিজের গ্রাম ছেড়ে যেতে ইতস্তত করবেন।

বলাবাহুল্য, এই যদি হয় যুগধর্ম তবে ভাষাধর্মও কী অব্যয় অক্ষয় হয়ে টিঁকে থাকতে পারে? অবশ্য একথা মনে করলে ভুল হবে যে যুগপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার design বা কাঠামোও পরিবর্তিত হয়ে গেছে। পরিবর্তন হয়েছে আসলে ভাষার বিষয়বস্তুর (Content)। চম্‌স্কি'র ভাষায় বলতে হয়, ভাষাশিক্ষার্থীর Competence অর্থাৎ ভাষিক বোধ বা যোগ্যতার নয়, পরিবর্তন হয়েছে Performance-এর অর্থাৎ ভাষাপ্রয়োগ বা প্রকাশভঙ্গীর। ভাষাশিক্ষার ব্যাপারে এই সামাজিক বা পারস্পরিক আদান-প্রদানের (Communicative) দিকটি তুলে ধরার দায়িত্ব অবশ্যই ভাষাশিক্ষকের হাতে তুলে দিতে হবে। এ-বিষয়ে তাঁর ভূমিকা কী হবে সে-সম্বন্ধে একজন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতের ছোট্ট একটি উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে—"A teacher…simply has to maintain the same kind of contact with changes in his basic material as that maintained by doctors and lawyers" (Sumner Ives)।

বর্তমান প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ কম। তাই বাঙলাভাষার শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের পক্ষে জ্ঞাতব্য দুটি তথ্য—ভাষার আঞ্চলিক এবং সমাজ-ভাষাতাত্ত্বিক প্রসঙ্গ সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

১. আঞ্চলিকতার প্রসঙ্গ

বঙ্গদেশ বিভক্ত হওয়ার পর এক বিপুল জনসংখ্যা এপার বাঙলায় চলে এসেছে। আজ তাঁরা পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের নাগরিক। এই ছিন্নমূল নাগরিকদের কেবল পূর্ববঙ্গীয় উপভাষাভাষী ব'লে চিহ্নিত করলে ভুল হবে। কারণ এঁরা কেবল পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলেন না। এঁরা বিভিন্ন সমাজস্তরের প্রতিনিধিও বটে। এঁদের মধ্যে অনেকেই আজ শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী। বিভিন্ন অঞ্চলের স্কুলগুলিতে সমীক্ষা চালালেই বোঝা যাবে, ভাষাশিক্ষার ব্যাপারে এক স্বাভাবিক নৈরাজ্য চলছে। একজন বরিশালের শিক্ষক হয়তো বাঁকুড়ায় বাঙলাভাষা শিক্ষার ক্লাশ নিচ্ছেন। শিক্ষার্থী যে-ভাষা শিখছেন তা কি প্রকৃতপক্ষে আদর্শ চলিত ভাষা? টি. ভি., রেডিও প্রভৃতি গণমাধ্যমে এইরূপ নিয়তই সংকররীতি সৃষ্ট হয়ে চলেছে, কারণ আদর্শ চলিত ভাষার 'নর্ম্' (Norm) যে প্রকৃত কী তা কারও জানা নেই। বহু শিক্ষিত লোকের কথাবার্তা একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে আদর্শ চলিত বাঙলায় ভাঙাগড়ার পর্ব নতুন ক'রে শুরু হয়েছে। এই আদর্শ ভাষা বর্তমানে যে-রূপ পরিগ্রহ করতে চলেছে তার সঠিক চেহারা এখনও স্পষ্ট হয়ে হয়তো ওঠে নি, কিন্তু তার নতুন প্রবণতা আমাদের নজরে না প'ড়ে পারে না। সেগুলি সংক্ষেপে বোধহয় এই :

প্রথমত, পূর্ববঙ্গীয় ভাষার প্রভাব। আদর্শ ভাষায় পূর্বী বাঙলার কিছু কিছু লক্ষণ গত প্রজন্মেই লক্ষ্য করা গিয়েছিলো, যেমন 'সঙ্গে' অনুসর্গের পাশাপাশি 'সাথে' শব্দের প্রয়োগ, ক্রিয়াবিভক্তি -তুম,-লুম স্থলে -তাম,-লাম (করতাম, করলাম), অতীত কালবাচক সকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়ার প্রথম পুরুষের বিভক্তির পার্থক্য লোপ (সে গেল / দিলে : সে গেল / দিল) ইত্যাদি। বর্তমানে নতুন প্রবণতা হলো :

(১) প্রায়শই ড় / র ধ্বনির বিপর্যয় (সারা>সাড়া, বড়>বর); স্বরসঙ্গতির অসঙ্গতি (ঘুমোয়>ঘুমায়, সুপুরি>সুপারি, ভিখিরি>ভিখারি, সে শিখোয়> শিখায়); এ / এ্যা ধ্বনির বিপর্যয় (ল্যাজ>লেজ, এ্যাকাশি>একাশি, গেলাম> গ্যালাম); আনুনাসিক উচ্চারণের অভাব (হাঁসপাতাল>হাসপাতাল, হাঁসি>হাসি)।

(২) প্রয়োগরীতির কিছু নতুন প্রবণতা, যেমন—মা ডাকে (=ডাকছে, পূর্বী : মাএ ডাকে), দিতে লাগবে না (=দিতে হবে না), হেসে দিল (=ফেললো), গরম করছে (=হচ্ছে), না ক'রে দেওয়া (=বারণ করা, মানা করা), ঘর বানায়

(=তৈরী করে), তার গা ঘামায় (=ঘামছে), বকা খাবো (=বকুনি), দোকান দেওয়া (=করা)।

(৩) শব্দসম্পর্কিত: মেনি মাছ (=স্থাদস), মিষ্টান্ন (=পায়স), লবণ (=নুন), বাড়ন (=ঝাঁটা), বাড়ি খাওয়া (=আঘাত পাওয়া), বাসা (=ভাড়া বাড়ি) ইত্যাদি।

দ্বিতীয়ত, কিছু আদর্শ কলকাতাই উচ্চারণের বা ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের অবনমন। স্বামী বিবেকানন্দের বাঙলা রচনাগুলিতে এই আদর্শের একটি সুস্পষ্ট ছবি ধরা আছে। সেইসঙ্গে অবশ্য আমাদের মতো বয়স্ক খাঁটি কলকাতানিবাসীদের বাল্যস্মৃতি মিলিয়ে নিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, 'ল' স্থানে 'ন' ধ্বনির প্রয়োগ এখন অনেকেরই হাসির খোরাক জোগায়, যেমন, নুচি, নেপ, নেবু নাউ। অনুরূপভাবে 'ব' স্থানে 'ম'-এর পুনরাবির্ভাব এখন আর কর্ণ-পীড়ন ঘটায় না, যেমন—আঁব, তাঁবা, নাবা>আম, তামা, নামা। খাঁটি 'কলকেতা' উচ্চারণে এখনকার 'হিন্দু, সুন্দরবন, কোন্দল' প্রভৃতি যে 'হিঁদু, সোঁদরবন, কোঁদল' রূপে প্রচলিত ছিল তার সাক্ষ্য জোগাড় করতে এখন পুরোনো বই-পত্তর ঘাঁটতে হয়। সবচেয়ে বড়ো পরিবর্তন বোধ হয় সন্ধি-ভূত সংক্ষিপ্ত শব্দের সন্ধিমুক্ত সম্প্রসারণ, যেমন—দ্যাল>দেওয়াল, শ'বাজার>শোভাবাজার, শ্যালদা>শিয়ালদা, প্যাজ>পিঁয়াজ, শোর>শুওর, ম'>মোয়া, বে>বিয়ে, পেনেটি>পানিহাটি, উলুবেড়ে>উলুবেড়িয়া, বেলঘরে>বেলঘরিয়া, ঢাকুরে>ঢাকুরিয়া, গড়েহাট>গড়িয়াহাট, পাতকো>পাতকুয়া ইত্যাদি।

তৃতীয়ত, লিখিত আদর্শ অনুযায়ী বানানমুখী উচ্চারণের প্রবণতা। ওপরের কিছু উদাহরণ থেকেই এ-প্রবণতা চিনে নিতে কষ্ট হয় না। আর এ-প্রবণতার কারণ বোধ হয়, কলকাতায় বিচিত্র আঞ্চলিক ভাষীদের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি। এঁদের পক্ষে চলতি আদর্শ উচ্চারণ অনুধাবন করা কষ্টসাধ্য তো বটেই, উপরন্তু সামাজিক সংরক্ষণশীলতা স্পর্শকাতর খাঁটি কলকাতাবাসীদের এঁদের থেকে এখনও বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। এই নতুন প্রবণতার কিছু লক্ষণ এই—

১. মহাপ্রাণিত ধ্বনির সঠিক উচ্চারণ যেমন, 'হচ্চে, কচ্চি, দেক্‌চি' স্থলে 'হচ্ছে, করছি, দেখছি'।

২. অ>ও-পরিবর্তন বিমুখিতা: ।ওব্‌ভেশ।>।অব্‌ভ্যাস।, ।লোক্‌খো।>।লক্‌খো।, ।নোমোশ্‌কার।>।নমশ্‌কার।

৩. পদান্ত -এ, -ও>-আ: সুবিধে>সুবিধা, নৌকো>নৌকা, মিথ্যে>মিথ্যা।

৪. সংস্কৃতসুলভ উচ্চারণ-প্রচেষ্টা: উজ্জোগ>উদ্যোগ,। পদ্দজা, আঁত্তা, চক্‌খুস্‌সাঁন। স্থলে 'পদ্মজা, আত্মা, চক্ষুষ্মান্'।

৫. শুদ্ধ উচ্চারণ-প্রবণতা: আদিখ্যেতা >আধিক্যতা, বিস্কুট>বিস্কিট, আঁক কষা>অঙ্ক করা, চান করা>স্নান করা, নোনা (জল)>লোনা, মাইনে>বেতন।

৬. ভুয়া শুদ্ধ শব্দসৃষ্টি : ইংরিজি>ইংরাজী (বিলিতি : বিলাতি ইত্যাদির সাদৃশ্যে)।

যাই হোক, আমাদের বক্তব্য, বাঙলা ভাষাশিক্ষার পক্ষে আদর্শ চলতি ভাষা যদি অপরিহার্য হয় তবে এইজাতীয় পরিবর্তন অথবা ভাষামিশ্রণ সম্পর্কে শিক্ষককে সচেতন হতে হবে। অবশ্য কেবল শিক্ষকের সহজাত শিক্ষণক্ষমতার ওপর সমস্ত ব্যাপারটিকে ছেড়ে দেওয়া যায় না। এর জন্য অবিলম্বে যা করা দরকার তা হলো : আদর্শ চলিত বাঙলার উচ্চারণ অভিধান অথবা Phonetic Reader-জাতীয় গ্রন্থ প্রণয়ন।

২. সমাজ-ভাষাতাত্ত্বিক প্রসঙ্গ

পূর্বেই বলেছি বাঙলাভাষার শিক্ষা ও শিক্ষণ প্রকল্পে ভাষিক এবং সামাজিক ভাবনার সুষ্ঠু সমন্বয় এবং সহযোগ একান্ত প্রয়োজনীয়। তাই প্রাথমিক কর্তব্য হবে সামাজিক-ভাষাতাত্ত্বিক মূল ধারণাগুলি সম্পর্কে অবহিত হওয়া। এর জন্য একদিকে যেমন প্রয়োজন ভাষিক সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত জীবনের পরিচয়পত্র—তাদের বয়স, পেশা, লিঙ্গ, পারিবারিক অবস্থা, অবস্থানভূমি ইত্যাদি, অপরদিকে তেমন প্রয়োজন গোষ্ঠী ও সামাজিক চরিত্র হিসেবে তাদের শ্রেণীচরিত্র বিচার, যেমন ভাষিক সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সংযোগ, ব্যবহারিক প্রয়োগরীতি (Register), সামাজিক মর্যাদাবোধ, পেশা বা বৃত্তিমূলক জীবনযাত্রা-প্রণালী, ভাষিক প্রয়োগের ক্ষেত্র, প্রসঙ্গ ও পরিস্থিতি, এমনকি ভাষার প্রতি উৎসর্গীকৃত দৃষ্টিভঙ্গী—এককথায় প্রাতিষ্ঠানিক ভাষাবিজ্ঞানের (Institutional Linguistics) প্রতিপাদ্য সমগ্র বিষয়বস্তুসমূহ। বলাবাহুল্য, এ-সবেরই উদ্দেশ্য হলো ভাষিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে নতুন নতুন সামাজিক ভূখণ্ডগুলির আবিষ্কার। কিন্তু সেই সঙ্গে আবার মুদ্রার অপর পিঠ দেখে চিনে নিতে হবে ভাষার স্বধর্মনিহিত সামাজিক তাগিদের মূল গতিপথ। একটু অনুধাবন করলেই দেখা যাবে, বর্তমানে কেমনভাবে সামাজিক স্তরবিন্যাস ভাঙছে অথবা গড়ছে, আব এই ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠছে এক নতুন সমন্বয়ী সমাজধর্ম। ভাষার প্যাটার্নের মধ্যেও এই সাম্য প্রতিফলিত হতে বাধ্য।

লক্ষ্য করার বিষয়, শিক্ষার প্রতি আগ্রহ, আজ আর কেবল উচ্চ মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্তের মধ্যেই সীমায়িত নয়। স্বাধীনতা-উত্তর যুগে তাই শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে, সাক্ষরতার হারও গেছে বেড়ে। ফলে কৃষক ও শ্রমিকভুক্ত নিরক্ষর মানুষ আজ আর শিক্ষাকে নিরর্থক অপব্যয় ব'লে মনে করেন না। আমাদের প্রজন্মেই দেখছি, ক্রমাগত সমাজের নিচু তলার মানুষ ওপর তলায় ওঠবার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এ-প্রবণতাকে কেবল চাকরির তাড়না অথবা Status অর্জনের চেষ্টা ব'লে ব্যাখ্যা করা অসংগত হবে। বস্তুত, বৈষম্যের ক্রমিক অবসান যে-কোন গণতান্ত্রিক

দেশের সহজ এবং স্বচ্ছন্দ প্রবণতা। অপরদিকে যান্ত্রিক এবং শহুরে ধ্যানধারণার চৌম্বক আকর্ষণ ক্রমাগতই তার পরিধি বিস্তার করে চলেছে। ভাষার ক্ষেত্রে এই শিল্পায়ন, এই নাগরিকতার প্রভাব অস্বীকার ক'রে লাভ নেই। ফলস্বরূপ, গড়ে উঠছে এক নতুন ভাষার জগৎ—বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে, শব্দসম্পদে, রচনারীতি অথবা উপস্থাপনার নব আঙ্গিকে, যা ক্রমশই আমাদের মনোযোগী করে তুলছে।

বলাবাহুল্য, ভাষিক এবং সামাজিক জগতের এই মেলবন্ধন ঘটিয়ে চলেছে আজকের দিনের গণমাধ্যমগুলি—টেলিভিশন, রেডিও, সিনেমা অথবা সংবাদপত্র। এই গণমাধ্যমগুলির সক্রিয়তায় এবং সহযোগে শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত অথবা অশিক্ষিত মানুষের যোগাযোগের নতুন পথ আবিষ্কৃত হচ্ছে। উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটিকে স্পষ্ট করা যাক। বাঙালী সমাজের শিক্ষিত মানুষ যে উচ্চকোটির বাঙলাভাষা ব্যবহার করেন, সে-ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো বাঙলায় ইংরেজী ও সংস্কৃতরীতির অধ্যারোপ, যেমন, নতুন শব্দগঠনপ্রক্রিয়া (জীবন/জৈবনিক, কাল/কালিক, রূপ/রৌপ, জল-অচল/Water-tight, মধুচন্দ্রিমা/Honeymoon), শব্দসম্পদ আহরণ অথবা বাক্যগঠনরীতির ক্ষেত্রে। অপর দিকে সমাজের আধাশিক্ষিত জনসাধারণ, বিশেষত, অর্ধশিক্ষিত যুবজনের প্রভাবে বাঙলাভাষার পুষ্টি জোগাচ্ছে বিশেষ ধরণের কিছু শব্দ অথবা অদ্ভুত প্রয়োগ-পদ্ধতি যেমন, বিকৃত অথবা খণ্ডিত ইংরেজী শব্দ (Fanta, Kali, মাতেল), অপশব্দ (ঝাড়, বাতেলা, রোয়াব, পেটো, চোথা, ঢপ, ঠেক) অথবা অপভাষিক প্রয়োগ (টুপি পরানো, প্যাক দেয়া, লাশ ফেলে দেওয়া, কাঁচি মারা) বা অপপ্রয়োগ (Heavy খিদে, Top মাল, Terrific গান গাওয়া) ইত্যাদি। এই উভয়বিধ প্রভাবের স্বরূপ আমি অন্যত্র বিচার করেছি।[১] বর্তমানে বিচার্য হলো, ধরা যাক, এ-ব্যাপারে সংবাদপত্রের ভূমিকা কী হবে তার দিগ্‌দর্শন। সংবাদপত্রে অবশ্যই এমন ভাষাপদ্ধতি অনুসৃত হবে যা এই উচ্চশিক্ষিত এবং অর্ধশিক্ষিত মানুষের আন্তর যোগসাধন ঘটায়। উপরন্তু এর সঙ্গে যুক্ত হবে সাক্ষর অথচ অশিক্ষিত সাধারণ মানুষের পক্ষে বোধগম্য আদর্শ বাগ্‌ধারা। বিভিন্ন ভাষাসম্প্রদায়ের মধ্যে এই ভাষিক সাম্য স্থাপন করাই হবে যথার্থ সাংবাদিকের ঈপ্সিত আদর্শ। কেবল বাগ্‌রীতি অথবা বাচনভঙ্গী নয়, নতুন শব্দসম্পদ উদ্ভাবনাও হবে সংবাদপত্রের এক দুরূহ দায়িত্ব—বানানরীতি সংস্কারের কথা না হয় বাদ দেওয়াই গেলো। কিছুটা স্মৃতির আশ্রয় নিলেই আমরা দেখতে পাবো, আমাদের অজানতে কতো নতুন নতুন শব্দ অথবা শব্দগঠন প্রক্রিয়া সংবাদপত্রে সৃষ্ট হয়ে চলেছে। ফলে বাঙলাভাষা হয়ে উঠছে ক্রমেই অধিকতর পুষ্ট এবং সমৃদ্ধ। এ-বিষয়ে আগাম কিছু উদাহরণ এখন উদ্ধৃত করা যাক ভাবী গবেষণার পথ চেয়ে—

১. শীর্ষনাম (Heading) সৃষ্টির বৈচিত্র্য, যেমন—

(ক) শব্দসামীপ্য (Colligation): বিপন্ন বিশ্বক্রিকেট, নীরন্ধ্র নিরাপত্তা,

অকাল ভোটে ফ্রন্ট অনড়, বাম ঐক্য, পাতাল ট্রেনের পরীক্ষা দৌড়, অথ পরীক্ষা কথা, সাহারা শহরে নির্জলা তেরাত্তির ইত্যাদি।

(খ) অসম্পূর্ণ বাক্যের প্রয়োগ : লোডশেডিং জাঁকিয়ে, বাড়ি থেকে পালিয়ে, জিয়াকে ইন্দিরা ইত্যাদি।

(গ) বিশেষণের বিধেয় প্রয়োগ : সফর বাতিল, ...উক্তি দায়িত্বহীন, যানবাহন অচল, খেলা পণ্ড।

(ঘ) কাব্যধর্মী প্রয়োগ : কলকাতার পথের পাঁচালি, রাজপথের পাঁচালি, কলকাতা আছে কলকাতাতেই, কলকাতা কল্লোলিনী তিলোত্তমা, একই অঙ্গে এতরূপ (বিজ্ঞাপন), আপনি আচরি ধর্ম।

(ঙ) ব্যঙ্গধর্মী প্রয়োগ : সব ট্রেন চাল-স্পেশাল, পাতাল রেলের পাতাল প্রবেশ, আয়ারাম-গয়ারামের খেলা, আপেলের জ্বর (উপগ্রহের উত্তাপবৃদ্ধি), সফল পাতাল প্রবেশ।

(চ) চমক সৃষ্টির প্রয়াস : কেরোসিনের ইঁদারা ; বাড়ছে : ভয়, ভিড় ভাড়া, ফের বেহাল : বিদ্যুৎ ; দিনে বেশি রাতে কম : লোডশেডিং।

২. শব্দসাযুজ্য (Collocation) : রুগ্ন শিল্প, কায়েমী স্বার্থ, উড়াল পুল, মারমুখী জনতা, মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান, লাগাতার ধর্মঘট, মাগ্‌গী ভাতা, কাঁদানে গ্যাস, পুলিশী তৎপরতা / অভিযান / ব্যবস্থা, জঙ্গী শাসন / আইন, শীর্ষ বৈঠক / সম্মেলন।

৩. বিকল্প প্রয়োগ : বেতন-বিস্ফোরণ / মুদ্রাস্ফীতি (Inflation) 'নির্বীর্যকরণ' / বন্ধ্যাকরণ (Tubectomy), শিলান্যাস / ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন (Foundation), দরপত্র / ইচ্ছাপত্র (Tender), নজরদার / অবধায়ক (Invigilator)।

৪. শব্দমিশ্রণ : ভাষাদাদাতত্ত্ব, ধোঁয়াশা (Smog), জ্যামজমাট, সিংগ্র (Litigon), ব্যাংগ্র (Tigon)।

৫. নতুন শব্দযোজনা : আবাসন, প্রকল্প, যোজনা, ভরতুকি, বিধায়ক (MLA), ছাঁটাই (Lay-off), করণিক, হুজুতী।

৬. অনূদিত ঋণ : বিদ্যুৎছাঁটাই, যানজট, আমলাতন্ত্র, একান্ত সচিব, সবুজ সংকেত, সর্বার্থসাধক, নলজাতক, কালোবাজার, কালাধার, অভয়ারণ্য, প্রতিবন্ধী, ক্ষেপণাস্ত্র, ভারী শিল্প / জল, শোধনাগার, বোমারু।

৭. হিন্দী শব্দের অনুপ্রবেশ : খোয়াব, মদৎ, মুনাফা, বকেয়া, জবান, সমঝোতা, বন্ধ, ভেণ্ডি, থগে যাওয়া (টিভি বিজ্ঞাপনে), সোচ-বোঝ, সোচ-বিচার, ফিন্‌, নাস্তা, ঝুপড়ি, মোকাবিলা, থামুতি, নয়া, সুনসান্‌, মদত্‌ ইত্যাদি।

৮. প্রবচন : লালফিতের বাঁধন (Red tapism), মগজ ধোলাই,-চালান (Brain drain), খালিপদ ডাক্তার (Bare-footed Doctor), বোনাস-বাবু।

॥ ২ ॥

ওপরের আলোচনা থেকে নিশ্চয়ই স্পষ্ট হয়েছে যে ভাষাশিক্ষার বিচারব্যবস্থা কেবল স্কুলের কাঠগড়ায় ব্যাকরণের আইনে গড়ে ওঠে না, তার সঙ্গে যুক্ত করতে হয় সামাজিক মর্যাদার অধিকারবোধ অথবা মনোবিজ্ঞানীর ব্যবস্থাপত্র। সমাজ-ভাষা-বিজ্ঞানীই সে-চিকিৎসার দায়িত্ব গ্রহণ করার যোগ্য। বস্তুত, পাশ্চাত্ত্য ভাষাবিজ্ঞানীরা ভাষাতত্ত্বের ফলিত দিকটির ওপর যথেষ্ট আলোকপাত করেছেন তাঁদের সাম্প্রতিক গবেষণাকার্যে। প্রতীচ্যে আধুনিক শিক্ষণপদ্ধতির ধারা সেই নির্দিষ্ট খাতেই বেয়ে চলেছে। বর্তমান আলোচনা সেই প্রভাবের বাইরে নয়।[২]

মাতৃভাষা হিসেবে স্কুলে বাঙলাভাষার শিক্ষণপদ্ধতি তিনটি ধাপে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত। শিক্ষাক্রমের প্রথম পর্বে গৃহীত হবে আনুশাসনিক (Prescriptive) শিক্ষণপদ্ধতি, দ্বিতীয় পর্বে বর্ণনমূলক (Descriptive) পদ্ধতি এবং তৃতীয় ও শেষ পর্বে সৃজনশীল (Productive) পদ্ধতি।

যদি ধ'রে নেওয়া যায়, স্কুলে আসার পূর্বেই শিশু তার মাতৃভাষা মাতৃক্রোড়ে গৃহপরিবেশে আয়ত্ত করেছে, তবে সেই পূর্বলব্ধ কাঠামোর পরিবর্তন সাধন হলো প্রথম পর্বের লক্ষ্যবস্তু। তাই প্রথম পর্বের প্রবেশমুখে শিক্ষার্থীর বয়স, পারিবারিক অবস্থা, সামাজিক বাতাবরণ অথবা প্রাতিবেশিক পরিস্থিতি ইত্যাদির সমীক্ষা অনিবার্য হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় পর্বের শিক্ষাধারায় অর্জিত ভাষাকাঠামোর নতুন কোনো পরিবর্তন নয়। তার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীকে তার মাতৃভাষার কার্যকরী ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন এবং দায়িত্বশীল ক'রে তোলা। এর ফলে সে কেবল মাতৃভাষার দর্শক হয়ে উঠবে না, সে হবে পরিদর্শক। মাতৃভাষার সঙ্গে তার সম্পর্ক হবে যন্ত্র ও যন্ত্রীর। এই ভাষার কারিগরী জ্ঞান অর্জন করতে পারলে ভবিষ্যতে সে অন্য কোনো ভাষা শিখতে অসুবিধে বোধ করবে না। এমনকি সাধারণ ভাষাবিদ্যার স্বভাব ও স্বধর্ম সম্পর্কে সে এক নৈর্ব্যক্তিক জ্ঞান অর্জন করতে পারবে। পরবর্তী সৃজনশীল পর্বের মূল উদ্দেশ্য হবে শিক্ষার্থীকে স্রষ্টার যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করা। ভাষাসম্পর্কীয় নতুন উদ্ভাবনী শক্তি, বিচিত্র প্রায়োগিক বৈশিষ্ট্য, ব্যবহারিক রীতিনীতি অথবা সাহিত্যিক সৃজনশীলতা আবিষ্কার ক'রে সে ক্রমশ সমাজের বৃহৎ আসরে নিজের স্থান করে নেবে। এখন আরও বিস্তৃত আলোচনায় প্রবেশ করা যাক।

১. আনুশাসনিক পর্ব (Prescriptive Level)

মাতৃভাষা হিসেবে বাঙলা শেখে শিশু মাতৃক্রোড়ে অথবা বাড়ির চার দেওয়ালের মধ্যেই। সুতরাং স্কুলে আসার আগেই সে যে-ভাষার কাঠামো দক্ষভাবে গ'ড়ে তুলেছে তার অজান্তে, তার সঙ্গে সংঘাতের সূত্রপাত করেই তার স্কুলজীবনের ভাষাশিক্ষার শুরু। একে বলা যায় মাতৃভাষার অনুশাসন পর্ব। এই নতুন অধ্যারোপিত আদর্শে

যেমন সংশোধনী শিক্ষার ইতিবাচক দিক আছে, তেমন নেতিবাচক (Proscriptive) দিকও আছে। এর কোন্ দিকটায় বেশি জোর দেওয়া হবে তার দায়িত্ব হলো শিক্ষকের। প্রাচীন পদ্ধতির শিক্ষাব্যবস্থায় এই নেতিবাচক দিকটির ওপরই বেশি জোর দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই পদ্ধতি অবৈজ্ঞানিক এবং ত্রুটিপূর্ণ। কারণ এতে গোড়া থেকেই ভাষাসম্পর্কে ছাত্রের ভীতি উৎপন্ন করা হয়; তার নিজের বাচনভঙ্গী সম্পর্কে আস্থার অভাব দেখা যায়। সে যাই হোক, ভাষাশিক্ষার বিধানসর্বস্ব আবেদনে নিষেধাত্মক দিক অবশ্যই থাকবে কিন্তু ইতিবাচক দিককে তা যেন অতিক্রম না করে। চার বছরের কোনো শিশুর ভাষা নিয়ে যখন ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণা চালাতে হয়, তখন বয়স্কদের ভাষার তুলনায় সে কী ভুল করে—এমন মানদণ্ড গৃহীত হয় না। বরং শিশুর ভাষার নিজস্ব একটা মানদণ্ড গড়ে নিতে হয়। স্কুল ছাত্রের পূর্বপ্রতিষ্ঠিত ভাষাদর্শ ও গ্রহণমুখী ভাষার আলোচনা সেই ভাবেই করা উচিত।

দ্বিতীয়ত, মনে রাখা দরকার, শিশু আর এক নতুন ধরণের বিরোধের সম্মুখীন হতে বাধ্য। এতদিনে সে যা শিখেছিল তার প্রধান উপকরণ ছিল শোনা এবং বলা। স্কুলে এসে তার শিক্ষাক্রমে আরও নতুন দায়িত্ব যুক্ত হচ্ছে : শ্রুতভাষার লিখন পদ্ধতি এবং সেই সঙ্গে পঠন-অভ্যাস। এই শিক্ষা আরও জটিল হয়ে ওঠে যখন দেখা যায়, জায়গায় জায়গায় তার শেখা ভাষার সঙ্গে লিখিত ভাষার মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ তার পূর্বার্জিত ভাষা ছিল বিশেষ অঞ্চলের অথবা বিশেষ সামাজিক স্তরের প্রতিনিধি-স্থানীয়। অথচ তার লেখ্য ভাষার লক্ষ্যবস্তু আদর্শ চলতি বাঙলা। এর ওপর পূর্বপ্রচলিত প্রথা অনুযায়ী সাধু আদর্শের পাঠ যখন যুক্ত হয়, তখন শিশুর পক্ষে একটা বিমুখ প্রতিক্রিয়া সৃষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক।

মোটকথা, স্কুলশিক্ষার প্রথম পর্বের উদ্দেশ্য হবে এমন এক শিক্ষাক্রমের ব্যবস্থা করা যাতে শিশু তার পূর্বপ্রতিষ্ঠিত নিজস্ব ভাষিক প্যাটার্ণ ধীরে ধীরে ব'দলে ফেলে acceptable pattern বা সর্বজনগ্রাহ্য আদর্শ গ্রহণ করতে পারে। আর তার জন্য প্রয়োজন সংশোধন নয়, পরিমার্জন পদ্ধতি। এখন প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে, এই acceptable বা স্বীকৃত প্যাটার্ণটি কি? এই স্বীকৃত আদর্শ অবশ্যই আদর্শ চলিত বাঙলা অর্থাৎ কলকাতা বা তার আশেপাশের অঞ্চলের ভাষা। লক্ষ্য করার বিষয়, পূর্বপ্রচলিত শিক্ষাবিধানে এই আদর্শ কখনই গৃহীত হয় নি, তার কারণ একটা ভুল ধারণা—মুখের ভাষা তো শুনেই শেখা যায়, তাকে নূতন ক'রে শেখার আর কি দরকার? এছাড়া বোধ হয় আর একটি প্রত্যয় : মুখের ভাষার স্থানিক ভেদ আছে, কিন্তু লিখিত সাধু আদর্শের তা নেই। সুতরাং কৃত্রিম হলেও তা গ্রহণযোগ্য। কিন্তু মনে রাখা দরকার, শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য জীবনের সংকীর্ণ গণ্ডী থেকে মুক্তিলাভ—মুক্তিলাভ বৃহত্তর জীবনের মধ্যে। এই উত্তরণের জন্য মুখের ভাষাই শিশুর সর্বপ্রথম আশ্রয় এবং অবলম্বন। সবচেয়ে বেশি পরিচিত এই জীবনমাধ্যম আশ্রয় করেই শিশু অজানা অচেনা রাজ্যে পাড়ি

দেয়। সুতরাং লিখিত সাধু আদর্শের সঙ্গে চলতি আদর্শের সংগ্রাম যদি গোড়াতেই দেখা যায় তবে সেই শিশুর জীবনে দ্বৈধ ব্যক্তিত্ব দেখা দেয়। তখন শিশু আর এগুতে পারে না অথবা এগুতে চায় না।

Standard Dialect-কে model হিসেবে গ্রহণ করার আরও কারণ আছে। প্রথমত, অঞ্চলভাষা (Dialect) বা সমাজ-ভাষা (Sociolect) সামাজিক যোগাযোগের পক্ষে একটা সুদূরপ্রসারী মাধ্যম নয়। তাদের ভাষিক সক্রিয়তা (Function) আপাত-সীমিত। সামাজিক আদান-প্রদানের নিরিখে তার ভাষিক উপাদান বা সম্পদ বহুমুখী নয়। রাষ্ট্রক্ষমতা, প্রশাসন, আইনব্যবস্থা, শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিজ্ঞান, ব্যবসা-বাণিজ্য, সাংবাদিকতা ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রেই মানিয়ে চলার ক্ষমতা Standard Language-এর অসাধারণ।

দ্বিতীয়ত, Non-standard উপভাষাগুলি কেবল কাজ-চালানো গোছের ভাষা ব'লে তাতে রচনাশৈলীর বৈচিত্র্য (Stylistic variability) ধরা পড়ে না। ভাষাতত্ত্বের বিচারে প্রধান বা অপ্রধান ভাষার মূল্যবোধের তারতম্য নেই সত্য, কিন্তু সামাজিক মর্যাদায় প্রধান ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার না ক'রে উপায় নেই। এই বিচারে বাঙলা বা হিন্দী ভাষার পাশে মগহী বা রাজস্থানীর তুলনাই চলে না। আঞ্চলিক ও সামাজিক উপভাষার ক্ষেত্রেও তাই। ভৌগোলিক প্রসারের দিক দিয়ে লঘু-গুরু তারতম্যই শুধু নয়, পারস্পরিক বোধগম্যতার আনুপাতিক হারও এখানে অবশ্যই বিচার্য। লিখন পদ্ধতিও সাধারণত এই আদর্শ উপভাষার আশ্রয়ে ধীরে ধীরে একটা বিশিষ্ট রূপ লাভ করে। তাছাড়া আদর্শ ভাষার মধ্যে সমগ্র উপভাষাগুলির একটি সাধারণ Norm বা Common core ধরা পড়ে। তাই এই আদর্শ গ্রহণ করলে ঔপভাষিক ক্রমিক বিচ্ছিন্নতার প্রবণতা স্বাভাবিক ভাবে সংযত হয়। আর এই আদর্শ, উপভাষাগুলির মধ্যে কতকটা Lingua Franca-র উদ্দেশ্যও সাধন করে।

তৃতীয়ত, আদর্শ চলিত ভাষা নির্বাচনের সবচেয়ে বড়ো কারণ হলো এই যে এই আদর্শ ভাষার চর্চায় একটা ধারাবাহিকতা আগাগোড়া বজায় থাকে। ঐতিহাসিক সমীক্ষা অথবা ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যান এই আদর্শ ভাষা ধরেই সাধারণত গড়ে ওঠে। মোট কথা, অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষার চেয়েও এই ভাষার পুঁজি আমাদের অনেক বেশি।

যাইহোক, স্কুলশিক্ষার প্রথম কয়েক বছরের অধীতব্য বিষয় যদি হয়, অন্দরমহলের ভাষাকে চলতি আদর্শে রূপান্তর করার প্রশিক্ষণ, তবে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, শিক্ষার আদর্শ, শিক্ষার্থীর সহজাত ভাষার, তার অন্তবদ্ধ ব্যবহারের শুদ্ধি-অশুদ্ধি বিচার নয়। তার আদর্শ, শিক্ষার্থীকে চলতি আদর্শের রীতিনীতির প্রতি সশ্রদ্ধ করে তোলা, তাকে নতুন ভাষিক আদর্শে উজ্জীবিত করা। কোনো শিশু যদি বলে 'এখানে আসো' তবে তাকে প্রকৃত প্রয়োগ যে, 'এখানে এসো' তা জানিয়ে অবশ্যই শুধরে দিতে হবে কিন্তু অশুদ্ধ প্রয়োগ হিসেবে নয়। তার সামনে তুলে ধরতে হবে রেডিও,

টিভি বা গণ্যমান্য লোকের উচ্চারণের প্রচলিত রীতি উল্লেখ ক'রে। যেমন মাটিতে আসন পেতে বা না পেতে দুভাবেই খাওয়া যায়, কিন্তু আসন না পেতে খাওয়া অপরাধ নয়, তা শিষ্টাচার বহির্ভূত মাত্র।

এ-প্রসঙ্গে আর একটি তথ্য স্মরণীয়। বর্ণ-পরিচয়ের পর ভাষাশিক্ষার শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু সাধারণত এই : ধ্বনিগত, রূপগত (ব্যাকরণ ও বাক্যরীতি), শব্দগত এবং শব্দার্থগত। তবে কোনো ভাষার ধ্বনিবিচার দিয়েই সাধারণত প্রাথমিক শিক্ষার সূত্রপাত করা হয়, বিশেষত শিক্ষণীয় ভাষা যদি শিক্ষার্থীর মাতৃভাষা না হয়। মাতৃভাষা-শিক্ষার্থীর পক্ষে কিন্তু ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক দিকটি প্রথমেই উপজীব্য হওয়া উচিত নয়। কারণ ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈষম্য শিশু শীঘ্রই শুধরে ফেলে তার শিক্ষক বা বন্ধুদের উচ্চারণ শুনে অথবা বিদ্রূপ, নিষেধ ইত্যাকার সামাজিক চাপে। কোনো বালক যদি ক্লাসে 'শরীর'কে বলে 'শরীল' অথবা 'গেলাম' স্থলে বলে 'গ্যালাম', তবে বুঝতে হবে তার মাতৃভাষা বিশেষ অঞ্চলের বা বিশেষ সমাজভাষার অন্তর্গত, কিন্তু সেক্ষেত্রে তার বিশুদ্ধি পুনরুদ্ধারের জন্য বিশেষ প্রচেষ্টার বা অনুশাসনের দরকার নেই। বরং যা প্রয়োজন তা হলো আদর্শ ভাষার ধ্বনিগত পদ্ধতির অভ্যাস ও চর্চা। আর এর জন্য বর্ণনামূলক (Descriptive) ভাষাতত্ত্বের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। যেমন বিশেষ কতকগুলি বৈপরীত্যমূলক (Contrastive) শব্দজোড় উপস্থাপনার মাধ্যমে। উদাহরণস্বরূপ, ড় / র, শ / স বা এ / এ্যা উচ্চারণের জন্য কতকগুলি Phonetic exercise-ই শিক্ষার্থীকে তার উচ্চারণ শুধরে নিতে সাহায্য করবে, যেমন, বাড়ি : বারি, সাড়া : সারা, বেলা : ব্যালা, গেলো : গ্যালো ইত্যাদি। এ-বিষয়ে অবশ্য নতুন ধরণের কিছু শিক্ষকোপযোগী Manual, Handbook বা Primer জাতীয় পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

নবীন শিক্ষার্থীর প্রাথমিক দায়িত্ব হলো শব্দসম্পদের সংগ্রহশালা নির্মাণ। ফলে শব্দার্থবিচারও তার পক্ষে অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ভাষার রূপতাত্ত্বিক প্রসঙ্গ অবশ্য দ্বিতীয় পর্বের অর্থাৎ বর্ণনমূলক পর্বের প্রতিপাদ্য বিষয়। সে-প্রসঙ্গে আমরা পরে আসছি। শিশুর শব্দভাণ্ডার গ'ড়ে তুলতে হলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন : বিভক্তি বা প্রত্যয়মুক্ত স্বাধীন শব্দ। ইংরেজীর ক্ষেত্রে একটি সুবিধে হলো, শব্দশিক্ষায় বিভক্তি বাদ দেওয়া যায়, যেমন A house, of the house, in the house ইত্যাদি। কিন্তু বাঙলায় এমন সুযোগ নেই। কাজেই শব্দের গায়ে নির্দেশক অথবা বিভক্তি লাগানো অনিবার্য হয়ে পড়ে। তাই মনে হয়, আনুশাসনিক পর্বে অস্ফুট ব্যাকরণ-ধারণা বাঙলার ক্ষেত্রে অন্তত বাদ দেওয়া চলে না। দ্বিতীয়ত, যে-শব্দের অর্থ অপ্রচলিত অথবা দুরূহ এমন শব্দের প্রয়োগ অবশ্যই বর্জনীয়। পূর্ব-প্রচলিত ভাষাশিক্ষায় কিন্তু শব্দ ও অর্থের সংযোগ ছিলো না। তার উদ্দেশ্য ছিলো মূলত কিছু কিছু শক্ত বানানের দুরূহ শব্দ শেখানো যার অর্থ নাবালক শিশুর জ্ঞানের পরিধির বাইরে। তৃতীয়ত, স্মরণে রাখতে হবে, শব্দসম্পদ বাড়ানোর পক্ষে শিক্ষার ক্রমিক পর্ব আছে। কী

জাতীয় শব্দ ভাষাশিক্ষার কোন্ স্তরে শিক্ষা দিতে হবে তার মানদণ্ড পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা মোটামুটি স্থির করে দিয়েছেন। তার আলোচনায় এখন আমরা আসছি না।

পূর্বেই বলেছি, শিক্ষকের প্রাথমিক দায়িত্ব হলো, শিশুর জন্মলব্ধ ভাষাকে আদর্শ চলিত ভাষায় সুসংস্কৃত ও পরিমার্জিত করা। এই পরিমার্জন অবশ্যই অধ্যারোপ নয়। যাই হোক, এই চলতি আদর্শ আয়ত্তের পর অথবা একই সঙ্গে লেখ্য ভাষার কলা-কৌশল সম্বন্ধে শিশুকে সচেতন ক'রে তোলা দরকার। এর শিক্ষণপদ্ধতি সম্পর্কে অবশ্য মতপার্থক্য আছে। কেউ কেউ মনে করেন, শিশুর পরিমার্জিত মুখের ভাষা লিখিত রূপে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হওয়াই উচিত। কারোর মতে আবার চলতি ভাষার লেখ্য আদর্শ বিষয়ে গোড়া থেকেই শিশুকে অবহিত করার প্রয়োজন আছে, বিশেষত যেখানে লেখ্য আদর্শের বিশেষ প্রচলিত রীতিনীতি রয়েছে। বস্তুত, কথ্য আদর্শে এমন অনেক উপাদান রয়েছে, যা লিখিত আদর্শে স্বীকৃত নয়। উদাহরণস্বরূপ, বাঙলার কথ্য বাচনভঙ্গীতে পরোক্ষ ভাষণ অথবা কর্মবাচ্যক প্রয়োগ তেমন স্বাভাবিক নয়।

দ্বিতীয় দায়িত্ব শিক্ষকের পক্ষে রীতিমতো জটিল। বর্তমান বাঙলার লেখ্য আদর্শে এখনও দুটি রীতি প্রচলিত—(১) কথ্য রীতির লেখ্য আদর্শ এবং (২) সাধু রীতির আদর্শ। সাধুরীতির প্রয়োগ বহুলাংশে সংকুচিত হয়ে পড়লেও তার সাহিত্যিক ব্যবহার এখনও রয়ে গেছে, যেমন কিছু কিছু সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় রচনাগুলি এখনও সাধু রীতিতে রচিত হয়। মাধ্যমিক স্তরে পুরোনো সাহিত্য রচনাংশ পাঠ্য-সূচীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় সাধুভাষার জ্ঞান ছাত্রের পক্ষেও প্রাসঙ্গিক বিষয় হয়ে ওঠে। আমার মনে হয়; এইজাতীয় শিক্ষাক্রমে (সাধু আদর্শের Text এবং সাধু ভাষার চলিত গদ্যে রূপান্তর) বর্ণনমূলক পর্বের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। তাছাড়া চলিত আদর্শের মানদণ্ড কী তা এখনও প্রচলিত ব্যাকরণে স্পষ্ট নয়। তাই চলিত আদর্শের কিছু লক্ষণ নিচে উদাহৃত হলো—

১. সর্বনামের সংক্ষিপ্ত রূপ : তাহারা—তারা, ইহার—এর, কেহ—কেউ।

২. ক্রিয়াপদের সংক্ষিপ্তি : শুনিয়া—শুনে, যাইতে—যেতে, করিতেছিল—করছিল, শুনিয়াছে—শুনেছে, খাইতো—খেতো ইত্যাদি।

৩. বিশেষ অনুসর্গ : সহিত—সঙ্গে, ইহা অপেক্ষা—এর চেয়ে / থেকে, আমার দ্বারা, আমা কর্তৃক—আমাকে দিয়ে।

৪. যৌগিক ক্রিয়া স্থলে একক ক্রিয়া : গমন করিতে করিতে—যেতে যেতে, শ্রবণ করিল—শুনিল।

৫. বিশেষ চলিত ক্রিয়া ও শব্দ : যাইয়া—গিয়ে, কহিল—বললো, খুব, ভারি।

৬. অর্ধতৎসম ও তদ্ভব শব্দের যথাসম্ভব ধ্বন্যাত্মক বানান : অভ্যেস, সুবিধে, পুজো, ওপর, ভেতর, পুরোপুরি, জন্যে।

৭. প্রচলিত তৎসম শব্দ ও সমাসব্যবহার বর্জনের প্রয়োজন নেই।

তৃতীয়ত, এই প্রসঙ্গে স্বভাবতই মনে আসে, বাঙলা বানান বা যতি সম্পর্কীয় বিধানের কথা। ইংরেজী বা অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষার ক্ষেত্রে এ-বিষয়ে কোনো সমস্যা নেই। কারণ এক্ষেত্রে শিশুকে কোনো বিকল্প বা সমান্তরাল পদ্ধতির মুখোমুখি হ'তে হয় না। কিন্তু বাঙলার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সমস্যা রয়ে গেছে। যেমন, সংস্কৃত শব্দের বানানে উচ্চারণ মেলে না, আবার বাঙলা শব্দের উচ্চারণ বহুমুখী ব'লে বানানের যথেচ্ছাচার সমানে চলছে। সংস্কৃত শব্দের ক্ষেত্রে বানান-রীতি সুনির্দিষ্ট হলেও খাঁটি বাঙলার বানান-রীতি আজও স্থিরীকৃত নয়। তাই শিশুকে গোড়া থেকেই বিকল্প বানান নিয়ে সমস্যায় পড়তে হয়, যেমন—হল / হলো / হোলো / হ'ল ইত্যাদি অথবা গেল / গেলো / গ্যাল / গ্যালো ইত্যাদি। বাঙলা বানানের এই নৈরাজ্য দূরীকরণ করা একটি সামাজিক দায়িত্ব ব'লে গণ্য হওয়া উচিত।[৩]

যাই হোক, বর্তমানে অন্তত এই পর্বে শিশুদের ভ্রমাত্মক বানান নিয়ে শিক্ষকদের স্পর্শকাতর হওয়া কোনক্রমেই শোভনীয় নয়। কোনো নতুন শিক্ষার্থী যদি অঙ্কের সমাধান যথাযথভাবে করতে পারে, তবে পদ্ধতির সামান্য ভুলচুক যেমন ধর্তব্যের মধ্যে নয়, ভাষার ব্যাপারেও তেমন সহনশীলতা অন্তত প্রাথমিক পর্বে থাকা উচিত। কারণ, সেখানে ভাষিক দক্ষতা যখন প্রমাণিত তখন প্রকাশমাধ্যমের অপূর্ণতা নিয়ে অতিরিক্ত আগ্রহের প্রয়োজনীয়তা দেখি না।

২. বর্ণনমূলক পর্ব (Descriptive Level)

Prescriptive বা বিধানসর্বস্ব শিক্ষণপর্বের পর বর্ণনমূলক বা Descriptive শিক্ষণ-পর্বের শুরু। এই শিক্ষাপর্বের গোড়াতেই আমরা ধ'রে নেবো, শিক্ষার্থী বাঙলা লেখা বা পড়ার প্রারম্ভিক স্তর পেরিয়ে এসেছে। বাঙলা বর্ণ এবং ধ্বনিমালা বা কিছু প্রয়োজনীয় শব্দসম্পদ সে ইতিমধ্যে আহরণ করতে পেরেছে—যদিও সে ভাষার সার্বিক সংগঠন বা অন্তর্নিহিত সৃজনী শক্তি সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেনি। এই পর্বেও প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করবে তার মাতৃভাষা বাঙলা, কারণ সেই ভাষা তার সবচেয়ে বেশি পরিচিত। আর এই ভাষার মাধ্যমেই তাকে গ'ড়ে তুলতে হবে এমনভাবে যাতে সে ভাষা সম্পর্কে একটা নৈর্ব্যক্তিক বা সার্বজনীন ধারণা তৈরি ক'রে নিতে পারে, অথবা দ্বিতীয় বা তৃতীয় ভাষা হিসেবে অপর কোনো দেশী বা বিদেশী ভাষা শিখে নিতে সে কোনো অসুবিধের সম্মুখীন না হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের পাঠ্যসূচী এমনভাবে পরিকল্পিত হয়ে থাকে যাতে মনে হয়, ভাষা সম্পর্কে কিছু ব্যাকরণিক অভিজ্ঞতা বা কিছু বর্ণনাত্মক বিবরণ অবিগত করতে পারলেই শিক্ষার্থী ভাষাশিক্ষায় স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করবে। এতে এমন ধারণা গ'ড়ে তোলা হয় যাতে মনে হতে পারে, ভাষা শিক্ষা করতে করতেই শিক্ষার্থী তার মাতৃভাষায় দক্ষতা অর্জন করতে পারবে অথবা সে ভাষা সম্পর্কে নিজেই একটি নৈর্ব্যক্তিক ধারণা গ'ড়ে তুলতে সক্ষম

হবে। এ-ধারণা পোষণ করার অর্থ হলো এই মনে করা যে, কোনো অ
অল্পশিক্ষিত মানুষ কেবল ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে করতেই ি
প্রশাসনিক নিয়মকানুন বা রাষ্ট্রীয় সংবিধান শিখে নিতে পারবে। তার
শিক্ষা অর্জন করার আর প্রয়োজন নেই।

কিন্তু 'নিজের ভাষা নিজে শেখ'—এই নীতি-সর্বস্ব আবেদন কি চ
প্রযোজ্য হতে পারে ? কোনো শিক্ষাক্রমের আবশ্যিক তাৎপর্য যদি হয়
প্রতিবেশ, তার সমাজ বা দৈনন্দিন ঘটনার তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতা সম্
ক'রে তোলা, সাদা কথায়, তার জ্ঞানার্জনকে জীবনমুখী বা প্রতিবেশ-কা
তোলা, তবে ভাষাশিক্ষাই বা তার ব্যতিক্রম হবে কেন ? যে-তাগিদে
বালক ঘড়ির কলকব্জা সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠে, অথবা ক্যামেরার ক
করতে উন্মুখ হয়ে ওঠে স্বতই, ঠিক সেই তাগিদেই তো সে তার নিজের
কৌতূহলী হয়ে উঠবে। এইটেই তো স্বাভাবিক ব'লে মনে হয়। ষ
শিক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব কেবল শিক্ষার্থীর কৌতূহলের ওপরই ছেড়ে দে
তাকে অবশ্যই একটা বিশেষ ঘরানার নির্দিষ্ট বাঁধা পথে এগিয়ে
ভাষাশিক্ষা এমনই একটি স্বতন্ত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ পদ্ধতি, যে পদ্ধতি কোনো
বিজ্ঞান, চিকিৎসা বা মানবিকী বিদ্যার পারংগমতার বাহনমাত্র নয়
অধীতব্য ভাষাবিদ্যার মূল চাবিকাঠিই হলো তার মাতৃভাষা। এ
সাহায্যেই তাকে ভাষার সক্রিয় ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন হতে হবে,
ভাষার সাহায্যে নয়। কোনো ডলার বা পাউণ্ড নয়, টাকার মূল্যমানে
নিতে হবে তার দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা।

মাতৃভাষার এই কেন্দ্রীয় ভূমিকার তাৎপর্য আগের যুগের বৈয়
উঠতে পারেন নি। তাই ইংরেজী অথবা সংস্কৃত ভাষার মতো অপ
দূরবর্তী বা সনাতনী ভাষার ছকে তাঁরা বাঙলা ভাষার ব্যাকরণকে বাঁধে
উদাহরণস্বরূপ, বাঙলা ব্যাকরণে সর্বনামের সংজ্ঞা নির্ণীত হয়েছে এইভা
পরিবর্তে যা বসে তাই সর্বনাম। বলাবাহুল্য, এ হলো ইংরেজী ব্যাক
সংজ্ঞা। অপরদিকে সংস্কৃত ব্যাকরণ থেকে 'সর্বনাম' অভিধা গ্রহণ করা
প্রকৃত সংজ্ঞা গ্রহণ করা হয় নি। সংস্কৃতে সর্বনাম একটা Formal C
রূপগত শ্রেণী। তাই যে যে শব্দের রূপ 'সর্ব' শব্দের ন্যায়, সেইগু
এরূপ বহুক্ষেত্রেই প্রচলিত বাঙলা ব্যাকরণে অজস্র জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে

বস্তুত, সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুযায়ী বাঙলা ব্যাকরণ রচিত হতে পারে
প্রথম এবং প্রধান কারণই হলো, সংস্কৃত বর্তমানে অন্তত কোনো মৌখি
ইংরেজী ভাষার পূর্ব-প্রচলিত ব্যাকরণ-পদ্ধতিও আমাদের গ্রহণীয় নয়,
ব্যাকরণ কাঠামোও গড়ে উঠেছে প্রাচীন ল্যাটিনকে আশ্রয় ক'রে।
ভাষাগুলি সম্পর্কে আমাদের ভাষিক জ্ঞান কেবল ত্রুটিপূর্ণ নয়, তার
মৌল অবয়ব আমাদের কাছে অস্পষ্ট এবং অসম্পূর্ণও বটে।

সুতরাং বাঙলা ভাষা শিক্ষণের পক্ষে আধুনিক Descriptive বা বর্ণনমূলক ভাষা-বিজ্ঞানের সহায়তা নিতেই হবে। কারণ বর্ণনমূলক পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে সেই আদর্শকেই সামনে রেখে যে-আদর্শে একটি ভাষাকে অন্য ভাষার ছাঁচে ঢালাই না ক'রে তার নিজস্ব সাংগঠনিক অবয়বে মূর্ত করা যায়। এ-বিষয়ে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানীরা আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করতে পারেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাঙলা ভাষায় এমন ধরণের পূর্ণাঙ্গ প্রকাশিত বিবরণ আজও আমরা পাইনি।

প্রসঙ্গক্রমে ব'লে রাখা দরকার, বর্ণনাত্মক শিক্ষণপদ্ধতি প্রবর্তনের অর্থ এই নয় যে বর্ণনমূলক ভাষাতত্ত্ব অবিলম্বে স্কুলশিক্ষায় পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এমনও নয় যে রাতারাতি প্রচলিত ব্যাকরণের পরিভাষাগুলি ব'দলে ফেলতে হবে অথবা শিক্ষককে আবার নতুন ক'রে ভাষাতত্ত্ব শিখে নিতে হবে। শিক্ষক কীভাবে শিক্ষা দেবেন, সে-পথ বাতলে দেওয়াও এর লক্ষ্য নয়। কারণ, কে না জানে, Linguistics is a Science, Teaching is an Art। ভাষিক তত্ত্ব নয়, আসল উদ্দেশ্য হলো ফলিত পদ্ধতি; বর্ণনমূলক ভাষাবিজ্ঞান নয়, বরং ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি। মনে রাখা দরকার, ভাষাশিক্ষণের ক্ষেত্রে ভাষিক উপাদানের নির্বাচন (Selection), প্রয়োগ-বিন্যাস (Ordering) বা বিষয়-উপস্থাপনা (Presentation of contents) ইত্যাদি বিষয় কেবল ভাষিক তত্ত্বের দ্বারা নির্ধারণ করা যায় না। এমনক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা কেবল শিক্ষক হিসেবেই, ভাষাতাত্ত্বিক হিসেবে নয়।

উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটিকে স্পষ্ট ক'রে তোলা দরকার। বাঙলা বিশেষণ পদের চিরাচরিত সংজ্ঞা হলো—'যে শব্দের দ্বারা নামের বা অন্য কোনো বিশেষণের গুণ, ধর্ম বা বা অবস্থা বিষয়ে বিশিষ্টতা প্রকাশ পায় তাকে বলে বিশেষণ।' বলাবাহুল্য, প্রচলিত ব্যাকরণ-অনুসারী এ-সংজ্ঞা পুরোপুরি একটি অর্থকেন্দ্রিক ধারণামাত্র। এমন একটি সংজ্ঞার দ্বারা বাঙলা বিশেষণের সামগ্রিক চিত্র ধরা পড়ে না। বর্ণনমূলক পদ্ধতিতে বিশেষণ নির্ণয়ের জন্য আশ্রয় নিতে হয় সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের একটি পদ্ধতি যাকে বলা হয় 'বণ্টন' (Distribution)। শুদ্ধ বাক্যের যে-সমস্ত পরিবেশে (Context) কোনো একটি ভাষাবস্তু ব্যবহৃত হতে পারে, সে-সমস্ত পরিবেশের সমষ্টি হচ্ছে ঐ ভাষাবস্তুর 'বণ্টন'। 'বণ্টন' নির্ণয়ের জন্য সাহায্য নেওয়া হয় 'পরিবর্ত' (Substitution) প্রণালীর। এই উভয় পদ্ধতির সাহায্যে বিশেষণ পদকে আমরা কতকগুলি রূপগত বা সংগঠনগত শ্রেণী বা উপশ্রেণীতে বিভক্ত করতে পারি, যে শ্রেণী-বিভাগে আর্থ ভূমিকার চেয়ে আচরণগত ভূমিকার প্রাধান্য বেশি। আধুনিক পরিভাষায় এইজাতীয় বিশেষণ হলো গঠক শ্রেণী (Form Class)।

যাই হোক, বাঙলা বিশেষণ পদনির্ণয়ে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের পারিভাষিক জ্ঞান যদি না-ও থাকে, তবু কোনো প্রকৃত শিক্ষক কেবল ব্যবহারিক প্রয়োগ দেখেই, বিশেষণের ভূমিকা আবিষ্কার করতে পারেন। যদি তিনি তাঁর মাতৃভাষা সম্পর্কে যথার্থই সচেতন হন, তাহলে তিনি বাঙলা বিশেষণ পদগুলির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই লক্ষ্য করবেন :

১. বিশেষণ পদ, সাক্ষাৎ বিশেষণ (Attributive) এবং বিধেয় বিশেষণ (Predicative) হিসেবে ব্যবহারের যোগ্য, যদি নামপদটি হয় অনির্দিষ্ট, যেমন—অবধারিত মৃত্যু / মৃত্যু অবধারিত, অকল্পনীয় অবস্থা / অবস্থা অকল্পনীয়, ভ্রষ্ট লগ্ন / লগ্নভ্রষ্ট। ইংরেজীতেও এমন বৈশিষ্ট্য সুলভ, যেমন The little boy/The boy is little. বলা বাহুল্য, আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে বিশেষণ-বিচার এই মানদণ্ডেই গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

২. বিশেষণের বিধেয় প্রয়োগ হলে পূর্বে বিশেষ্যটি নির্দেশকের দ্বারা চিহ্নিত হয়, যেমন—পুরোনো হাঁড়ি / হাঁড়িটি পুরোনো, ভদ্র ছেলে / ছেলেটি ভদ্র।

৩. খাঁটি বাঙলা বিশেষণ Paradigmatic Class-এর অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই এর সঙ্গে বহুবচন-প্রত্যয়, কারক-বিভক্তি বা নির্দেশক যুক্ত হয় না (তু. ইংরেজী Weaker : Weakest, সংস্কৃত দুর্বলতর : দুর্বলতম ইত্যাদি)।

৪. বিশেষণ পদ সম্প্রসারণধর্মী, যেমন—নিরীহ লোক / অতিনিরীহ লোক, পুরোনো হাঁড়ি / বড় পুরোনো হাঁড়ি / বড় পুরোনো পাঁচসেরী হাঁড়ি, কুড়িয়ে-পাওয়া ছেলে, খেটে-খাওয়া মানুষ, কালি-মাখানো জামা, তেলে-জলে মানুষ, জীবন যে-রকম।

৫. সর্বদাই সাক্ষাৎ-বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত কিছু বিশেষণ পদ, যেমন—উড়াল পুল, কাঁদানে গ্যাস, লড়াকু জওয়ান, উড়ন্ তুবড়ি, চলতি বছর, আসছে বছর, গেল বছর ইত্যাদি।

৬. কেবল বিধেয় বিশেষণ রূপে প্রযুক্ত কিছু বিশেষণের সীমিত প্রয়োগ, যেমন—দেখলাম, ছেলেটি তখনও দাঁড়িয়ে, ভাত বাড়ন্ত।

৭. কতকক্ষেত্রে বিশেষণের বিপ্রতীপ অবস্থান অর্থান্তর ঘটায়, যেমন—কাটা দাগ / দাগ কাটা, রাঁধা ভাত / ভাত রাঁধা, পাগল মেয়ে / মেয়ে পাগল।

৮. সম্বন্ধপদস্থানীয় নাম বা সর্বনামও বিশেষণ পদবাচ্য, যেমন—সোনার থালা / থালাটি সোনার, আমার ছেলেটি / ছেলেটি আমার।

৯. বিশেষ্যও বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে, যেমন—বাঙলা ভাষা / আমাদের ভাষা বাঙলা, ফুলদি, মামণি, লক্ষ্মী পেঁচা / মেয়ে, কদম ছাঁট ইত্যাদি।

১০. অনুরূপভাবে বিশেষণও বিশেষ্য হিসেবে ব্যবহারযোগ্য, যেমন, বড়র পীরিতি, বড়টির, ছোটটির, বড়রা।

১১. কখনও কখনও একই পদ বিশেষ্য ও বিশেষণ হিসেবে প্রযুক্ত হতে পারে, যেমন—টাকার গরম / গরম জল, পাপ এ-জীবন / জীবনের পাপ, সত্য কথা / চির সত্য, ভুল তথ্য / আমার ভুল ইত্যাদি।

১২. পূরণবাচক সংখ্যা শব্দ বাঙলায় বিশেষণ, যেমন—অদ্বিতীয় প্রেম / প্রেম অদ্বিতীয়, প্রথম ছেলে / ছেলেটি প্রথম; কিন্তু বিশুদ্ধ সংখ্যাবাচক শব্দগুলি বাঙলায় সমানাধিকরণ বিশেষ্য (Noun in apposition) যথা—পাঁচ হাতের, হাতের পাঁচ, পাঁচটি ছেলে, পাঁচে মিলি করি কাজ, পাঁচটা বাজে, একের বোঝা ইত্যাদি। নির্দেশক সর্বনামও বাঙলায় বিশেষণ নয়, যথা—সেই ছেলে, যে-বালক।

উপরোক্ত কিছু উপাত্ত থেকে এতক্ষণে নিশ্চয়ই বোঝা গেছে যে, প্রথমত, বিশেষ্য-বিশেষণ-সর্বনাম-সংখ্যাশব্দ ইত্যাদি রূপে চিহ্নিত শব্দের তথাকথিত আর্থ বিভাগ এখানে অচল। দ্বিতীয়ত, বিশেষণের ব্যবহারিক প্রয়োগে আর্থ মানদণ্ড গৃহীত হলেও তার ভূমিকা এখানে পরোক্ষ অথবা গৌণ। শব্দার্থ সেখানে সিদ্ধ লক্ষ্যবস্তু নয়, তা একটি সাধ্য উপায়মাত্র। সুতরাং এ-বিষয়ে ব্যাকরণশিক্ষকের দায়িত্ব কী, হবে, তা একটি উদ্ধৃতি দিয়েই স্পষ্ট করা যাক্: "What a grammarian is—or ought to be—interested in is not meaning directly but the structure through which meaning is expressed, the mechanism by which meanings are distinguished. Every teacher of grammar must deal with structure and is therefore in some sense a structural linguist" (Paul Roberts).

এই প্রসঙ্গে শিক্ষকের আর একটি বড়ো দায়িত্ব উল্লেখ করার মতো। কেবল ভাষার সাংগঠনিক অবয়ব নির্মাণ নয়, শিক্ষার্থীর শব্দভাণ্ডার গ'ড়ে তুলতেও শিক্ষক তাঁর স্বাভাবিক অন্তর্জ্ঞানকে কাজে লাগাতে পারেন, অবশ্য যদি তিনি ভাষাতত্ত্বের সাধারণ কিছু প্রবণতা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকেন। কোনো বহির্দৃশ্য ঘটনার (যেমন, বাজার করা, পোষ্ট অফিসে যাওয়া ইত্যাদি) পরিস্থিতি সৃষ্টি ক'রে, কুইজ বা ধাঁধা অথবা শব্দগঠন খেলার ছলে ইত্যাদি যে-ভাবেই হোক, তিনি শিক্ষাদান করতে পারেন, যদি তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য হয় ভাষার উপাদান সম্পর্কে ছাত্রকে সচেতন বা সজাগ ক'রে তোলা। তিনি আরো যা পারেন তা হলো: ক্লাসে সমজাতীয় শব্দভাণ্ডার গ'ড়ে তোলার প্রেরণা জোগানো (যেমন, পুস্তক, পুস্তিকা, পুঁথি, গ্রন্থ, বই); বা একই মানস ধারণার বিভিন্ন Shade তৈরি করা (যেমন টক্‌টকে লাল, টুকটুকে লাল, রগ্‌রগে লাল) অথবা সমার্থক বা বিপ্রতীপ শব্দের জোড় সৃষ্টি করা (উদ্যান / বাগান / বাগিচা, আসা-যাওয়া, ভারি-হালকা)। মোট কথা, এসমস্ত প্রক্রিয়া শিক্ষকের ভাষিক এবং ভাষাতাত্ত্বিক জ্ঞানের জারক রসে উদ্দীপিত হওয়া প্রয়োজন।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, ভাষাশিক্ষক এবং ভাষাবিজ্ঞানী—এই দুইয়ের মধ্যে সংযোগ ঘটবে কী ক'রে। শিক্ষার ক্ষেত্রে তাত্ত্বিকের যেমন প্রয়োজন, তেমন প্রয়োজন অবশ্যই কুশলী কারিগরের। শিক্ষাবিজ্ঞান যদি হয় একটি সচল মুদ্রা, তবে তার একপিঠে যেমন রয়েছে জটিল আঙ্গিক তত্ত্ব, অপরদিকে তেমন ব্যবহারিক মূল্যবোধ। কিন্তু একজনের পক্ষে এই বিশুদ্ধ এবং ফলিত জ্ঞানের দ্বৈধ বিষয়ে সমানভাবে পারদর্শী হওয়া প্রায় অসম্ভব বললেই চলে। এই বৈষম্যের অবসান ঘটে যদি এ-ব্যাপারে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায়। কোনো সুপ্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যদি মাঝে মাঝে Seminar, Symposium ইত্যাদির ব্যবস্থা করা যায় তবে এই উৎপাদন ও বণ্টনের সাম্য ঘটতে পারে। বিদেশে এ-ব্যাপারটি অবশ্য নতুন নয়। এখানে এখনও তা অনর্থক পয়সা খরচ।

পূর্ব প্রসঙ্গের সূত্র ধ'রে বলি, বর্ণনামূলক ভাষিক পদ্ধতি হলো ভাষাবিজ্ঞানের ফলিত দিক। কাজেই ভাষাবিজ্ঞানের একটি সামগ্রিক চিত্র উদ্‌ঘাটিত হওয়া দরকার।

আর তার জন্য প্রয়োজন একটি বিশেষ সিঁড়িভাঙা পাঠ্যসূচী, যার স্তরবিন্যাস করা হবে এইভাবে : (১) পাঠক্রমের উচ্চ স্তরে রয়েছে ভাষাবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক দিগ্‌দর্শন। (২) দ্বিতীয় স্তরে এই তত্ত্বের আলোকে একটি বিশেষ ভাষা বর্ণিত হবে বর্ণনমূলক পদ্ধতির সাহায্যে। (৩) পরবর্তী স্তরে ভাষার প্রকৃত শিক্ষক যাঁরা তাঁদের উপযোগী কিছু বিশেষজ্ঞের লেখা প্রবন্ধসংকলন, যাতে ভাষার বিভিন্ন দিকের ওপর আলোকপাত করা হবে। বস্তুত, এ-রচনাগুলি হবে একাধারে বর্ণনমূলক এবং ব্যাখানমূলক। (৪) চতুর্থ দায়িত্ব হবে ছাত্রোপযোগী কিছু পাঠ্যপুস্তক রচনা এবং (৫) পরিশেষে ক্লাসের পক্ষে উপযোগী এবং শিক্ষণপ্রণালী সম্পর্কিত কিছু খুঁটিনাটি বিষয়বস্তু—যার থেকে শিক্ষকেরা উপযুক্ত উদাহরণ এবং শিক্ষণনির্দেশ বুঝে নিতে পারবেন।

উপরোক্ত Programme অনুসরণ করার সময় স্মরণে রাখতে হবে : প্রথমত, এই পাঠক্রমের মধ্যে যেন একটি সার্বিক ঐক্য এবং সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন স্তরের রূপায়ণে আন্তঃস্তরীয় সম্পর্কের পুনর্মূল্যায়নের অবকাশ যেন বজায় থাকে। কেবল তাত্ত্বিক জ্ঞানই যথেষ্ট নয়, একজন শিক্ষক তাঁর দীর্ঘ শিক্ষক-জীবনেব সূত্রে যে-অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, তাঁর ভাষাসম্পর্কীয় সেই ধ্যানধারণাও তাত্ত্বিক মূল্যায়নের জন্য অপরিহার্য—এ-কথা মনে রাখা দরকার। তৃতীয়ত, এ-কথাও মেনে নিতে হবে যে যদিও একজন ভাষাশিক্ষকের পক্ষে ভাষাবিজ্ঞানের মতো এক বিশাল বিষয়ের সমস্ত বিভাগগুলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া সম্ভব নয়, তথাপি এ-বিষয়ে যাঁর জ্ঞানের পরিধি যত বেশি সম্প্রসারিত, তিনি তত বেশি ছাত্রদের পক্ষে উপযোগী এবং আদর্শস্থানীয় শিক্ষক হয়ে উঠবেন। বলাবাহুল্য, ভাষাশিক্ষার ব্যাপারে এই আদান-প্রদানের ভার বহন করতে পারে সুপরিকল্পিত প্রতিষ্ঠানসমূহই।

৩. সৃজনশীল পর্ব (Productive Level)

বর্ণনমূলক শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি হয় ভাষার ক্রিয়াশীল ভূমিকা এবং তার অন্তরঙ্গ প্রণালীর ব্যাখ্যা, তবে সৃজনী বা Productive শিক্ষার উপজীব্য হবে সেই কার্যকরী ভাষাজ্ঞানের সম্প্রসারণ ঘটানো। সৃজনী শিক্ষাব্যবস্থায় আনুশাসনিক উদ্যোগ নিয়ে ভাষার ছাঁচ বদলের চেষ্টা করা হয় না, বরং তার অর্জিত সাংগঠনিক কাঠামোয় নানা অভিজ্ঞতা ও সম্পদের রঙ চড়ানো হয়। এর ফলে শিক্ষার্থী বিভিন্ন পরিবেশে ভাষার ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্পর্কে যেমন অভিজ্ঞ হয়ে ওঠে, তেমন ভাষার অন্তর্লীন শক্তির প্রসারণশীল সত্তা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। পূর্ব-অধীত ভাষাজ্ঞান (বিশেষত শব্দসম্পদ ও ব্যাকরণ), জীবন সম্পর্কে সর্বব্যাপী কৌতূহল এবং স্কুলবহির্ভূত বিচিত্র অভিজ্ঞতার বড় রকমের আমানত তার সঞ্চয়ে থাকে ব'লে সে ব্যাকরণক্লাশের সুনির্দিষ্ট গণ্ডীতে ভাষার স্বল্প সঞ্চয়ের অধিকার নিয়ে আর সন্তুষ্ট থাকতে পারে না।

সুতরাং এমন ছাত্রের উপযোগী করেই ভাষাশিক্ষার পাঠ্যসূচী গড়ে তুলতে হবে। ভাষার বিশেষ বিশেষ সংকীর্ণ প্রয়োগবিধি (Restricted use), প্রসঙ্গ, পরিস্থিতি,

পারিভাষিক বিষয় অথবা বিশেষ বস্তু ও প্রণালীগত পদ্ধতি (Item and Pattern) সম্পর্কে তাকে অবহতি ক'রে তুলতে হবে। অবশ্য এ-সব আয়োজনেরই মূল উদ্দেশ্য ভাষাপ্রয়োগের আর্থ ও সামাজিক দিকগুলিকে তুলে ধরা। সাংগঠনিক পদ্ধতিতে যেমন ভাষার অর্থনিরপেক্ষ অন্তর্নিহিত উপাদানগুলির ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল, এখন সেই ভাষিক বস্তুগুলিকে আনতে হবে আর্থ নিয়ন্ত্রণে। প্রযুক্তি নয়, প্রয়োগ (Register); আদর্শ (Model) আবিষ্কার নয়, বৈচিত্র্যমুখী ব্যবহার; অধীত উপাদানের সংকলন বা সনাক্তকরণ নয়, উচ্চতর সৃজন—এই হবে এই পর্বভুক্ত পাঠ্যের ক্রম।

উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটিকে স্পষ্ট করা যাক। প্রসঙ্গ 'গরু' সম্পর্কীয় রচনা। আনুশাসনিক পর্বে 'গরু' সম্পর্কে রচনা লিখতে গিয়ে শিক্ষার্থী কয়েকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সরল বাক্যই কেবল রচনা করতে সক্ষম হবে, যেমন—গরু উপকারী জন্তু। গরু দুধ দেয়। কালো গরু দুধ দেয় বেশি। ইত্যাদি। দ্বিতীয় পর্বের ছাত্র এই বাক্যগুলির সংগঠনপ্রণালী সম্পর্কেই কেবল সচেতন হবে না, সে বাক্যগুলিকে বিশেষ পদ্ধতির সাহায্যে যুক্ত করতে শিখবে—সংযোজকের সাহায্যে অথবা আশ্রিত বাক্যান্বয়ে, এমনকি প্রয়োজনমতো কর্মবাচ্য গঠন মাধ্যমে। কিন্তু তবু বিভিন্ন ছাত্রের রচনা বিচার করলে দেখা যাবে, কিছু নতুন শব্দের বৈচিত্র্য-সৃষ্টি অথবা ব্যাকরণগত যোগ্যতার পার্থক্য সত্ত্বেও সকলের রচনা মোটামুটি একই ধরনের। কিন্তু তৃতীয় পর্বে ছাত্রের সৃজনী ক্ষমতা এবং সেই সঙ্গে অর্জিত অভিজ্ঞতার পুঁজি স্ফীত হওয়ার ফলে তাদের বিভিন্ন রচনাগুলি স্বতন্ত্র সৃষ্টিকর্ম ব'লে প্রতিভাত হবে। সৃজনশীলতার নিরিখে এই-জাতীয় রচনাগুলি সাধারণত Composition নামে অভিহিত হয়ে থাকে, কিন্তু প্রাচীন পদ্ধতির দোষ অন্তত বাঙলার ক্ষেত্রে হলো এই যে পূর্বে এগুলিকে ভাষার সাধু আদর্শে রূপান্তরিত করা হতো (তাই গুরুচণ্ডালী দোষ একেবারেই বরদাস্ত করা হতো না)। দ্বিতীয়ত, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই রচনাগুলিকে সাহিত্যিক মূল্যবোধের তৌলদণ্ডে বিচার করা হতো—মনে করা হতো যেন Literary Essay রচনাই ছাত্রদের একমাত্র লক্ষ্য এবং কাম্য। তৃতীয়ত, রচনার বিষয়বস্তু জীবনের বৈচিত্র্যকে তুলে ধরতো না, তাই বিভিন্ন ধরনের রচনাগুলিকে যেন একই ছাঁচে ঢালাইয়ের প্রচেষ্টা দেখা যেতো।

কিন্তু বোঝা উচিত, জীবনের বহুমুখী প্রয়োজনগুলিকেও রচনাশিক্ষার আধেয় ক'রে গ'ড়ে তোলা দরকার। একজন ছাত্রের পক্ষে যেমন নিরংকুশ সাহিত্যধর্মী রচনার প্রয়োজন আছে, তেমন আছে বিভিন্ন বৃত্তি, প্রয়োজন বা প্রাত্যহিক পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার মতো ভাষানির্মাণ-ক্ষমতা অথবা পারিভাষিক জ্ঞান অর্জনের। যাঁরা ভবিষ্যতে এঞ্জিনিয়র, ডাক্তার, পরিবহনকর্মী, নার্স অথবা শিল্পশ্রমিক হবেন, ভাষিক ক্ষমতা অর্জন করার ভার তাঁদের নিজেদের ওপর ছেড়ে দেওয়া চলে না। আর এই ভুলটি গোড়া থেকে শিক্ষণীয় ক'রে তোলা হয়েছিল বলেই আমরা রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যতত্ত্ব বুঝতে পারলেও ইন্‌কাম্ ট্যাক্সের নিয়মাবলী প'ড়ে বুঝতে গিয়ে সাত

বাঁও জলে পড়ি। ঠিক একই কারণে একজন বিজ্ঞানের ছাত্র মনে করেন তার বাঙলা ভাষা না জানলেও চলে, কারণ তা হলো Arts বা Humanities-এর অধীতব্য বিষয়। অথবা একজন উচ্চশিক্ষিত বিজ্ঞানের অধ্যাপক সগর্বে ঘোষণা করেন : বাঙলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা অযথা কালক্ষেপ। বাঙলা ভাষায় বিজ্ঞান, আইন বা চিকিৎসা সংক্রান্ত রচনার বর্তমান অপ্রতুলতা এই অসম্পূর্ণ বা প্রমাদযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার দীর্ঘমেয়াদী ফল। কারণ কে না জানে, মাতৃভাষা সম্পূর্ণ আয়ত্ত না হলে কোনো নতুন সৃষ্টি কখনই সম্ভব নয়।

সৃজনশীল শিক্ষাপদ্ধতি সাহিত্য-আস্বাদনের ক্ষেত্রেও এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। আমরা এখানে ভাষাতত্ত্ব-নির্দেশিত শৈলীবিজ্ঞানের (Stylistics) কথাই বলতে চাইছি। এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার মধ্যে না গিয়ে শুধু এইটুকু উল্লেখ করি : এ এমন এক ভাষাতাত্ত্বিক পদ্ধতি যা সাহিত্যসমালোচকের অন্তর্জ্ঞান বা ব্যক্তিগত রসাস্বাদনের ক্ষমতায় বিশ্বাস রাখে না। এ-পদ্ধতিতে সাহিত্যিক সমালোচনা নয়, বরং সাহিত্যিক বিশ্লেষণ হলো গোড়ার কথা। বস্তুত, কোনো বিশিষ্ট সাহিত্যিকের এক বা একাধিক সাহিত্যকর্মকে চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হয় এখানে শারীর বিজ্ঞানীর মতো। কেবল লেখকের সৃষ্ট রচনাদর্শই নয়, লেখকের ব্যক্তিসত্তা এবং একটি বিশেষ যুগের ভাব-পরিমণ্ডলও শৈলীবিজ্ঞানীর উপজীব্য হয়ে ওঠে। রচনার ভাষিক উপাদান, বাক্যবিন্যাস অথবা রূপগত সংগঠনের সার্থক উপস্থাপনার দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে সমালোচক লেখককে সেই যুগের পটভূমিতে এমনভাবে তুলে ধরেন যাতে লেখক স্বতই স্বয়ংপ্রভ হয়ে ওঠেন। বলা বাহুল্য, শিল্পী, শিল্পকর্ম এবং যৌথ যুগমানসিকতার ত্রয়ী অনুষঙ্গ রচনা করাই শৈলীবিজ্ঞানীর যথার্থ কাজ। সৃজনশীল শিক্ষাপর্বে বস্তুনিষ্ঠ নৈর্ব্যক্তিক এই বিচার-বিশ্লেষণ পদ্ধতি সম্পর্কেও শিক্ষার্থীকে সজাগ ক'রে তোলা দরকার।

পরিশেষে আর একটি বিষয় উল্লেখ্য। দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে কোনো বিদেশী বা দেশী ভাষার শিক্ষা কোন্ স্তর থেকে সূচিত হওয়ার যোগ্য তা অবিলম্বে নিরূপিত হওয়া উচিত। পূর্ব আলোচনা থেকে নিশ্চয়ই স্পষ্ট হয়েছে যে মাতৃভাষার সাংগঠনিক স্তর শিক্ষার্থীর পক্ষে সহজসাধ্য হয়ে উঠলে তবেই সে-অধিকার পাওয়া যাবে। কারণ মাতৃভাষার কার্যশীল ভূমিকা ও সংগঠনতন্ত্র সম্পর্কে সুনিশ্চিত হলেই শিক্ষার্থী মাতৃভাষার কলাকৌশল অন্য ভাষার শিক্ষায় প্রয়োগ করতে শিখবে; আর সে শিক্ষা অবশ্যই সার্থক হয়ে উঠবে তুলনামূলক পদ্ধতির মাধ্যমে। দ্বিতীয় ভাষা সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান, যেমন, বর্ণশিক্ষা, উচ্চারণ বা শব্দসম্পদ ইত্যাদি অবশ্য আনুশাসনিক পর্বের শেষ ধাপে শুরু করা যেতে পারে, যাতে শিক্ষার্থী ধীরে ধীরে অপর ভাষার গঠনতত্ত্ব সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠে।

সুতরাং মাতৃভাষা শিক্ষার ব্যাপারে চারটি উদ্দেশ্যকে প্রাথমিক এবং মৌলিক ব'লে ধরা যেতে পারে :

(১) শিক্ষাগত (Educational) স্বাধিকার লাভ—সেই শিক্ষা যাতে প্রত্যেকে

অন্তত তার নিজের মাতৃভাষার অন্তর্নিহিত শক্তির উৎস খুঁজে পায়, তার মাতৃভাষার কার্যকরী প্রক্রিয়াগুলি ধীরে ধীরে বুঝে নিতে পারে।

(২) সেই উদ্দেশ্য যার দ্বারা বাস্তব ও প্রাত্যহিক বিষয় সম্পর্কিত প্রত্যক্ষ জ্ঞান মাতৃভাষার দ্বারা সরাসরি যুক্ত হয়।

(৩) মাতৃভাষা ছাড়াও অপর ভাষা শিক্ষালাভের যোগ্যতা অর্জন এবং

(৪) ভাষিক এবং ভাষাতাত্ত্বিক জ্ঞানের আলোকে শিক্ষার্থী তার মাতৃভাষায় রচিত সাহিত্যকর্মের রসাস্বাদন করতে সক্ষম হয়।

---

১. মজুমদার: বর্তমান বাংলাভাষার গতিপ্রকৃতি (চিন্ময়ী বঙ্গভূমি, রানা বসু সম্পাদিত, কলিকাতা, বাং ১৩৮০)

২. Halliday, Mcintosh & Stevens: The Linguistic Science and Language Teaching, ELBS, 1975

S. Pit Corder: Introducing Applied Linguistics, Penguin, 1973

D. A. Wilkins: Linguistics in Language Teaching, 1974

H. B. Allen (Edited): Readings in Applied English Linguistics, 1976

Nelson Brooks: Language and Language Learning, 1960

৩. পরেশচন্দ্র মজুমদার: বাঙলা বানানবিধি (কলিকাতা, ১৯৮২)

কালিদাস ও কৃত্তিবাস

নরেশচন্দ্র জানা

[বটতলায় মুদ্রিত ও বর্তমানে প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের উপর ভিত্তি করে এই প্রবন্ধ রচিত। শ্রদ্ধেয় হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ'-এর পাঠ এতে গৃহীত হয়েছে।]

আদিকবি বাল্মীকির পরে সংস্কৃত ভাষায় 'রাম-কথা' লিখে যাঁরা কীর্তিত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কালিদাস নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। 'রাম-কথা' অবলম্বনে রচিত তাঁর 'রঘুবংশ' অনন্যসাধারণ কাব্য। বাংলা ভাষায় রামায়ণ-কাহিনী লিখে যাঁরা প্রথিত হয়েছেন, কবি কৃত্তিবাস তাঁদের অগ্রগণ্য। আদিকবি বাল্মীকির রচনা প্রধানত অনুসৃত হলেও তাঁর কাব্যে অন্যান্য কবির রাম-কাহিনীর ছায়াপাত লক্ষণীয়। কালিদাসের অমর কাব্য 'রঘুবংশের' সুস্পষ্ট প্রতিফলন তাঁর কাব্যে লক্ষ্য করা যায়। রঘু কর্তৃক ইন্দ্রের পরাজয়, রঘুরাজার দান, অজের ইন্দুমতীকে বিবাহ ও দশরথের জন্ম, পারিজাতমালা স্পর্শে অজ ও ইন্দুমতীর মৃত্যু ইত্যাদি ঘটনা সম্পূর্ণরূপে 'রঘুবংশ' থেকে আহৃত। কৃত্তিবাস তাঁর স্বরচিত আত্মবিবরণীর অন্ত্যশ্লোকে বলেছেন—

রঘুবংশের কীর্তি কেবা বর্ণিবারে পারে।
কৃত্তিবাস রচে গীত সরস্বতীর বরে॥

—এ ছুটি ছত্র স্পষ্টতই স্মরণ করায় রঘুবংশের সূচনায় কালিদাসের বিনম্র ভাষণ 'ক সূর্য্যপ্রভবো বংশঃ ক চাল্পবিষয়া মতিঃ' ইত্যাদি।

কৃত্তিবাস তাঁর রামায়ণে কালিদাসপ্রদত্ত রঘুবংশের বংশলতিকাকেও অনুসরণ করেছেন, দেখা যায়। কালিদাসের রঘুবংশের আরম্ভ দিলীপের কাহিনী দিয়ে, কৃত্তিবাসের অবশ্য তা নয়। কিন্তু দিলীপের পুত্র অজ, অজের পুত্র দশরথ এবং দশরথের পুত্র রাম—রঘুবংশে বর্ণিত এই ধারাটুকু কৃত্তিবাস তাঁর রামায়ণে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। রঘুবংশে বর্ণিত নিঃসন্তান রাজা দিলীপের বশিষ্ঠাশ্রমে গমন, নন্দিনীর পরিচর্যা, পুত্রবরলাভ ইত্যাদি বিষয় কৃত্তিবাসে নেই। কৃত্তিবাস দু-একটি ছত্রে দিলীপের নামোল্লেখ করেই তৎপুত্র রঘুর কীর্তিগাথা বর্ণনার প্রতিই সমধিক দৃষ্টিনিবদ্ধ করেছেন, দেখা যায়। 'রঘু কর্তৃক ইন্দ্রের পরাজয়' এই শিকলিতে কৃত্তিবাস তাঁর রচনা শুরু করেছেন এভাবে—

দিলীপের নন্দন হইল রঘু রাজা।
পুত্রের সমান পালে পৃথিবীর প্রজা॥
একেত দিলীপ রাজা মহাবলবান।
তদ্রূপ হইল পুত্র পিতার সমান॥

পুত্রের বিক্রম দেখি ভাবে মনে মন।
অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেন আরম্ভন॥

দিলীপ অশ্বমেধ যজ্ঞে প্রবৃত্ত হয়ে পুত্র রঘুকে যজ্ঞের অশ্বরক্ষণের ভার দেন। কালিদাসে আছে—

নিযুজ্য তং হোমতুরঙ্গরক্ষণে
ধনুর্ধরং রাজসুতৈরনুদ্রুতম্।

—৩য় সর্গ, ৩৮ শ্লোক

কৃত্তিবাসে এর অবিকল অনুকরণ দেখতে পাই—

ঘোড়া রাখিবারে নিয়োজিলেন রঘুবরে।

কৃত্তিবাসের রামায়ণে যজ্ঞের অশ্বকে চুরি করার যে উদ্যোগ ইন্দ্র করেছেন, তা কালিদাসে বর্ণিত নেই। তবে ইন্দ্র যে অশ্ব অপহরণ করলেন, এটুকু বলা হয়েছে—

ধনুর্ভৃতামগ্রত এব রক্ষিণাং
জহার শক্রঃ কিল গূঢ়-বিগ্রহঃ।

—৩য় সর্গ, ৩৯ শ্লোক

কৃত্তিবাস কালিদাসকে অনুসরণ করলেও মাঝে মাঝে নিজ স্বাধীন কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন। কৃত্তিবাসে আছে, ইন্দ্রই অশ্ব অপহরণ করেছেন এই অনুমান করে রঘু স্বর্গলোকে গিয়ে উপস্থিত হন—

ঘোড়া হারাইয়া ভাবে দিলীপনন্দন।
ইন্দ্র বিনা ঘোড়া মোর লবে কোন জন॥
নয় বৎসরের শিশু দশ নাহি পুরে।
রথ চালাইয়া দিল ইন্দ্রের উপরে॥
সহস্র ঘোড়ায় বহে স্বর্গে রথখান।
পলকে প্রবেশে গিয়া ইন্দ্র বিদ্যমান॥

আর রঘুবংশে আছে, কামধেনু নন্দিনীর মূত্রজলে চোখ মার্জনা করায় রঘু অশ্বাপহরণকারী অদৃশ্য ইন্দ্রকে প্রত্যক্ষ করতে সমর্থ হন—

তদঙ্গনিস্যন্দজলেন লোচনে
প্রমৃজ্য পুণ্যেন পুরস্কৃতঃ সতাম্।
অতীন্দ্রিয়েষ্বপ্যুপপন্ন-দর্শনো
বভূব ভাবেষু দিলীপনন্দনঃ॥

—৩য় সর্গ, ৪১ শ্লোক

রঘুবংশে আছে, রঘু ইন্দ্রকে অশ্ব অপহরণের জন্য তিরস্কার করলে ইন্দ্র প্রত্যুত্তরে অশ্বাপহরণের যৌক্তিকতা দেখিয়ে অশ্বপ্রাপ্তি বিষয়ে রঘুকে প্রতিনিবৃত্ত হতে বলেন। এই কথা শুনে রঘু ইন্দ্রকে বৃথা গর্ব করতে না বলে অস্ত্রগ্রহণ করতে অনুরোধ জানান—

ততঃ প্রহস্যাপভয়ঃ পুরন্দরং
পুনর্বভাষে তুরগস্য রক্ষিতা।
গৃহাণ শস্ত্রং যদি সর্গ এষ তে
ন খল্বনির্জিত্য রঘুং কৃতী ভবান্॥

—৩য় সর্গ, ৫১ শ্লোক

কৃত্তিবাস রঘুবংশের অনুসরণে লিখেছেন—

রঘু বলে গর্ব কর রণ নাহি জিনি।
যার যত বল বুদ্ধি জানিব এখনি॥
আমাকে বালক দেখ আপনি কি বীর।
বালকের রণে আজি হও দেখি স্থির॥

রঘুর নিক্ষিপ্ত বাণ ইন্দ্রের বক্ষদেশ বিদ্ধ করেছে এ বর্ণনা রঘুবংশে পাই—

রঘোরবষ্টম্ভময়েন পত্রিণা
হৃদি ক্ষতো গোত্রভিদপ্যমর্ষণঃ।

—৩য় সর্গ, ৫৩ শ্লোক

কৃত্তিবাসও এরই অনুসরণে একটু অতিরঞ্জিত করে বলেছেন—

তিন বাণ মারে রঘু বাসবের বুকে।
ঐরাবত সহ ইন্দ্র ফিরে ঘোর পাকে॥

এরপরে উভয়ের তুমুল যুদ্ধের বর্ণনা রঘুবংশে রয়েছে। কৃত্তিবাসও তাই বর্ণনা করেছেন। রঘুবংশে কালিদাস শেষ পর্যন্ত কোনো পক্ষের জয়পরাজয় দেখাননি। রঘুর বীরত্বে মুগ্ধ ইন্দ্র যুদ্ধ স্থগিত রেখে রঘুকে প্রশংসা করেছেন এবং রঘুও শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রের সঙ্গে সন্ধির ব্যবস্থাই করেছেন। কালিদাসের এই সন্ধিব্যবস্থাতে বোধ করি কৃত্তিবাস সন্তুষ্ট হননি। তিনি নয় বৎসরের অধিক অথচ দশ পূর্ণ নয় এমন যে বালক রঘুকে দিয়ে ইন্দ্রের চরম পরাজয় দেখিয়েছেন—

রঘুরাজ জানে পাশুপত বাণসন্ধি।
হাতে গলে দেবরাজে করিলেক বন্দী॥
ঐরাবত হইতে পড়িল ভূমিতলে।
লোহার শিকলে বান্ধি রথে নিয়া তোলে॥

রঘুবংশে রঘুর দিগ্বিজয়ের বিস্তৃত বর্ণনা আছে কিন্তু কৃত্তিবাস তাঁর রামায়ণে এসব কিছু বিবৃত করেন নি। ত্রিভুবনকীর্তিত বিশ্বজিৎ যজ্ঞে রঘুর সর্বস্ব-দানের কথা কালিদাস বলেছেন। রঘুর অবিশ্রান্ত দানের কথা কৃত্তিবাসও বলেছেন, তবে সে যজ্ঞোপলক্ষ্যে নয়, পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে—

পিতৃশ্রাদ্ধ করিলেন রঘু যশোধন।
ব্রাহ্মণেরে দিলেন যতেক ছিল ধন॥

অন্তভক্ষ্য রঘুরাজ নাহি রাখে ঘরে।
মৃত্তিকার পাত্রে রাজা জলপান করে॥

রঘুবংশে আছে, বরতন্তু মুনির কৌৎস নামে জনৈক শিষ্য গুরুদক্ষিণা প্রদানের জন্য রঘুর কাছে চৌদ্দকোটি স্বর্ণ মুদ্রার প্রার্থী হন। দক্ষিণাস্বরূপ কিছুই নেবেন না বলা সত্ত্বেও 'আপনি কিছু গ্রহণ করুন' শিষ্যের এবংবিধ উপরোধে গুরু ক্রুদ্ধ হয়ে চৌদ্দ কোটি স্বর্ণ মুদ্রা প্রার্থনা করে বসেন। এই অসম্ভব প্রার্থনায় ব্যাকুল কৌৎস রঘুর কাছে মুদ্রাপ্রার্থী হন। কিন্তু কৃত্তিবাসে এই কাহিনী ঈষৎ পরিবর্তিত। কৃত্তিবাসে আছে—

বরদত্ত নামে এক ব্রাহ্মণ নন্দন।
কশ্যপ মুনির ঠাঁই করে অধ্যয়ন॥
গুরুগৃহে বসতি করিয়া বহুদিন।
চতুঃষষ্টি বিদ্যাতে সে হইল প্রবীণ॥
গুরু যে দক্ষিণা দিতে কহিল তাঁহারে।
কি দক্ষিণা দিব গুরু আজ্ঞা কর মোরে॥
গুরু বলে অল্প মাগি কর বিবেচনা।
চৌষট্টি বিদ্যার দেহ চৌদ্দ কোটি সোনা॥
দ্বিজ কহিলেন এই অসম্ভব কথা।
মনে ভাবে এতেক স্বর্ণ পাব কোথা॥
সবে বলে রঘুরাজা বড় পুণ্যবান।
তার ঠাঁই আমি গিয়া মাগি স্বর্ণদান॥

রঘুবংশে শিষ্যের নাম পাই কৌৎস, কৃত্তিবাসে তা বরদত্ত। রঘুবংশে গুরুর নাম বরতন্তু কিন্তু কৃত্তিবাসে কশ্যপ। রঘুবংশে গুরুর যে নির্লোভ চরিত্র অঙ্কিত দেখি, কৃত্তিবাসে তার পরিচয় নেই।

রঘুবংশে আছে, মৃত্তিকার পাত্রে অতিথি পরিচর্যা করতে দেখে কৌৎস তাঁর স্বর্ণমুদ্রা-প্রাপ্তি বিষয়ে হতাশ হয়ে ফিরে যেতে উদ্যোগী হন—

স মৃণ্ময়ে বীত-হিরণ্ময়ত্বাৎ
পাত্রে নিধায়ার্ঘ্যমনর্ঘ-শীলঃ।
শ্রুতপ্রকাশং যশসা প্রকাশঃ
প্রত্যুজ্জগামাতিথিমাতিথেয়ঃ॥

—৫ম সর্গ, ২ শ্লোক

কৃত্তিবাসও এই ভাবই ঈষৎ পরিবর্তিত করে লিখেছেন—

মৃত্তিকার পাত্রে রঘু করে জলপান।
দেখিয়া ব্রাহ্মণপুত্র করে অনুমান॥
মৃত্তিকার পাত্রেতে করিছে জলপান।
কিরূপে করিবে চৌদ্দ কোটি স্বর্ণদান॥

দেখিয়া ব্রাহ্মণ পুত্র যায় পাছু হৈয়া।

রঘুবংশে আছে, সর্বরিক্ত রঘু কৌৎসের আকাঙ্ক্ষিত ধনসংগ্রহের জন্য কৌৎসের কাছে দুই-তিন দিনের সময় প্রার্থনা করেন। কৃত্তিবাসেও অনুরূপভাবে পাই—

রাজা বলে এক রাত্রি থাক মহামুনি।
প্রাতঃকালে ধন দিব লৈয়া যাইও তুমি॥

কিভাবে চৌদ্দ কোটি স্বর্ণমুদ্রা সংগ্রহ করা যাবে এই ভেবে রঘু যখন বিমর্ষ বদনে ভাবনাগ্রস্ত, তখন নারদ এসে কুবেরের ধনভাণ্ডার আক্রমণের পরামর্শ দিলেন এবং রঘুও তা গ্রহণ করলেন—

আজ্ঞা করিলেন রাজা পাত্রপরিবারে।
সবে সাজ যাইব কুবের দেখিবারে॥

অযোধ্যায় সৈন্যদলের রণসজ্জা দেখে ভীত কুবের রঘুর ধনভাণ্ডার পূর্ণ করে দিলেন। রঘুবংশেও দেখি, সর্বরিক্ত রঘু একমাত্র কৈলাস জয় করা হয়নি ভেবে কৈলাস আক্রমণে উদ্যোগী হলে রাত্রিভাগে কুবের রঘুর ধনভাণ্ডার স্বর্ণবৃষ্টি করে পূর্ণ করে দেন।

কৃত্তিবাসের ইন্দুমতীর স্বয়ংবর বর্ণনা এবং পারিজাতমালা স্পর্শে ইন্দুমতীর মৃত্যু ও অজবিলাপ কালিদাসেরই অনুকরণ। কালিদাসে ইন্দুমতীর স্বয়ংবর সভার যে বর্ণাঢ্য বিবরণ আছে, কৃত্তিবাসে তা নেই। পারিজাত-মালা স্পর্শে ইন্দুমতীর মৃত্যু ও অজবিলাপের ক্ষেত্রে কৃত্তিবাসের বর্ণনা নিতান্তই সংক্ষিপ্ত। কৃত্তিবাস তাঁর রামায়ণে ইন্দুমতীকে মগধরাজার কন্যা বলেছেন আর কালিদাস বিদর্ভরাজা ভোজের ভগিনী বলেছেন। স্বয়ংবর সভায় এক একজন রাজাকে ইন্দুমতী অতিক্রম করে গেলে তাদের নিরাশ হৃদয়ের বিবর্ণ ভাবটি কালিদাস কি অপূর্ব উপমাযোগেই না প্রকাশ করেছেন—

সঞ্চারিণী দীপশিখেব রাত্রৌ
যং যং ব্যতীয়ায় পতিংবরা সা।
নরেন্দ্রমার্গাট্ট ইব প্রপেদে
বিবর্ণভাবং স স ভূমিপালঃ॥

—ষষ্ঠ সর্গ, ৬৭ শ্লোক

—আর কৃত্তিবাসে তার অক্ষম প্রকাশই দেখি। এক একজন রাজাকে ইন্দুমতী অতিক্রম করে চলে যাচ্ছেন, আর অমনি সেই রাজা মাটিতে লুটিয়ে গড়াগড়ি দিয়ে কান্নাকাটি করছেন—

যারে পাছু করে কন্যা করয়ে গমন।
ভূমিতে পড়িয়া সেই জুড়িল রোদন॥

কবি কৃত্তিবাস চমৎকার হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন এখানে।

ইন্দুমতীকে বিবাহ করে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পথে অজ ইন্দুমতীলাভে ব্যর্থমনোরথ রাজবৃন্দ কর্তৃক আক্রান্ত হন। যুবরাজ অজ প্রস্বাপন বাণের সাহায্যে তাঁদের নিদ্রায় অচেতন করে রেখে নিরাপদে অযোধ্যায় ফেরেন। রঘুবংশের এই ঘটনা কৃত্তিবাসেও

অনুসৃত, তবে কৃত্তিবাস একটু ব্যতিক্রম ঘটিয়েছেন। অজের হাতে সমস্ত রাজবৃন্দের মৃত্যু ঘটল—এইরূপ বলা হয়েছে—

তিনকোটি রাজা সেই যুদ্ধেতে মারিয়া।
অযোধ্যাতে গেল অজ ইন্দুমতী লৈয়া॥

প্রমোদবনে অজের সঙ্গে অবসর-যাপনের কালে দেবর্ষি নারদের বীণাভ্রষ্ট দিব্যমালার স্পর্শে ইন্দুমতীর মৃত্যু ঘটে। ইন্দুমতীর বিরহে শোকসন্তপ্ত অজ বালক দশরথের মুখ চেয়ে কোনরকমে জীবনধারণ করেন এবং ইন্দুমতীর মৃত্যুর দীর্ঘ আট বছর পরে পুত্র দশরথের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে প্রায়োপবেশনে দেহত্যাগ করেন। কালিদাসে এ বিষয়ে বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে। কৃত্তিবাসে তার সামান্যমাত্র পরিচয়। কৃত্তিবাস নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন—

এক বর্ষ বয়স্ক যখন দশরথ।
পুত্রে শোয়াইয়া দোঁহে সাধে মনোরথ॥
পুষ্পবনে ক্রীড়া করে হাস্য পরিহাসে।
নারদ চলিয়া যান উপর আবাসে॥
পারিজাতমালা ছিল তাঁহার বীণায়।
বাতাসে উড়িয়া পড়ে ইন্দুমতী গায়॥
পারিজাত যখন হইল পরশন।
ইন্দুমতী ছাড়িলেন তখন জীবন॥
প্রাণ ছাড়ি ইন্দুমতী গেল স্বর্গপুরে।
কাঁদে অজ লোচন ভরিল তাঁর নীরে॥
কত বা কহিব সেই রাজার বিলাপ।
না পারে সহিতে ইন্দুমতীর সন্তাপ॥
সেই পারিজাত মারে আপনার গায়।
দুইজন মুক্ত হয়ে স্বর্গপুরে যায়॥

নিজদেহে পারিজাতের মালার স্পর্শ ঘটিয়ে অজের মৃত্যুবরণ সম্পূর্ণই কৃত্তিবাসের স্বকপোলকল্পিত। বরং কালিদাসে বিপরীত বৃত্তান্ত দেখা যায়—যে মালায় ইন্দুমতীর মৃত্যু ঘটল, সেই মালার স্পর্শে তাঁর মৃত্যু হল না কেন—এই বেদনাভরা জিজ্ঞাসা অজের কণ্ঠে ধ্বনিত—

স্রগিয়ং যদি জীবিতাপহা
হৃদয়ে কিং নিহিতা ন হন্তি মাম্॥

—৮ম সর্গ, ৪৬ শ্লোক

কৃত্তিবাস কালিদাসের নিকট ঋণগ্রহণ করলেও অক্ষরে অক্ষরে যে তাঁর অনুকরণ করেননি, তা দেখা যাচ্ছে। কৃত্তিবাসের অনুবাদ স্বচ্ছন্দ মুক্তানুবাদ। এমন কি পরিবর্জন ও পরিবর্ধন ব্যাপারটি একান্তভাবেই তাঁর নিজস্ব।

প্রেমধর্ম প্রসঙ্গে

সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়

সকলেই জানেন প্রেমধর্ম—গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর বিশেষ দান। প্রাক্ চৈতন্য যুগে যা অনর্পিত ছিল অর্থাৎ যা অপরের অজানা ছিল প্রভু তা জগৎকে জানালেন। শ্রীমদ্ ভাগবতে প্রেম ছিল, গোপী-প্রেমের পরাকাষ্ঠাও ছিল কিন্তু ছিল না রাধাভাবের ভজন। সেই আত্মহারা প্রেমের অর্ঘ্য সাজিয়ে ভগবচ্চরণে অর্পণ করার পন্থা প্রদর্শন করলেন চৈতন্যদেব। জ্ঞানের পথে নয় প্রেমের পথে, ঐশ্বর্যের পথে নয় মাধুর্যের পথেই ভগবানকে পরমাত্মীয় রূপে, নিকট বন্ধু রূপে—স্বামী-পুত্র-প্রেমিক-সখা রূপে কল্পনা করে উপাসনা করাই প্রকৃষ্ট পন্থা। প্রভু জগৎকে প্রেমভাবে বিভাবিত করে প্রেম-ভক্তির পরমতম রূপ দেখালেন।

ভক্তিধর্ম প্রাচীন ধর্ম। গীতাতে এর উল্লেখ আছে, বেদপুরাণেও আছে। তবে তা সূত্রমাত্র, যদিও গীতায় তার বিশেষ প্রশস্তি লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন ঋষি মুনিদের কথা ছেড়ে দিলেও পরবর্তীকালে আবির্ভূত ঋষিতুল্য ভক্তিপ্রচারক বিষ্ণুস্বামী, নিম্বার্ক, রামানুজ, মধ্বাচার্য প্রভৃতি বৈষ্ণবধর্ম সংস্থাপকগণও এ তত্ত্ব জানতে বা জানাতে পারেন নি। প্রেমধর্মের প্রচারক শ্রীচৈতন্যদেবই—তিনি নিজে ছিলেন 'রাধাভাব-দ্যুতি-সুবলিত' কৃষ্ণস্বরূপ—তাই তাঁর পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল জগতকে 'মধুর-বৃন্দা-বিপিন-মাধুরী-প্রবেশ-চাতুরী' শিক্ষা দেওয়া। শ্রীভগবানের ঐশ্বর্যমূর্তিই চিরকাল উপাস্যরূপে অর্চিত হয়ে এসেছে। জ্ঞানযোগ বা কর্মযোগের যোগীরা ভক্তিভাবরূপা ধর্মকে সহযোগী মাধ্যমরূপে গণ্য করে এসেছেন। কিন্তু ভগবান যে কেবল ঐশ্বর্যময় নন মাধুর্যময়, প্রেমময়—তা মহাপ্রভুর পূর্বে কেউ চিন্তা করেন নি। কেউ কেউ কিছু অনুভব করলেও (যেমন মাধবেন্দ্র পুরী, ঈশ্বর পুরী প্রভৃতি) যেহেতু যুগধর্ম প্রচারের প্রতিভা তাঁদের ছিল না তাই প্রেমাস্বাদনে নিজেরা উদ্দীপিত হলেও অপরকে তেমন অনুপ্রাণিত করতে পারেন নি। মহাপ্রভুই প্রথম ব্যক্তি যাঁর প্রচারে প্রেমধর্মের ব্যাপক প্রসারতা ঘটে; 'রাধার-মহিমা-প্রেমরস-সীমা' জগতকে জানিয়ে দেওয়া তাঁর পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল।

মহাপ্রভু শ্রীভগবানের মাধুর্য সংবাদ—গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের অভিনব দানের কথাই শুধু ঘোষণা করলেন না তাঁর অপূর্ব কারুণিকত্বের দিকটিও উদ্‌ঘাটিত করলেন। ভগবৎ-পরিকল্পনার সঙ্গে একটা ভয় বা আতঙ্ক এতদিন জড়িত ছিল। ভগবান পাপীর শাস্তিদাতা আমাদের এই কথাই জানা ছিল। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব এসে প্রচার করলেন ভগবান পরম করুণাময়—তিনি পাপীর পরিত্রাতা—মায়াবদ্ধ জীবকে উদ্ধার করাই তাঁর কাজ 'লোক নিস্তারিতে এই ঈশ্বর স্বভাব।' ভগবানকে পাওয়ার জন্য জীবের যত না উৎকণ্ঠা, তাঁকে পাওয়াবার জন্য তাঁর আরও বেশী উৎকণ্ঠা। জীবচিত্তে এই শ্রীকৃষ্ণস্মৃতি

স্ফুরিত করার জন্যই যুগাবতাররূপে শ্রীচৈতন্যদেবকে অবতীর্ণ হতে হয়েছে। ভক্তভাব অঙ্গীকার করে তিনি 'আপনি আচরি ধর্ম' জীবকে ভজনাদি শিক্ষা দিয়ে তার উদ্ধার সাধন করতে চেয়েছেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের উদারতা—বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। জাতি ধর্ম বর্ণ-নির্বিশেষে সকলকেই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে সাধন পথে অগ্রসর হতে নির্দেশ দিয়েছেন শ্রীমন্মহাপ্রভু। 'চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ণঃ' তাঁর এই বাণী সেদিন এক সামাজিক বিপ্লব ঘটিয়েছে, ষোড়শ শতকের ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুসমাজকে আসন্ন অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করেছে। মানবতার মহিমাকে এইভাবে স্বীকৃতি দেওয়ায় চৈতন্যধর্ম আরও উদার পটভূমিকায় স্থাপিত হয়েছিল। কোনও উপাস্যকেই তিনি অস্বীকার করেন নি, কোনও সাধনাকেই তিনি নিষ্ফল বলেন নি। তিনি যদিও বৈধী ভক্তি অপেক্ষা রাগানুগা ভক্তির উপরেই বেশী জোর দিয়েছেন কিন্তু 'যার যেই ভাব সেই তার শ্রেষ্ঠ পথ' এমন উদার নির্দেশও তিনিই দিয়েছেন। 'হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্'—বৃহন্নারদীয় পুরাণের এই বাণী তাঁর কণ্ঠে সার্থক রূপ লাভ করেছে। হরিনাম মহামন্ত্র জপই পতিত মানবাত্মার উদ্ধার লাভের উপায় বলে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। মহাপ্রভু-নির্দিষ্ট ভজন দেশ-কাল-পাত্র নির্বিশেষে সকলের পক্ষেই সহজসাধ্য হওয়ায় বৈষ্ণবধর্ম এক সার্বজনীন রূপলাভ করে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে এই নাম সঙ্কীর্তনের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। সঙ্কীর্তন প্রাক্-চৈতন্যযুগের হলেও এর ব্যাপক প্রচার চৈতন্য-নিত্যানন্দের দ্বারাই সম্ভব হয়েছে। এইজন্য তাঁদের দুজনকে বলা হয়েছে 'সঙ্কীর্তন পিতরৌ'। লীলাকীর্তন বা রসকীর্তন যা পালাগান আকারে গীত হয় চৈতন্যদেবই তার উদ্ভাবক। ভাগবতে আছে (১৫।১৯) গোপীগণ কৃষ্ণলীলা গান করতেন স্বয়ং কৃষ্ণও তাতে অংশ গ্রহণ করতেন, চৈতন্য-লীলাতেও দেখি তদনুরূপ অন্তরঙ্গ ভক্ত পরিকরদের সঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভু লীলাকীর্তনের সাহায্যে প্রেম আস্বাদন করতেন এবং অপরকে করাতেন।

এই প্রেমরস বৈষ্ণব পরিভাষায় ভক্তিরস। ভক্তিরসে রসিত চিত্ত যাঁর তিনিই ভক্ত। রস শব্দ আনন্দার্থবোধক 'রসহ্যেবায়ংলব্ধানন্দী ভবতি', 'যং লব্ধানাপরং লভ্যং'—রস যা লাভ করলে আনন্দ হয়, যা লাভ করলে অন্য কিছু লভ্যজ্ঞান থাকে না—ইত্যাদি যে বৈদান্তিক সিদ্ধান্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ তাকে চরম ও পরম পাওয়া মনে করেন না। তাঁরা বলেন যা পেলে আরও নিবিড় করে পেতে ইচ্ছা করে সেই লাভই লাভ। চাওয়া ও পাওয়ার পরিসমাপ্তি তাঁরা মেনে নেন না। চির কাঙ্ক্ষিতকে পেয়েও তাঁরা থাকেন চির অতৃপ্ত।

ঈশ্বর ও জীবের সম্পর্ক ও স্বরূপ নির্দ্ধারণেও বৈদান্তিক সিদ্ধান্তের সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের পার্থক্য সুস্পষ্ট। বেদান্তাদি দর্শনের প্রমাণে জানা যায় প্রাচীনকালে ঋষিমুনি যোগীরা কেউ কেউ অদ্বৈতবাদী থাকলেও ভেদাভেদবাদী ছিলেন সংখ্যায় বেশী। আচার্য শঙ্কর অদ্বৈতবাদী আচার্য বেদব্যাস ভেদাভেদপন্থী কিন্তু মাধ্বাচার্য

আত্যন্তিক ভেদবাদী। মহাপ্রভু এই ভেদাভেদকে অদ্বয় সম্বন্ধে যুগপৎ নিত্য স্বীকৃতি দিয়ে এক অভিনব সিদ্ধান্ত স্থাপনা করেন তার নাম অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ। এই সিদ্ধান্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণবের এক অসাধারণ সিদ্ধান্ত। মহাপ্রভু প্রকাশানন্দ ও সার্বভৌমের সঙ্গে বিচার বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরই অভিপ্রায় অনুসারে রূপ ও সনাতন এবং পরবর্তীকালে শ্রীজীব গোস্বামী এই সিদ্ধান্তকে অবলম্বন করে তাঁদের গ্রন্থাদি রচনা করেন। এই সিদ্ধান্ত শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্পর্কে যেমন সত্য তেমনি সত্য শ্রীচৈতন্যলীলা বিষয়েও। ভক্তদের দৃষ্টিতে শ্রীচৈতন্যদেব কৃষ্ণ হতে ভিন্নও বটে অভিন্নও বটে। শ্রীচৈতন্যের বিগ্রহে 'রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপে' দেখার মধ্যে এই অচিন্ত্যভেদাভেদের সহাবস্থান স্বীকৃত হয়েছে।

প্রেমধর্মের প্রকৃতি নির্ধারণেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিনব দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। প্রাচীনকালে প্রেমের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে রাজশেখর তাঁর "কর্পূর-মঞ্জরী" নাটকে বলেছেন, "অণ্ণোণ্ণমিলিদস্স মিধুণস্স মঅরদ্ধ অসাসণেণ পরূঢ়ং পণঅগ্গন্থিং পেম্মং ত্তি ছইল্লা ভণংতি"—অর্থাৎ মদনের আদেশক্রমে পরস্পর মিলিত যুবক-যুবতীর মধ্যে যে মিলনাসক্তি গ্রন্থি নিবদ্ধ হয়—পণ্ডিতেরা তাকে প্রেম বলেন। রাজশেখর নির্দেশিত এই প্রেম কামজ কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবের প্রেম এর অনুরূপ হলেও ঠিক এই প্রেম নয়। "প্রেমৈব গোপরামানাং কাম ইত্যগমৎপ্রথাম" 'ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু'র এই বাক্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। গোপ রমণীগণের কামাচরণের পদ্ধতিই প্রেম শব্দাখ্য, কাম শব্দবাচ্য নয়। গোপরমণীগণের আচরণীয় পদ্ধতি নয় অথচ তদনুকরণমূলক গোপাতীত জনগণের যে প্রচেষ্টা ও তৎপরতা তা কাম শব্দাখ্য। রাজশেখর নির্দেশিত প্রেম প্রেমিক প্রেমিকার আত্মসুখ বাঞ্ছা সঞ্জাত, কিন্তু গৌড়ীয় প্রেম আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা সঞ্জাত নয়, তা কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা হেতু সঞ্জাত। চৈতন্যচরিতামৃতকার কাম ও প্রেমের পার্থক্য এই ভাবে নির্দেশ করেছেন—

কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য হয় প্রেম মহাবল॥

একালের মহাকবির ভাষাতেও কাম ও প্রেমের পার্থক্য সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। তাঁর কথায়—"বাংলা ভাষায় প্রেম অর্থে দুটো শব্দের চল আছে; ভালো লাগা ও ভালোবাসা। এই দুটো শব্দে আছে প্রেম সমুদ্রের দুই উলটো পারের ঠিকানা। যেখানে ভালো লাগা সেখানে ভালো আমাকে লাগে, যেখানে ভালোবাসা সেখানে ভালো অন্যকে বাসি। আবেগের মুখটা যখন নিজের দিকে তখন ভালো

লাগা, যখন অন্যের দিকে তখন ভালোবাসা। ভালো লাগায় ভোগের তৃপ্তি, ভালোবাসায় ত্যাগের সাধন।"[১]

ভালোলাগা ও ভালোবাসা তাই এক হয়েও এক নয়। ভালো লাগলেই যে ভালোবাসা হয় তা ঠিক বলা যায় না, কিন্তু ভালোবাসলে যে ভালো লাগে তাতে সন্দেহ নেই। ভালোলাগাকে পূর্বে রেখে যে ভালোবাসা তা অনিত্য সম্বন্ধী কামহেতু, স্বসুখ বাসনাময়; তা একসময় থাকে অন্যসময় থাকে না। কিন্তু ভালোবাসাকে পূর্বে রেখে যে ভালোলাগা তা নিত্যসম্বন্ধী পরসুখানুসন্ধি প্রেমহেতু। এর স্থায়িত্ব আছে। সংস্কৃত ভাষায় অনুভব বলতে যা বুঝি তার খাঁটি বাংলা প্রতিশব্দ আছে ভালোবাসা শব্দের মধ্যে। ভালোবাসা বলতে বোঝায় ভালো অনুভব করা। কবির ভাষায়—"কারো পরে আমাদের অনুভব যখন সম্পূর্ণ ভালো হয়ে ওঠে, ভালো ভাবায়, ভালো ইচ্ছায় মন কানায় কানায় ভরতি হয় তখন তাকেই বলি ভালোবাসা। পূর্ণ উৎকর্ষের ভাবকেই বলা যায় ভালো। স্বাস্থ্য যেমন প্রাণের পূর্ণতা, সৌন্দর্য যেমন রূপের পূর্ণতা, সত্য যেমন জ্ঞানের পূর্ণতা, ভালোবাসা তেমনি অনুভূতির পূর্ণতা।"[২]

রবীন্দ্রনাথ যাকে ভালো লাগা ও ভালোবাসা বলেছেন গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ তাকেই বলেছেন কাম ও প্রেম। তাঁরা আরও বলেছেন, যা জাগতিক কাম ভাবের ধারারূপে সর্বজন বিদিত তাই আবার পারমার্থিক প্রেম ভাবের ধারারূপে প্রব্যক্ত হয়। পার্থক্য মাত্র আত্মসুখ বাঞ্ছা ও পরসুখ বাঞ্ছা সমন্বিত হওয়ার। এইহেতু রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা মর্ত্যে কামক্রিয়া অনুরূপ কাম সাম্যে চিন্তনীয় হলেও কাম শব্দ বাচ্য নয়। নন্দ যশোদার বাৎসল্য ভাব সুবল শ্রীদামাদির সখ্যভাব কিংবা গোপীগণের শৃঙ্গার রসমধুর কান্তাভাব সেইজন্যই কাম নয়।

অলঙ্কার শাস্ত্রে আদি, বীর, করুণ প্রভৃতি নব রসের উল্লেখ আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে এই নবরস গৌণ, মুখ্য রসপর্যায় হল শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চ রস। অখিল রসামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণ সেখানে সাধ্য-আস্বাদ্য রস। এই রস অপ্রাকৃত এবং সর্বরসসার। এই রস আস্বাদনই রসিকের ধর্ম, এরই নাম প্রেমধর্ম। এই উজ্জ্বল রসপুষ্ট মধুর ভাব গোপ্যা প্রকৃতিবশে আস্বাদিত হয়। এই গোপ্য প্রকৃতিই গোপী শব্দাখ্য এবং হেতু সম্বন্ধ বর্জিত। গুপ্ ধাতু থেকেই গোপী শব্দ নিষ্পন্ন। এর অর্থ ভাব রক্ষা করা। এই ভাব আবার বহু প্রকার এবং বহু বৈচিত্র্য-যুক্ত হয়ে এক মহাভাবের কায়ব্যূহরূপে ভাববৈচিত্র্যে বিলসিত বা বিকশিত হয়। এই মহাভাবের প্রকাশই পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের লীলা লাস্যময়ী পরমা প্রকৃতি শক্তির স্ফুরণ। এই শক্তি সমন্বিত হয়েই পরমপুরুষ পূর্ণ। এঁর মাধ্যমেই হয় পরমপুরুষের আত্ম-সমীক্ষা। ইনিই পরমপুরুষের আত্মপ্রসারণে অনপনায়িনী আনন্দশক্তি। ইনিই রাধ্যা তথা রাধা। পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ এই রাধা শক্তিকে পরিস্ফুট ক'রে এঁর মাধ্যমেই

১-২ যাত্রী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, র,র, পৃ ৪১৮ (বিশ্ব)

দ্বৈতায়নে যুগনদ্ধ রূপে প্রেমলীলার প্রসার সাধন করেন এবং আপনি আপনাকে বহুভাবে আস্বাদন করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারক শ্রীচৈতন্যের এই তত্ত্ব ও তথ্য আস্বাদনে জনগণকে উদ্দীপ্ত করাই শ্রেষ্ঠ অবদান। এই দিক থেকেই তাঁর চৈতন্য দীপ প্রজ্বলন।

গোপ্যা প্রকৃতিতে যে ভাবের বিকাশ হয় তা স্থায়ী ও অস্থায়ী ভেদে দ্বিবিধ—একে বিভাব বলা হয়। বিভাব অর্থে বিশেষ ভাব। এর প্রভাবেই রতির উদ্ভব ঘটে। বিভাব দু' রকমের—আলম্বন ও উদ্দীপন। আলম্বন অর্থে যাকে আশ্রয় করে এবং উদ্দীপন অর্থে সেই আশ্রয়ী সাধ্যের যে ভাব বা ভাবসকলের দ্বারা উদ্দীপিত হয়। এই বিভাবের প্রতিফলন লোকচিত্তে ভাবের উদ্ভব ঘটায় ও তাকে সেই বিষয়ে প্রবুদ্ধ করে তা অনুভাব, অনুভূত ভাব এই অর্থে। এই বিভাব যখন অনুভাবে পর্যবসিত হয় তখন ভাবুক চিত্তে যে ভাবান্তরের সঞ্চার হয় তাকে সঞ্চারি ভাব বা ব্যভিচারী ভাব বলা হয়। ভাবের স্থায়ী অস্থায়ী এই দ্বিবিধ ভেদের কথা যা বলা হয়েছে তা হল এই, যে ভাব কোন বিভাবের সঙ্গে একান্ত অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত থাকে তা স্থায়ীভাব, আর যে ভাব কোন ভাবধারায় সহসা যুক্ত হয়, যার আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটে তা অস্থায়ী। 'সাহিত্যদর্পণাদি' অলঙ্কার শাস্ত্রে বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারির এইরূপ বিচার লক্ষ্য করা যায়। অলঙ্কার শাস্ত্রোক্ত এই ত্রিবিধ ভাবের অতিরিক্ত আর একটি ভাব গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন সিদ্ধান্তে যোজনা করা হয়েছে। তাকে বলা হয়েছে সাত্ত্বিক ভাব। তা আস্বাদ্য কৃষ্ণভক্তিরসের শ্রবণাদিসূত্রে ভক্তগণের হৃদয়ে রতির উদ্ভব ঘটায়। সাত্ত্বিক ভাবও স্থায়ী ভাব। 'ভক্তিরসামৃত সিন্ধু'তে বলা হয়েছে—

> বিভাবৈরনুভাবৈশ্চ সাত্ত্বিকৈর্ব্যভিচাবিভিঃ।
> স্বাদ্যত্বং হৃদিভক্তানামানিতা শ্রবণাদিভিঃ ॥
> এষা কৃষ্ণরতি স্থায়ীভাবো ভক্তিরসোভবেৎ।

এখানে কৃষ্ণভক্তিরসাশ্রয়ী রতি স্থায়ী ভাব। এটাই আস্বাদ্য রস। এর আস্বাদনে প্রতিক্ষণেই নব নব চমৎকারিত্ব অনুভূত হয়। যে চমৎকারিত্ব আস্বাদনে আস্বাদকের স্পৃহা ক্রমিক প্রবল থেকে প্রবলতর-তম হয়ে ভাবুককে ভাবমাধুর্যে তন্ময় করে তোলে, আনন্দসাগরে ডুবিয়ে আত্মার আত্মীয় করে, বাহ্যচেতনা লোপ করে এবং অন্তশ্চেতনায় দীপিত করে। কাব্যসাহিত্যে বা অলঙ্কারশাস্ত্রে এর তুলনা মেলে না। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনোক্ত পঞ্চরসের যে কোন একটিকে—যার যে ভাবরসে রতি ও মতি হয়—আশ্রয় করে বৃন্দাবনীয় আদর্শ অনুসারে আচরণ করতে হয়। রূপগোস্বামী 'ভক্তি-রসামৃত সিন্ধু'তে উল্লেখ করেছেন—

> শুদ্ধসত্ত্ব বিশেষাত্মা প্রেম সূর্যাংশু সম্যভাক্।
> রুচিভিশ্চিত্তমাসৃপ্য কৃদসৌ ভাব উচ্যতে ॥

অর্থাৎ যার আত্মা (মন) শুদ্ধসত্ত্ব হয়েছে, অশুদ্ধসত্ত্ব বা কামপ্রণোদিত নয়, সেই নিষ্কাম মনের পক্ষে যে চিত্তাকর্ষী রুচি স্বভাবত সূর্যাংশু সম উদিত হয় তাই ভাব-

ভক্তির লক্ষণ। এই ভাবভক্তি আবার যখন 'সম্যঙ্ মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ। ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মাবুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥'—সম্যকরূপে ইষ্টনিষ্ঠ শান্তভাবাশ্রয়ী অধিক মমতা দ্বারা সন্নিবদ্ধ যে ভাব আত্মারাম শুদ্ধ জ্ঞানী ভক্তগণ তাকে প্রেম বলে অভিহিত করেন। এ প্রসঙ্গে রূপ গোস্বামী পঞ্চরাত্রীয় প্রমাণ দেখিয়েছেন—'অনন্য মমতাবিষ্ণৌ মমতা প্রেম সঙ্গতা। ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম-প্রহ্লাদোদ্ধব নারদৈঃ॥' —ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব নারদাদি ভক্তগণ বলেন বিষ্ণুতে যে মমতা বা 'আমার এই বোধে' আসক্তি জন্মে, সেই মমতাকে প্রেম বলা হয়। এই প্রেম দু রকমের— মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্ত ও কেবলা। ভগবানের ঐশ্বর্য-বল-বীর্যময়রূপ মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্ত ভক্তির লক্ষ্য—ভক্তেরা ঐশ্বর্যমুগ্ধচিত্তে ভগবানের ভগবত্তা নির্ধারণ করে স্নেহযুক্ত ভক্তি করে থাকেন। শান্ত ও দাস্যরতির ভক্তগণ এই শ্রেণীর। তাঁদের ভুক্তি মুক্তি স্পৃহাও থাকে। তাই এই ভক্তিকে বলা হয় সকাম ভক্তি। কিন্তু কেবলা নিষ্কাম ভক্তি। যেখানে—'মনোগতিরবিচ্ছিন্না হরৌ প্রেম পরিপ্লুতা। অভিসন্ধি বিনির্মুক্তা ভক্তির্বিষ্ণুর্ব-শঙ্করী॥'—মনের চিন্তা ভাবনা নিরন্তর হরিস্মরণেই নিমগ্ন, কোন বাসনা বা কামনা আত্মার্থে সঞ্জাত হয় না, কেবল প্রেমমাত্র চাওয়া ও পাওয়ার আস্পদ হয়, হরিকে বশ করার পক্ষে সেই ভক্তিই শ্রেষ্ঠ প্রেমবাচ্য। এই কেবলাভক্তি বা অহৈতুকী ভক্তিই সর্বভক্তি শিরোমণি। এই ভক্তিরসের মুখ্য তিনরূপ—সখ্য বাৎসল্য ও মধুর। আর দুটি ভক্তি—শান্ত, দাস্য-মুখ্য রূপে গণ্য হলেও প্রেমভক্তি বলতে যথার্থ অর্থে যা বুঝি সেই অর্থে প্রেম-ভক্তি-পদবাচ্য নয়। শান্ত ও দাস্যভক্তি ঐশ্বর্য গৌরবান্বিত ভগবৎ-চিন্তায় ভক্তজনেরাই করে থাকে। এদের সাধারণ ভক্তি বা সামান্যভক্তি বলাই উচিত। প্রেমভক্তি ঐশ্বর্য জ্ঞানহীন গোপীগণ একমাত্র কৃষ্ণজ্ঞান ও কৃষ্ণপ্রেম সেবা ভিন্ন বাহ্য সর্বপ্রকার জ্ঞানাসক্তিবর্জিত ছিলেন।

সেই গোপীভাবামৃতে যার লোভ হয়।
বেদধর্ম সর্ব ত্যজি সেই কৃষ্ণেরে ভজয়॥
রাগানুগা মার্গে তারে ভজে যেই জন।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

কৃষ্ণ-ভজনায় বৃন্দাবনীয় আদর্শই অনুসরণীয়। তদাশ্রয়ী রতির অভিনিবেশ ঘটে প্রীতির আশ্রয়ে। প্রীতিই ভক্তচিত্ত দ্রবীভূত করে এক অব্যক্ত উল্লাসের সঞ্চার ও প্রসার ঘটায়। আমার জ্ঞানে মমতা সংযোগ সাধন করে এবং সাধ্যকে প্রিয় হ'তে প্রিয়তর-তম করে। প্রীতিই ক্রমাধিকতর সেবামূলক বাসনা জাগায়, প্রতিক্ষণেই নব নব ভাবসংযোগ করে অসমোর্দ্ধচমৎকারিতায় আনন্দসাগরে ভাসায়। প্রীতিই সাধ্যনিষ্ঠা বা সাধ্যের প্রতি একান্ত আস্থা ও অভিনিবেশ ঘটায়। জীব গোস্বামী 'প্রীতিসন্দর্ভে' এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। প্রীতিই মমতাধিক্যে মাত্রাধিক্যতায় সর্ববাধা অতিক্রম করে প্রেমরতির উদ্ভব ঘটায়। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব ভগবানকে পতিভাবে নয় উপপতিভাবে ভজনাকেই আদর্শ করেছেন অর্থাৎ তাঁর সাধনা

স্বকীয়ার নয় পরকীয়ার। চরিতামৃতে বলা হয়েছে 'পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।' এই পরকীয়া ভাবের ভজনার দৃষ্টান্ত সমগ্র বৈষ্ণব পদ সাহিত্যে। পরকীয়া ভাবে রাধা আদি গোপীগণ ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করেছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের বিশেষ পক্ষপাত ছিল এই ভাবের প্রতি। গোপীদের পরকীয়া প্রেম 'রাগাত্মিকা' শ্রবণ কীর্তনাদির অপেক্ষা না রেখে অন্তরের অনুরাগ থেকেই তার জন্ম। জীব যখন সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তদনুসরণ করে তখন সেই ভক্তিকে বলা হয় 'রাগানুগা' ভক্তি। গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দকে এই ভক্তিপথের সন্ধান দিয়েছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব কারণ রাগাত্মিকা ভজনে ছিল তাঁর নিত্য ও অবাধ গতাগতি। দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকালে গোদাবরীতটে রসিকশ্রেষ্ঠ রায় রামানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভু রসতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সুদীর্ঘ আলোচনা করেন তাতে প্রেমভক্তির পর্যায় বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে এই রাগাত্মিকা ভক্তির স্বরূপ নির্ধারিত হয়েছে। রামানন্দ যে রাধাপ্রেমকে 'সাধ্য শিরোমণি' বলেছেন এবং মহাপ্রভু যার ব্যাখ্যা শ্রবণে অপূর্ব সুখলাভ করেছেন সেই রাধাভাবের ভজনার মূল আছে লীলাশুক বিল্বমঙ্গলের 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত' গ্রন্থখানিতে। প্রসঙ্গতঃ মনে রাখা প্রয়োজন শ্রীচৈতন্যদেব এই গ্রন্থের একখানি অনুলিপি দাক্ষিণাত্য থেকে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন এবং সনাতনের সঙ্গে সম্বন্ধতত্ত্ব বিচারকালে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য মাধুর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে কর্ণামৃতের ৯২ তম শ্লোক—

> মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
> মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো, মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥

উদ্ধার করেন। সুতরাং লীলাশুকের রাগভক্তি যে মহাপ্রভুর মনঃপূত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। দক্ষিণদেশীয় আলোয়ার অর্থাৎ ঈশ্বর প্রেমে মত্ত ভক্তগণের প্রেমভক্তিও হয়তো তাঁকে কিছুটা প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু চৈতন্যদেবের অন্তরে প্রেমধর্মের বীজ নবদ্বীপে অবস্থানকালেই উপ্ত হয়েছিল—জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মধুর রসাশ্রয়ী পদাবলীর রসপ্রপাতে তা ফলবান তরুতে পরিণত হয়, দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে দক্ষিণী ভক্তিবাদের জলসিঞ্চন তাকে আরও রসপুষ্টি দান করেছে একথা বলা চলে। মহাপ্রভু যদিও রাধাভাবের ভজন দাক্ষিণাত্য থেকে ফিরে এসেই প্রচার করেন কিন্তু ঐ অভিনব প্রেমধর্মের অঙ্কুর গৌড়দেশে থাকা কালেই শ্রীচৈতন্যের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে ভক্তিধর্মের আদি উৎস মাধবেন্দ্র পুরী। মাধবেন্দ্র-শিষ্য ঈশ্বর পুরীও গুরুর অনুরূপ প্রেমিক ভক্ত ছিলেন। চৈতন্যদেব ঈশ্বরপুরীর কাছে গয়ায় দশাক্ষর—'গোপীজন বল্লভায় স্বাহা' মন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ করে গোপীপ্রেমে মাতোয়ারা হন। সুতরাং চৈতন্যপ্রবর্তিত প্রেমধর্ম স্বরূপতঃ গৌড়ীয়।

প্রয়াগে রূপ গোস্বামীকে দশদিন ধরে নিজের কাছে রেখে প্রেমভক্তি প্রসঙ্গে তিনি যে সব উপদেশ দেন কিংবা সনাতনকে প্রয়োজনীয় যে সব তত্ত্বশিক্ষা দেন কবিরাজ গোস্বামী দেখিয়েছেন তাও মুখ্যতঃ প্রেম সাধনার বিষয়ে। অবশ্য এই সব আলোচনা কতটা মহাপ্রভুকৃত আর কতটাই বা কৃষ্ণদাস আরোপিত তা নিশ্চয় করে

বলা সম্ভব নয়, তবে সত্যের সঙ্গে কল্পনার খাদ মিশিয়ে যা ঘটেছিল অপেক্ষা যা ঘটা উচিত ছিল বা ঘটলে ভালো হত—তার কথা বলতে গিয়ে তিনি 'চৈতন্ত চরিতামৃতে' যে অপূর্ব শিল্পমূর্তি নির্মাণ করেছেন তার থেকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের স্বরূপ উপলব্ধি করা আজ সহজ হয়েছে। শ্রীচৈতন্যজীবনাদর্শ অনুধাবন করতে যে একখানি মাত্র গ্রন্থ আমাদের সর্বাধিক সাহায্য করে তা যে 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' তাতে দ্বিমত নেই। প্রায় পঁচাত্তরখানি প্রামাণ্য-বৈষ্ণব দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ আশ্রয়ে বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী প্রভুর নির্দেশ ও উপদেশক্রমে সপ্তম গোস্বামী স্থানাভিষিক্ত কবি-দার্শনিক-ভক্ত-পণ্ডিত শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ রাগানুগা ভক্তির ক্রম ও পরিণতি, অভিধেয় তত্ত্ব, প্রয়োজন তত্ত্ব, সম্বন্ধ-তত্ত্ব প্রভৃতি নানা প্রসঙ্গে প্রেমধর্মের যে নির্যাসটুকু এই গ্রন্থে পরিবেশন করেছেন তার থেকেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের স্বরূপ নির্ধারণ করা যায়। প্রেমধর্ম সম্পর্কে প্রভুর নিজের কথা বলতে আমরা জানি তাঁর শিক্ষাশ্লোকাষ্টকের—শ্লোক পঞ্চক (চৈ. চ. ২।৩।৪।৬।৭ সংখ্যক শ্লোক) যা রূপ গোস্বামী তাঁর 'পদ্যাবলী'তে সংকলন করে রেখেছেন এবং কবিরাজ গোস্বামী তাঁর গ্রন্থের সর্বশেষ অধ্যায়ে উদ্ধৃত করেছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের বর্ণনানুসারে এই শিক্ষাষ্টকই মহাপ্রভুর শেষ বচন রূপে প্রতিপন্ন হলেও আমাদের মনে হয় এই শ্লোকগুলি তাঁর উন্মাদদশার প্রথমাবস্থার প্রসঙ্গ রূপেই স্থাপিত হওয়া উচিত, যখন প্রভু কিঞ্চিন্মাত্রও সুস্থ ছিলেন এবং স্বরূপ রামরায়কে উপলক্ষ করে স্বয়ং অষ্টশ্লোকের রস পুনঃ পুনঃ আস্বাদন করতেন। এই শ্লোকসমূহে নামমাহাত্ম্য, বৈষ্ণব বিনয়, কৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি, দাস্যপ্রেম প্রভৃতির কথাই বলা হয়েছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের চরম সাধনা কি, সাধকের স্বরূপ কি হওয়া উচিত, সাধনায় সিদ্ধির লক্ষণ কি এবং সিদ্ধির নিষ্ঠার স্বরূপ কি—এই সব বিষয়ে শ্রীচৈতন্যদেবের নিজের কথা এই শ্লোকাষ্টকে এত সহজভাবে বিবৃত হয়েছে যে শ্রীচৈতন্যজীবনীর সঙ্গে যাঁর এতটুকু পরিচয় আছে তিনিই জানেন ঐ বাণী কত সত্য ছিল তাঁর জীবনে। এই শ্লোকগুলি লোকশিক্ষা দিতে পূর্বেই প্রভু কর্তৃক কথিত হয়েছিল—'পূর্বে অষ্ট শ্লোক করি লোকে শিক্ষা দিল।' অন্ত্যলীলায় শেষ দ্বাদশ বর্ষ যখন তাঁর বেশির ভাগ সময় কাটতো দিব্যোন্মত্ততায় তখন মাঝে মাঝে সেই 'অষ্টশ্লোকের অর্থ আপনে আস্বাদিল।'

বস্তুতঃ শ্রীচৈতন্যদেবের সমগ্রজীবন রাধাপ্রেমের ভাবব্যাখ্যা মাত্র। রাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করে 'কৃষ্ণস্বরূপ' গৌরচন্দ্রের আবির্ভাব হয়েছিল কৃষ্ণাবতারে অনাস্বাদিত রাধাপ্রেমের আস্বাদনের জন্য। সন্ন্যাসগ্রহণের পর গৌরাঙ্গের নতুন নামকরণ হয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। এই নামকরণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। পরবর্তী জীবনে যিনি ভারতবাসী তথা মানবজাতিকে কৃষ্ণ অর্থাৎ ঈশ্বর সম্পর্কে নতুন চেতনা দান করবেন—ধর্মাচরণের যথার্থ পথের সন্ধান দেবেন—ভগবৎ আরাধনায় মাধুর্য—রসাশ্রয়ী উপাসনা পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা করবেন তাঁর এর চেয়ে আর কি সার্থক নাম হতে পারে? শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে নতুন চৈতন্যদাতা বিশ্বম্ভরের জীবনে রাধাপ্রেমের যে আশ্চর্য অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায় তাই ষোড়শ শতকে সমগ্র উত্তর ভারতে বৈষ্ণবধর্ম তথা প্রেমধর্মের

নবপর্যায় সূচনা করেছে। বৈষ্ণব ভক্তি ধর্মের ইতিহাসের এই নতুন পর্যায়কে এক কথায় 'চৈতন্য রেনেসাঁস' বলা চলে। প্রাক্ চৈতন্য ভক্তি আন্দোলনের প্রধান উৎস যেমন শ্রীমদ্‌ভাগবত; চৈতন্যোত্তর ভক্তিধর্মের প্রধান উৎস তেমনি শ্রীচৈতন্য জীবন ও বাণী। অবশ্য চৈতন্যদেব তাঁর বাণী তথা উপদেশগুলির কথা নিজে কোথাও লিখে রেখে যান নি। সে কাজ করেছেন বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ—রূপ, সনাতন, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও শ্রীজীব গোস্বামী এবং তাঁদের বক্তব্যের সার সঙ্কলন করেছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ। তিনি আশ্চর্য দক্ষতায় চৈতন্যজীবনীর সঙ্গে মিলিয়ে তাঁর বাণীর ব্যাখ্যা করে ভক্তবৃন্দকে শুনিয়েছেন। চৈতন্যদেবের ভাবজীবন ও অধ্যাত্ম উপলব্ধির এমন সুন্দর ব্যাখ্যা—প্রেমধর্মের এমন আশ্চর্য বিশ্লেষণ অন্যত্র দুর্লভ। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মাদর্শ প্রতিষ্ঠার্থে বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ যে সব মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তা সংস্কৃতে রচিত হওয়ায় সাধারণ ভক্তের—স্বল্প শিক্ষিত, অশিক্ষিত জনগণের পক্ষে কার্যকরী হয়নি। 'চৈতন্যচরিতামৃত' বঙ্গ ভাষায় রচিত বলে সাধারণ ভক্তের পক্ষে সাধন পথে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে। শিক্ষিত বৈষ্ণব সমাজেও গ্রন্থখানি শাস্ত্রগ্রন্থরূপেই সমাদৃত হয়ে আসছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পরম জ্ঞাতব্য রসতত্ত্ব সম্পুট এই গ্রন্থখানি সম্যক অনুধাবন করতে পারলে প্রেমধর্ম প্রসঙ্গে 'সব কিছুই হৃদয়ঙ্গম করা যায়।[১]

১। লেখকের আসন্ন প্রকাশ 'শ্রীচৈতন্যচরিত ও বাণী' গ্রন্থে এই বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটক রচনার ধারায় "অচলায়তন"

দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

॥ ১ ॥

রবীন্দ্রনাথের লেখা রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলি বাংলা সাহিত্যের এক মহার্ঘ সম্পদ। একথা অতিশয় সত্য যে রবীন্দ্র-প্রতিভা গীতিকাব্যিক ও রোম্যান্টিক এবং একান্তভাবে তন্ময়-দৃষ্টিতে নাট্যঘটনা ও চরিত্র-রূপায়ণে তা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে না। ঘটনার তীব্র সংঘাত, চরিত্রের সুস্পষ্ট বহির্দ্বন্দ্ব ও গভীর অন্তর্দ্বন্দ্ব, ঘটনার ঘন ঘন চমক ও নাট্যবেগ সৃষ্টির দিকে তাঁর তেমন প্রবণতা নেই। তাঁর নাটকে এই সমস্ত অভাব পূরণ করা হয়েছে ভাবগত দ্বন্দ্ব, আত্মার আকুতি, অপরূপ সঙ্গীত, পরিবেশ-সৃষ্টি এবং ব্যঞ্জনাঢ্য কাব্যিক সংলাপের দ্বারা। অথবা এমনও বলা যায় নাট্যরচনায় তাঁর এ সমস্ত বৈশিষ্ট্য স্বাভাবিকভাবেই দেখা দিয়েছে। নাট্যবেগ, নাট্যদ্বন্দ্ব ও নাট্যচরিত্রগুলির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় প্রচলিত নাটকের নাটকীয়তা যে ভাবে লক্ষণীয় হয়ে ওঠে, তার দৃশ্যরূপ নাট্যবৃত্তকে সূচনা থেকে পরিণাম পর্যন্ত যেভাবে দর্শকদের কৌতূহল ও উৎকণ্ঠাকে জাগ্রত করে রাখে, রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ নাটকেই তার অভাব চোখে পড়ে। কিন্তু তাঁর রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলি এ সব বৈশিষ্ট্যে তেমন লক্ষণাক্রান্ত না হয়েও অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেছে। আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর নাটকগুলি তত্ত্ব-প্রধান। ভাবসংঘাত, কবিত্বময় ব্যঞ্জনাপূর্ণ সংলাপ এবং পরিবেশ-সৃজনের নৈপুণ্যে এক হিসেবে বৈচিত্র্যহীন শিথিলগতি বৃত্ত সৃষ্টি করেও স্বল্প দু' একবার ঘটনার চমকে এ নাটকগুলি আমাদের মনকে উদ্দিষ্ট রসলোকে পৌঁছে দিতে সমর্থ হয়। রূপক ও সংকেতের প্রয়োগে মায়াময় ও রহস্যময় এক রাজ্য সৃষ্টি ক'রে অন্তরের তাগিদে রচিত এই নাটকগুলিতে তিনি আমাদের আশা, বিশ্বাস ও পরমতম স্বস্তির দেশে পৌঁছে দিতে চেষ্টা করেছেন।

রূপক ও সংকেতের প্রয়োগ কিছু অভিনব ব্যাপার নয়। দৈনন্দিন জীবনে কথায়-বার্তায়, আলাপ-আলোচনায় জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে আমরা রূপক বা সংকেতের ব্যবহার করে থাকি। রূপকের আবরণে একটা বাইরের কাহিনীর অন্তরালে ভিতরের কাহিনী বলা যেতে পারে। আবার কোনো একটি বাক্যে উপমাকে সংহত করেও রূপক অলংকার সৃষ্টি করা যেতে পারে। কোনো একটা তত্ত্বকথাকেও রূপকের বাইরের কাহিনীর মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা যায়। সংকেত কিন্তু আগাগোড়া নিজের একক সহায়তায় কাহিনী সৃষ্টি করতে পারে না। সে শুধু ইঙ্গিত বা ইশারা করে কোনো কিছুর ব্যঞ্জনা দেয়। আর তার জন্যে এমন একটা বস্তুকে আশ্রয় করে, যার সাহায্যে ঐ ব্যঞ্জনা আভাসিত হয়ে ওঠে। ধর্মে, শিল্পে ও সাহিত্যে দীর্ঘকাল

ধরে রূপক বা সংকেতের ব্যবহার চলে আসছে। সাহিত্যে প্রাচীন ও মধ্যযুগে লেখকদের মানসিক প্রবণতা অনুযায়ী স্বাভাবিক ভাবেই রূপক-সংকেতের প্রয়োগ হয়েছিল। একটা কোনো গোষ্ঠী সচেতনভাবে সাহিত্যে এই ধারাটিকে তখন প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন নি। কিন্তু সাহিত্যে সচেতন ভাবেই এই ধারাটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে এর জয়গান করার আন্দোলন পাশ্চাত্যে উনিশ শতকে প্রথম দেখা দিয়েছিল। এর পিছনে একটুখানি ইতিহাস আছে। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে বিজ্ঞানের বস্তুবাদ ও যুক্তিবাদ জীবনে ও সাহিত্যে প্রবল প্রভাব বিস্তার করল। রহস্যময় ও দুর্জ্ঞেয় বিষয়কে যুক্তির আলোকে বোঝবার চেষ্টা হল, ধর্মের প্রতি ঔদাসীন্য লক্ষ্য করা গেল এবং আধ্যাত্মিক চিন্তায় আঘাত লাগল। বিজ্ঞানের প্রধান অস্ত্র যন্ত্রের মহিমা ঘোষিত হতে লাগল। মানুষ যন্ত্রসভ্যতার দাস হয়ে পড়ল—যন্ত্রের অধীন মানুষের জীবনে দুর্গতি দেখা দিতে থাকল। এরই বিরুদ্ধে তখন তলে তলে দেখা দিল প্রতিক্রিয়া। আর তারই ফল সাহিত্যে রূপক-সাংকেতিক আন্দোলন। রূপক ও সংকেতবাদী সাহিত্যিকেরা প্রত্যক্ষদৃষ্ট ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎকে মূল্যবান বলে মনে করলেন না। সৌন্দর্যের এক আদর্শলোক সম্পর্কে সুনিশ্চিত হয়ে তাঁরা সেই লোকের একনিষ্ঠ পূজারী হলেন। কোলাহলময় সংঘাতমুখর রাজনৈতিক ও সামাজিক জগৎ তাঁদের পছন্দ হল না। শান্ত সমাহিত চিত্তে আত্মবিভোরতা ও ধ্যান-মৌন প্রশান্তির জীবন তাঁদের কাম্য হয়ে উঠল। অধ্যাত্মবাদী দার্শনিক, শিল্পী ও সমালোচকগণ বস্তুবাদী দর্শন ও সাহিত্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ রচনা করতে গিয়েই এই সাংকেতিক আন্দোলনকে নূতনভাবে সৃষ্টি করলেন। দার্শনিকেরা অতীন্দ্রিয় সত্তার অস্তিত্ব ও দিব্যদৃষ্টির মহিমা ঘোষণা করলেন আর সাহিত্যিকগণ অতীন্দ্রিয় অনুভূতির অনির্বচনীয় জগৎকে আভাসিত করলেন। আর এরই প্রয়োজনে রূপক ও সংকেতরীতির আশ্রয় গ্রহণ অনিবার্য হয়ে উঠল। ফ্রান্সের বোদলেয়ার, ম্যালার্মে প্রমুখ সাহিত্যিকবৃন্দ সৌন্দর্যের রাজ্যকেই সর্বস্বজ্ঞান করেছিলেন। মেটারলিঙ্ক, ইবসেন স্ট্রীণ্ডবার্গ প্রভৃতি সাহিত্যিকদের চেষ্টায় সংকেতবাদ আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। বোদলেয়ারের 'লা ভয়েজ', মেটারলিঙ্কের 'ব্লুবার্ড', ইবসেনের 'ওয়াইল্ড ডাক', 'পিয়ারগিন্ট,' হাউপ্টম্যানের 'সাঙ্কেন বেল' প্রভৃতি এই শ্রেণীর প্রসিদ্ধ রচনা। সংকেতের সাহায্যে ইন্দ্রিয়াতীত রাজ্যের ইশারা, অধ্যাত্ম জগতের আভাস, অহংকে বর্জন করে সত্যের জগতে উপনীত হওয়ার ব্যঞ্জনা—প্রভৃতি এঁদের সাহিত্যে লক্ষ্য করা যায়।

পাশ্চাত্যের এই সংকেতবাদী আন্দোলনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষভাবে কোনো যোগ না থাকলেও এর স্বরূপ তিনি ভালোভাবেই জানতেন। মেটারলিঙ্ক, সীঞ্জ, স্ট্রীণ্ডবার্গ, ইয়েটস প্রমুখদের রচিত এ ধরণের সাহিত্যের সঙ্গেও তিনি বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু এঁদের সৃষ্ট আন্দোলন ও রচিত সাহিত্য থেকে সাক্ষাৎ প্রেরণালাভ করে তিনি এঁদেরই আদর্শে রূপক-সাংকেতিক নাট্যরচনায় আত্মনিয়োগ করেন—একথা বললে যথার্থ সত্যের অপলাপ করাই হয়। আমরা

জানি, কবি হিসেবে রবীন্দ্রনাথ জন্মরোম্যান্টিক। উপনিষদের অধ্যাত্মরসে তাঁর মন ছিল বরাবর লালিত। খেয়া, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি প্রভৃতি কাব্যে তাঁর অধ্যাত্মরাজ্যে বিচরণের স্ফূর্তি লক্ষণীয়। রোম্যান্টিক মনোভাবেরই একদিক থেকে ক্রম-পরিণতি হল মিস্টিকবোধ ও রূপক-সংকেত রীতির প্রতি পক্ষপাত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজ স্বভাবধর্মবশেই রূপক-সাংকেতিক নাট্যরচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনি ছিলেন গভীরভাবে আস্তিক—পরম মঙ্গলময় ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও তাঁর মঙ্গলময় বিধি-বিধানের প্রতি গভীর আস্থা তাঁর কোনোদিন টলে নি। যুগ যুগ ধরে অধ্যাত্ম সাধনার ঐতিহ্যবাহী এই ভারতবর্ষের কবি রবীন্দ্রনাথ নিজ পারিবারিক আবহাওয়ায় উপনিষদের ব্রহ্মবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এই অসীম, অরূপ অনির্বচনীয় ঈশ্বরকে উপলব্ধির জন্যে কেমন বোধি-দৃষ্টির প্রয়োজন, প্রকৃতি ও মানব-রাজ্যে তাঁর প্রকাশ কেমন, কীভাবে মানুষের কাছে তাঁর আহ্বান আসে, সে আহ্বানে মানুষ কীরূপ চঞ্চল হয়ে ওঠে, এসব কথা যেমন তিনি রূপক-সংকেতের আশ্রয়ে নাটকে বোঝাতে চেয়েছেন, তেমনি আপাত-মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবনের অব্যাহত ধারা ও তার নবীনত্ব—কেমন করে অটুট থাকছে, লোভ, স্বার্থপরতা ও জাতিবৈরিতার উন্মত্ততায় মানুষ শুভ চেতনাকে হারিয়ে কীভাবে যন্ত্রের দাসত্ব করে এবং শেষ পর্যন্ত প্রাণের বিনিময়ে যন্ত্রকে আঘাত ক'রে তার শুভ বোধকে জাগ্রত করতে হয়, আবার প্রাণের সহজ আনন্দকে হারিয়ে মানুষ কীভাবে যন্ত্রের সহায়তায় বস্তুসঞ্চয়ের নেশায় মেতে ওঠে এবং তাতে অন্যের সঙ্গে নিজের চূড়ান্ত সর্বনাশ ঘনিয়ে তোলে এবং শেষ পর্যন্ত কীভাবে তাকে মুক্তি পেতে হয়, তাও তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন। প্রাণহীন মিথ্যা আচার-অনুষ্ঠান, অন্ধ কুসংস্কারের আবর্জনা কীভাবে একটা দেশ ও জাতির সর্বাত্মক ধ্বংসকে ডেকে আনে এবং কেমন করেই বা সেই সংকট থেকে মুক্তিলাভ করতে হয়, সমাজের অসাম্য-বৈষম্য শ্রেণীসম্পর্ককে বিষিয়ে তুললে সমাজের অগ্রগতির রথ কেমন অচল হয়ে পড়ে, আর তখন নূতন সারথির আবির্ভাবের কীরকম প্রয়োজন হয়—তাঁর নাটকে তারও ইঙ্গিত আছে। 'শারদোৎসব' নাটক থেকেই রবীন্দ্রনাথের রূপক সাংকেতিক নাটক লেখার সূচনা এবং রাজা, অচলায়তন, ডাকঘর, ফাল্গুনী, মুক্তধারা, রক্তকরবী, রথের রশি ও তাসের দেশ-এর মধ্য দিয়ে এ ধারার পরিণতি।

পাশ্চাত্যের সংকেতবাদী সাহিত্যিকদের রচনারীতি রবীন্দ্রনাথের ওপর কিছু প্রভাব ফেলেছে এবং তাঁদের রচিত সাহিত্যধারা তাঁর মানসানুকূল স্বকীয় প্রবণতাকে অনেকখানি পুষ্ট করেছে এ সত্য স্বীকার করতে কোনো বাধা নেই। কিন্তু মনে রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথের এ জাতের রচনার সঙ্গে পাশ্চাত্য সংকেতবাদীদের রচনায় পার্থক্যও আছে। যে গভীরতম বিশ্বাস ও আশাবাদ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকে অধ্যাত্মরাজ্যের আভাস দিয়েছেন, সেই বিশ্বাস ও জোর পাশ্চাত্যের লেখকদের মধ্যে তেমন মেলে না। এই শ্রেণীর সাহিত্যসৃষ্টিতে যে রকম মানসিক স্বস্তি ও প্রশান্তি

রবীন্দ্রনাথে পাই, তা পাশ্চাত্যে নাট্যকারদের রচনায় দুর্লভ। জীবনের গূঢ়-গভীর সমস্যার সমাধান সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্যের সঙ্গে বা সমাধানের পথ সম্পর্কে ধারণার সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের সাদৃশ্য নেই। মানুষের আত্মিক কল্যাণ ও আত্মিক মুক্তির দিকে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সদাজাগ্রত। অশুভ চেতনা প্রাধান্য পেলে, সহজ দৃষ্টির অভাব ঘটলে এবং অহমিকা প্রশ্রয় পেলে অকল্যাণ মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। এ অকল্যাণ দেশ ও জাতির পক্ষেই শুধু মারাত্মক নয়, শাসকের পক্ষেও।

সাধারণভাবে রবীন্দ্রনাথের এই নাটকগুলি সম্পর্কে এই ভূমিকাটুকু মনে রেখে এই শ্রেণীর তাঁর যে কোনো নাটক পাঠ করা যেতে পারে, বা তার অভিনয় দেখা যেতে পারে। আপাতত আমরা তাঁর 'অচলায়তন' নাটকটির বিশদ আলোচনা করতে চাই।

। ২ ।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুন শিলাইদহে অবস্থানকালে রবীন্দ্রনাথ 'অচলায়তন' নাটকটি লেখেন। তিনমাস পরে 'প্রবাসী'র পূজা সংখ্যায় রচনাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। পরের বছর অর্থাৎ ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে 'অচলায়তন' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। 'প্রবাসী'তে প্রকাশের সময় নাটকটি বিখ্যাত ঐতিহাসিক ৺যদুনাথ সরকারের নামে উৎসর্গিত হয়, গ্রন্থ-প্রকাশকালে কিন্তু ঐ উৎসর্গ আর ছিল না। যদুনাথ সরকারকে কেনই বা উৎসর্গিত হয়েছিল এবং কেনই বা পরে ঐ উৎসর্গ আর দেখা গেল না—তার কোনো সদুত্তর দেওয়া কঠিন। ব্যক্তিগত কোনো কারণ থাকাও সম্ভব, এবং সে বিষয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যখন নীরব, তখন বৃথা গবেষণা অর্থহীন। সে যাই হোক, 'অচলায়তন' তত্ত্ব-মুখ্য নাটক এবং রূপক-সাংকেতিক রীতিতে এটি রচিত। ঘটনা ও চরিত্রের আশ্রয়ে এর তত্ত্বকথাকে যে-ভাবে রূপ দেওয়া হয়েছে, তাতে এর প্রতিপাদ্য বিষয়টি নাট্য-ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একটি নির্দিষ্ট পরিণাম লাভ করেছে। তবে প্রচলিত নাটকে নাট্য ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া পাত্র-পাত্রী ও ঘটনাকে আশ্রয় করে যে ভাবে ফুটে ওঠে, সাংকেতিক নাটকে তা লক্ষ্যগোচর হয় না। এখানকার প্রধান চরিত্রগুলি পুরোপুরি বাস্তব হয় না—বাস্তবে, সংকেতে রূপকে মিশ্রিত হয়ে নূতন তাৎপর্য লাভ করে। আবার এর নাট্যবৃত্তটি প্রচলিত সাধারণ নাটকের মতো ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে ঘন ঘন চঞ্চল হয়ে ওঠেনা—তথাপি নাট্যকার মাঝে মাঝে ঘটনায় চাঞ্চল্য আনার চেষ্টা করেন—এখানে বিশেষ ভাবে পরিবেশ বা আবহাওয়া-সৃষ্টির দিকে তাঁর দৃষ্টি থাকে—যে আবহাওয়া সাংকেতিক নাটকের অনুকূল। ঘটনার আবর্তনমুখ (Turning point) এখানেও থাকে তবে প্রচলিত নাটকের মতো Exposition, Rising action-এর স্পষ্ট পথ ধরে climax আসেনা। তাই এ জাতের নাটককে একটু বিশেষভাবেই বিচার করতে

হবে। ঘটনার শ্লথগতি এবং অজস্র ঘটনার সমাবেশে বৈচিত্র্যহীনতার অভিযোগ এনে এর নাট্যবৃত্তকে ত্রুটিপূর্ণ বলে রায় দেওয়া সমীচীন হবে না।

'অচলায়তন'-এর নাট্যবৃত্তটি বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে। এর ছ'টি দৃশ্যের মধ্যে প্রথম দৃশ্যটি হল 'অচলায়তনের গৃহ'। দুই ভ্রাতার মধ্যে যে আদর্শগত বিরোধ এবং যার ঘনীভূত মুহূর্তে গুরুর আবির্ভাব ও সমস্ত বিবোধের অবসান, সেই দ্বন্দ্বের আভাস দিয়েই এর নাট্যঘটনার সূচনা। নাটকের শুরুতেই পঞ্চকের গানেই বোঝা যায় যে এই অচলায়তনের মধ্যে সে অস্বস্তিবোধ করছে—কার যেন ডাকে তার প্রাণে সাড়া জেগেছে। তার অগ্রজ মহাপঞ্চক যে-ভাবে মন্ত্রতন্ত্র ও সূত্রবৃত্তি অনুশীলন করতে বলেন, তা তার একেবারেই ভালো লাগে না। তার গানে মহাপঞ্চক অসন্তুষ্ট হয়ে পুনরায় তাকে নতুন করে "ওঁ তট তট তোতয় তোতয়, স্ফট স্ফট স্ফোটয়" ইত্যাদি মন্ত্র ৬৯ বার জপ করতে আদেশ করেন। পঞ্চক চেষ্টা করে, কিন্তু কিছুতেই তার প্রাণ সায় দেয় না। শাস্ত্রপাঠ ও শাস্ত্রজ্ঞানে আয়তনের কতো বালক তার থেকে অগ্রসর হয়ে গেলেও পঞ্চকের কোনো দুঃখ নেই। এই বালকদের কাছে ও মহাপঞ্চকের কাছে পঞ্চক শুনেছে যে আয়তনে শীঘ্রই গুরু আসছেন। এর জন্যে কোনোরকম প্রস্তুতির সে প্রয়োজন মনে করে না। এই সময় সুভদ্র নামে একটি বালকের আচরণকে কেন্দ্র করে নাট্য ঘটনাধারায় বেগ সঞ্চারিত হয়। সুভদ্র আয়তনের উত্তর দিকের জানালা খুলে কিছুক্ষণের জন্যে বাইরের আকাশ দেখে ফেলেছে—এই অপরাধে সে অবশ্য নিজেই মানসিক দ্বন্দ্বে কষ্ট পাচ্ছে। কিন্তু পঞ্চক তাকে আশ্বাস দিয়ে বলে যে এতে তার কোনো পাপ হয়নি। সে নিজেই একবার ঐ জানালা খুলতে ইচ্ছুক। পঞ্চকের আচরণে এখানকার কিছু কিছু বালক দুর্বিনীত হয়ে পড়ছে বলে উপাধ্যায় মনে করেন। কিন্তু এদিকে দেখা গেল আচার্য অদীনপুণ্য আয়তনের কঠোর নিয়ম-কানুন ও মন্ত্রতন্ত্রের প্রতি অন্ধ আনুগত্যের বিরোধী। বিশেষত গুরু আসছেন বলে চিঠি পাওয়ার পর থেকে তাঁর মনেও ভাবান্তর দেখা দিয়েছে। এখানে প্রথম আসার সময় যে উৎসাহ ছিল, তা আর নেই। এখানে তাঁরা আসল লক্ষ্যটা ভুলেছেন—সাধনা তাই ব্যর্থ হতে চলেছে। এখানে একমাত্র সত্য যে ঐ পঞ্চক—এই কথাই তাঁর মনে হয়। প্রাচীন আচার আর মন্ত্রের চেয়ে মানুষের মন যে সত্য তার প্রমাণ ঐ পঞ্চক। অথচ তিনি নিজেও এই আয়তনে বদ্ধ। তাই তাঁর ভিতরেও দেখা দিয়েছে নিদারুণ অন্তর্দ্বন্দ্ব।

মহাপঞ্চক সুভদ্রকে শাস্তিস্বরূপ ছ'মাস মহাতামস সাধন করার যে নির্দেশ দিয়েছেন তাতে আচার্য ক্ষুব্ধ। তিনি পাপী মনে করেন মহাপঞ্চককেই। সুভদ্রের ব্যাপারে আচার্য যে সব কথা বলেছেন, তাতে আয়তন হয়েছে অপবিত্র। মহাপঞ্চক ও উপাধ্যায় যে-ভাবেই হোক অশৌচ থেকে একে রক্ষা করবেন। এদিকে আচার্যের দলে উপাধ্যায়ও এসে যোগদান করলেন। এইখানেই প্রথম দৃশ্যের ঘটনা সমাপ্ত হয়েছে।

পাহাড়-মাঠের নূতন একটি দৃশ্যে পথে আবার দেখা যায় পঞ্চককে। সে গান গাইছে। এই পথ ধরে কে যেন আসে যায় বলে তার বিশ্বাস। তাঁর বাণী আর মুখের হাসিটি শোনবার জন্যে সে যে ব্যাকুল। পেছন থেকে শোনপাংশু জাতির দল তাকে ঘিরে নৃত্য শুরু করে দেয়। এরা খুবই অস্থির, কর্মঠ ও পরিশ্রমী। এরা পঞ্চকদের কাছে অস্পৃশ্য। এদের কোনো গুরু নেই—আছে দাদাঠাকুর। তাই পঞ্চকের মুখে গুরুর-কথায় তারা উৎসাহ বোধ করে, মন্ত্র নিতেও কারো কারো সাধ হয়। অস্পৃশ্য বলে একটা দীনতা বোধও আছে তাদের। এরা মার খেলে ফিরিয়ে মার দিতে জানে। এদের চঞ্চলতা-অস্থিরতা, কাজ করার গান ও স্বাধীনতা পঞ্চকের খুব ভালো লাগে। শোণপাংশুদের দাদাঠাকুর, যিনি সব দলের শতদলপদ্ম তিনি হঠাৎ এসে উপস্থিত হন। তাঁর সঙ্গে পৃথক ভাবে পঞ্চকের কিছু কথা হয়। ঠাকুরদা জানান তাঁর হৃদয়ে স্নেহ যখন ধরেনা, তখন তা হয়ে ওঠে ভক্তি, তাই তাঁর আশীর্বাদ ভক্তিরই নামান্তর। মহাপঞ্চক সব কিছুকে দূর করে দিয়ে আসল জিনিসকেও পেতে বলেন, কিন্তু ঠাকুরদারও যিনি দাদা, তিনি বলেন যখন সব কিছুকেই পাই, তখন আসল জিনিসকেও পাই। ঠাকুরদা বলেন পরমপুরুষ যাকে ঘরছাড়া করেন, তাকে হাত বাড়িয়ে ঘরেও ডাকেন। মানুষকে ভয়-মুক্ত করার যাদু তিনি জানেন। শোণপাংশুরা অত্যন্ত কাছে থেকেও ঠিক তাঁকে পায়নি। ঠাকুরদার কথায় পঞ্চকের সমস্ত চিত্ত উতলা হয়ে ওঠে। এম্নিভাবে পঞ্চক ও দাদাঠাকুরের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে নাট্যঘটনা যখন অনেকখানি স্তিমিত হয়ে আসছিল, তখন সুন্দর ভাবে তাতে গতিবেগ আনা হল একটি ছোট্ট অথচ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায়। একদল শোণপাংশু খবর নিয়ে আসে যে তাদের চণ্ডককে পঞ্চকদের রাজা মেরে ফেলেছে। চণ্ডক বনের মধ্যে স্থবিরক হয়ে ওঠবার জন্যে তপস্যা করছিল, এই তার অপরাধ। তাই স্থবিরপত্তনের রাজা মন্থরগুপ্ত পূর্বের ৩৫ হতে প্রাচীর ৮০ হাত উঁচু করে তুলে দিচ্ছেন। ১০ জন শোণপাংশুকে বলি দেবার জন্যে হয়তো ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঠাকুরদা জানান, ওদের পাপ প্রাচীরের আকার ধারণ করে আকাশের জ্যোতি আচ্ছন্ন করলে তাঁর রাজার আদেশে তাকে ধূলোয় লুটিয়ে দিতে হবে। আর শোণপাংশুদের সাহায্যেই তা করা হবে। চঞ্চল হয়ে ওঠে শোণপাংশুর দল। এখানেই দ্বিতীয় দৃশ্যের সমাপ্তি।

ওদিকে আর একটি দৃশ্যে অচলায়তনে নাট্যঘটনার বেগ তীব্র হয়ে উঠেছে। আচার্য্য অদীনপুণ্যের আচরণে অনেকেই ক্ষুব্ধ। সুভদ্রকে মহাতামসে বসাতে দেয়নি পঞ্চক যাঁর প্রশ্রয়ে, তিনি হচ্ছেন আচার্য। মহাপঞ্চক, আচার্যকে ঘরে বন্দী করে রাখার কথা যখন বলছেন, তখন আকস্মিক ভাবে সেখানে আচার্য এসে উপস্থিত হন। তিনি নিজের অপরাধ স্বীকার করেও জানান যে তাঁর হৃদয় শুকিয়ে উঠেছে, রসের জন্য তিনি লালায়িত। হৃদয়ের বাণী নিয়ে কখন গুরুর আবির্ভাব ঘটবে তারই প্রতীক্ষায় আছেন তিনি। পঞ্চক এসে জানায় সেও ঐ একই পথের পথিক। মহাপঞ্চক ভ্রাতা

পঞ্চককে 'নির্লজ্জ বানর' বলেন। একজটা দেবীর শাপে এ আয়তনের আজ এমন শোচনীয় অবস্থা—একটা পাথরও থাকবে না। সর্বনাশ শুরু হয়েছে—নাচবার দিন আজ নয়। শুভদ্রকে শাস্তি দিতেই হবে। সে শাস্তি নিতে না পারার জন্যই চরমতম অন্তর্দ্বন্দ্বে পীড়িত।

কিন্তু আচার্য কিছুতেই সুভদ্রকে মহাতামসে বসতে দেবেন না। কেউ সাহসী না হলে মহাপঞ্চক নিজেই আচার্যকে শাস্তি দেবেন ঠিক করলেন। এমন সময় স্থবির-পত্তনের রাজা আসছেন এই খবর এল। তিনি প্রত্যন্ত দেশের দূতের মুখে খবর পেয়েছেন যে দাদাঠাকুরের দল শোণপাংশুরা তাঁর রাজ্যসীমার প্রাচীর ভাঙতে শুরু করেছে। নিশ্চয়ই মহাপঞ্চকের মন্ত্রোচ্চারণ অশুদ্ধ হয়েছে কিংবা ক্রিয়া পদ্ধতিতে স্খলন হয়েছে। মহাপঞ্চক জানান একজটা দেবীর শাপে এমন ঘটেছে। সুভদ্র পাপ করেছে। তাকে শাস্তি দিতে দিচ্ছেন না আচার্য। ক্রুদ্ধ রাজা আদেশ দিলেন আচার্যকে দর্ভকপাড়ায় কিছুদিন রুদ্ধ করে রাখতে হবে এবং মহাপঞ্চকই হবেন তাঁর আদেশে আচার্য। মহাপঞ্চক সেই সঙ্গে ঐ অনাচারী দর্ভকদের পাড়ায় ভ্রাতা পঞ্চককেও নির্বাসন দিলেন। সকলকে আশ্বাস দিয়ে তিনি জানালেন যে যুদ্ধে তাঁদের জয় অনিবার্য।

পরবর্তী দৃশ্যে দর্ভকপল্লীতে নাট্যঘটনা শুরু হয়েছে। দর্ভকদের সঙ্গে পঞ্চকের কথা চলছে। দর্ভকেরা নীচ ও অস্পৃশ্য জাতি। তারা মন্ত্র বা ব্রতের ধার ধারে না। নামগান নিয়েই তারা আনন্দিত। অকূলের কূল, অগতির গতি পরাণের বঁধু, অনাথের নাথ যিনি তাঁরই কথা তারা গান করে। তবুও মন্ত্রের প্রতি তাদেরও একটা কৌতূহল আছে। মন্ত্র পড়ে তাদের বাপ-পিতামহকে পঞ্চকেরা উদ্ধার করে দিক—এ ইচ্ছাও তাদের হয়। এদের গান শিখতে আগ্রহ হয় পঞ্চকের। এরা গান ধরে। এমন সময় আচার্য এসে উপস্থিত হন। তাঁর আগমনে দর্ভকদের পাড়া সার্থক হয়েছে বলে মনে করে। আচার্য কাল রাত্রিতে এখানে এসেছেন। প্রথমে একটু কুণ্ঠিত ছিলেন, কিন্তু সন্ধ্যের সময় কাজ থেকে ফিরে ওদের গান যখন তিনি শুনলেন, তখন থেকেই তাঁর সব সংকোচ কেটে গেছে। পারের কাণ্ডারীর খেয়ায় চড়ে বসা যে কতো সহজ ওদের গানে তিনি বুঝেছেন। গুরু এসে কখন প্রাণটাকে সরল করে সকলের সঙ্গে মিশিয়ে দেবেন—এই চিন্তার মধ্য দিয়েই তিনি গুরুর প্রতীক্ষা করছেন। পঞ্চক ভিজে মাটির গন্ধ পায় ও আসন্ন বর্ষণের আভাস পায়। আচার্য শোনেন সুভদ্রের কান্না। ওরা দেবতাকে কাঁদাচ্ছে ওদের পাষাণের বেড়া শীঘ্রই শতধা বিদীর্ণ হবে বলে তাঁর বিশ্বাস। শাস্ত্রকীট মহাপঞ্চককে ত্যাগ করে উপাচার্যও সেখানে আসেন। পঞ্চক দেখে চারদিকে মেঘ, বজ্রের পর বজ্রের শব্দ, আচার্য দেখেন বৃষ্টি নেমে গেছে। কেয়া ফুল ও কদম ফুল নিয়ে দর্ভকদল প্রবেশ করে। মাদল বাজিয়ে নাচগান শুরু হয়। আচার্য বজ্ররবে যিনি ডাক দিয়েছেন তাঁকে ঘরে ডেকে নিতে বলেন। গুরুর আবির্ভাবের লগ্নকে এইভাবে রবীন্দ্রনাথ প্রস্তুত করে নিয়েছেন।

ঘটনাধারার চূড়ান্ত অবস্থা এল এই ৫ম দৃশ্যে অচলায়তন-এ। এখানে মহাপঞ্চক, তৃণাঞ্জন, সঞ্জীব, বিশ্বম্ভর ও জয়োত্তম। তৃণাঞ্জন খবর পেয়েছে যে শত্রুসৈন্য অচলায়তনের প্রাচীর ফুটো করে দিয়েছে। মহাপঞ্চক তা বিশ্বাস করেন না। গুরুর আবির্ভাবকাল আসন্ন। তাঁকে দ্বারে অভ্যর্থনা করার যোগ্য লোক এখনও মেলেনি বলে মহাপঞ্চক চিন্তিত। এমন সময় উপাধ্যায় এসে জানান যে দ্বারের চিহ্নমাত্রও আর নেই। সঞ্জীব বলে আয়তনের কোনো বিপদ হলে তারা মহাপঞ্চককে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবে—কেননা তিনিই আচার্যকে তাড়িয়েছেন। মহাপঞ্চক তখনও আশ্বাস দেন কোনো ভয় নেই। একজটা দেবীর কাছে তৃণাঞ্জন মহাপঞ্চককে বলি দিতে চায়—তাতেও তিনি ভীত নন। আলো দেখে পাখির ডাক শুনে বালকের দল উল্লসিত ও নৃত্যশীল। তাদের মনে হয় আজ যেন ছুটি। শঙ্খবাদক ও মালী গুরুর আগমনবার্তা নিয়ে ঠিক এই সময়েই আসেন। এই লগ্নেই যোদ্ধবেশে দাদাঠাকুরের প্রবেশ। মহাপঞ্চককে তিনি জানান যে তিনিই গুরু। মহাপঞ্চক লড়াই করবেন বলে শত্রুবেশেই তাঁর আগমন। তাঁর প্রবেশের পথ রাখা হয়নি বলে তিনি প্রাচীর ভেঙেছেন। তিনি প্রণাম নেবেন না—প্রণত করাবেন মহাপঞ্চককে। তিনি পুজো নিতে আসেন নি—এসেছেন অপমান নিতে। তাঁর অনুবর্তী শোণপাংশু দল গান ধরে। মহাপঞ্চকের রূঢ় বাক্যে শোণপাংশুরা তাঁকে হত্যা করতে চাইলে দাদাঠাকুর জানালেন যে ওকে বন্দী করা যাবে না। ও যেখানে বসেছে, সেখানে তলোয়ার পৌঁছায় না। আয়তনের বালকেরা গুরু বলে দাদাঠাকুরকে মেনে নেয়। সব বিরোধের, সব পাপের সব ভুল বোঝাবুঝির অবসান এখানেই।

এরপর ষষ্ঠদৃশ্যে দর্ভকপল্লীতে যখন পঞ্চক আচার্য ও দর্ভকদের মধ্যে কথা চলছিল অচলায়তনে যুদ্ধ সম্বন্ধে, তখন সেখানে দাকুরদাদাও গিয়ে উপস্থিত হন।

সমস্ত ছড়ানো ঘটনাকে একত্র করে একটি পরিণামের মধ্যে নাটকের মূল বক্তব্যকে স্পষ্ট করে তোলার দায়িত্ব এখন নাট্যকারের। দাদাঠাকুরের সাহায্যে সে কাজটি সম্পন্ন হয়েছে। তিনি আচার্যকে জানান যে তাঁকে আর কোনো কাজ করতে হবে না, তিনি দাদাঠাকুরের এখন থেকে সঙ্গী হবেন।—বড় রাস্তার মাঝখানে পরম-পুরুষের সঙ্গে মিলন হবে তাঁর। পঞ্চককে ঐ অচলায়তনেই যেতে হবে। সেখানকার ভাঙা কারাগারের পুরাতন উপকরণগুলি নিয়ে নতুন মন্দির গড়ে তোলাব ভার তারই ওপর। এখন আর সেখানে শান্তি থাকবে না—তার দ্বার ফুটো করে দিয়ে তিনি সেখানে লড়াইএর ঝড়ো হাওয়া এনে দিয়েছেন। যে যেখানে আছে সবাইকে ডেকে আনার ভার পঞ্চকের ওপর। সবাইকে না কুলোলে আবার দেওয়াল ভাঙতে হবে—তাই সেই বুঝে তাকে গাঁথতে হবে। শোণপাংশুদেরও ডেকে এনে বসাতে হবে, ওরা বসতে শিখুক। মহাপঞ্চকের অধীনে ওদের কিছুদিন রাখলে ওরা শান্ত হয়ে উঠে পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারবে। আলোতে মহাপঞ্চকের দৃষ্টি খুলে গেছে—সে আজ আর সে-মানুষ নেই। কী করে আপনাকে আপনি ছাড়িয়ে উঠতে হয় সেইটে

শেখানোর ভার ওর ওপর। সুভদ্রকেও ঠাকুরদা জানালেন যে সে পাপমুক্ত। তার মনের সমস্ত আত্মগ্লানি কেটে গেল। যুদ্ধের রাত্রে স্থবিরদের রক্তের সঙ্গে শোণপাংশুর রক্ত মিশে গেছে। কিন্তু ঐখানেই শেষ নয়। "এবার আর কাল নয়, এবার একেবারে শুভ্র। নূতন সৌধের সাদা ভিতকে আকাশের আলোর মধ্যে অভ্রভেদী করে দাঁড় করাতে হবে। গুরুকে প্রণাম করে, আচার্যদেবের কাছে আশীর্বাদ ভিক্ষা করে পঞ্চকের সঙ্গে শোণপাংশুর দল নতুন সৌধ নির্মাণে লেগে গেল। এইখানেই নাট্যঘটনার শেষ। বলা বাহুল্য এ দৃশ্যে নাট্যঘটনার ব্যাখ্যাতা দাদাঠাকুর।

মহাপঞ্চক ও পঞ্চকের আদর্শগত পার্থক্যকে অবলম্বন করে যে বিরোধের সূত্রপাত হয়েছিল, সুভদ্রকে শাস্তি দেওয়ার ঘটনায় তা তীব্রতা প্রাপ্ত হয় এবং পরে ঐ বিরোধ মহাপঞ্চকের সঙ্গে আচার্যেরও বিরোধে পরিণত হয়। আচার্যের পাশে উপাচার্যও এসে দাঁড়ান। একদিকে মহাপঞ্চক ও তাঁর অনুগামী কয়েকজন আচারসর্বস্ব মন্ত্রতন্ত্র ব্রত-উপবাসে অন্ধ-বিশ্বাসী ব্যক্তি, অন্যদিকে পঞ্চক, আচার্য ও উপাচার্য। এই বিরোধে বাইরের একটি ঘটনাও ইন্ধন যোগায়। শোণপাংশু চণ্ডককে স্থবির পত্তনের রাজার হত্যায় ও কয়েকজনকে আটকে। শোণপাংশুরা ঐ রাজার অচলায়তনকে আক্রমণ করবার জন্যে প্রস্তুত হয়েই ছিল। দাদাঠাকুর এদেরই সহায়তায় এবং নিজে যোদ্ধৃবেশে অচলায়তনের প্রাচীরকে ধূলোয় গুঁড়িয়ে দেন। অচলায়তনের শাস্ত্র-শাসনের বাড়াবাড়ি গুরু দাদাঠাকুরেরও অভিপ্রেত ছিল না। নাট্যঘটনার পাঁচটি পর্ব এখানেও লক্ষ্য করা যেতে পারে। প্রথম দৃশ্যেই নাট্যঘটনার পূর্বাভাস ও প্রধান চরিত্রগুলি সম্পর্কে একটা ধারণাও যেমন আছে, তেমনি সুভদ্রকে কেন্দ্র করে ঘটনার বেগ সঞ্চার ও আচার্যের মনে গুরুর আগমন সংবাদে এবং সুভদ্রকে শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে তাতে নাট্যঘটনা যথেষ্ট জটিলতা প্রাপ্ত হয়ে অগ্রসর হয়েছে। তত্ত্বালোচনার আধিক্যে মাঝে মাঝে ঘটনাস্রোত মন্থর হয়ে পড়লেও রবীন্দ্রনাথ নূতন ঘটনা বা পরিস্থিতির সৃষ্টি করে বেগকে অব্যাহত রাখার চেষ্টা করেছেন। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দৃশ্য জুড়ে চলেছে ঘটনার অগ্রগতি, চতুর্থ দৃশ্যের শেষে রাজার আগমনে ও আচার্যকে দর্ভকপাড়ায় প্রেরণে ও পঞ্চকের নির্বাসনে ঘটনা যথেষ্ট বেগলাভ করেছে এবং পঞ্চমদৃশ্যে গুরুর আবির্ভাবে ও মহাপঞ্চকের শেষ পর্যন্ত পরাভবে ঘটনার চূড়ান্তপর্যায় এবং আবর্তনমুখ। তারপরেই ষষ্ঠ দৃশ্যে ঘটনার অবরোহ ও পরিণাম। এই পরিণাম অবশ্য যতখানি বোঝানো হয়েছে, ততখানি দেখানো হয় নি।

॥ ৩ ॥

অচলায়তন নাটকটিতে রবীন্দ্রনাথ যে তত্ত্বকথাটি বলতে চেয়েছেন তা কি? তত্ত্বটিকে না বুঝে নাটকটি হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। এ ব্যাপারে প্রথমেই বলি নিছক জ্ঞানমার্গে অধ্যাত্ম-সাধনার ত্রুটি এবং কীভাবে সেই ত্রুটি থেকে মুক্ত হওয়া যায় তারই

পন্থা নির্দেশিত হয়েছে অচলায়তন নাটকে। এই পন্থা স্থির হয়ে গেলে জীবনচর্চাও সুস্থ ও স্বাভাবিক হবে। অচলায়তন স্থবিরপত্তন-রাজ্যের অন্তর্গত একটি শিক্ষায়তন। এখানে বহু ছাত্র, বহু বালক এবং বহু শিক্ষার্থী, আচার্য, উপাধ্যক্ষ ও সর্বোপরি মহাপঞ্চকের উপদেশ-নির্দেশ ও আদর্শে শিক্ষালাভ করছে। মহাপঞ্চক শাস্ত্রবিৎ, জ্ঞানী ও পুঁথিগত শাস্ত্রীয় বিদ্যায় অদ্বিতীয়। স্মৃতির অনুশাসন, মন্ত্রতন্ত্রের শক্তি, ব্রত-উপবাসের মহিমা, জপতপের শুভফল প্রভৃতি সম্পর্কে তাঁর যে জ্ঞান তা কারো নেই। শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ ও নিয়ম কানুনগুলি যাতে কঠোরভাবে রক্ষিত হয়, সেদিকে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি। জ্ঞানের পথে, শাস্ত্রের পথে অধ্যাত্ম-সাধনার সূত্রপাত এখানে হয়েছিল বহু পূর্বে এবং গুরুর নির্দেশেই আচার্য এখানে সেই সাধনার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু ক্রমশ দেখা গেল বিধিনিষেধ ও নিয়মকানুনের জালে সকলেই প্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। লক্ষ্যকে ভুলে গিয়ে উপায়গুলোকেই বড় করে তোলা হয়েছে। সাধনা ব্যর্থ হয়ে চলেছে। বাইরের সঙ্গে সব যোগ হারিয়েছে ঐ আয়তন। তাদের অতিনিকটে বাস করে যে দর্ভকের দল তাদের অস্পৃশ্য ও অপাঙ্‌ক্তেয় বলে ঘৃণা করে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। নিয়মের নাগপাশে জীবন হয়ে উঠেছে জড় যন্ত্র। এরই তীব্র প্রতিক্রিয়ায় জেগে উঠল পঞ্চক আর আচার্য। এমনভাবে জীবনের মহাসর্বনাশ চিরযুগ ধরে চলতে পারে না। তাই গুরুর আদেশ এল, তিনি আসছেন। তিনি অচলায়তনের ভ্রমাত্মক সাধনাকে সঠিক পথে চালনা করবেন—অচল আয়তনকে সচল করে তুলবেন।

কিন্তু কিভাবে? অচলায়তনের পাশেই রয়েছে দর্ভকপল্লী, আর কিছু দূরে একটি ভিন্ন সংস্কৃতির অধিকারী কর্মঠ শোণপাংশু জাতি। আয়তনের পঞ্চক শোণপাংশুদের সঙ্গে মেলামেশা করে। তারা অত্যন্ত কর্মঠ, কর্মই তাদের জীবনসর্বস্ব। তারাও অস্পৃশ্য। শাস্ত্রজ্ঞান তাদের নেই, তারা কোনোরকম অন্যায় বরদাস্ত করে না। অতিরিক্ত অস্থির তারা। তাদের কোনো গুরু নেই, এ পর্যন্ত তারা কোনো গুরুকে মানে নি। তাদের আছে দাদাঠাকুর। কিন্তু দাদাঠাকুরকে ঠিক তারা বোঝে নি। দাদাঠাকুরের অত্যন্ত কাছে থেকেও তারা অনেক দূরে। বাইরে থাকলেও অস্থিরতার চোটে বাহিরটাকে ভালো করে তারা দেখতেই পায় না। ওদের জীবন অশান্তিময়। 'মনের মানুষ' ঠাকুরদাকে পেয়ে ওরা কতকটা শান্তি পায়। এদের জীবনচর্যায় অধ্যাত্ম-চিন্তার স্থান নেই। ঠাকুরদা ভগবানের প্রেরিত পুরুষ হলেও তারা তাঁকে সে-দিক থেকে চেনে না। তারা চোখের জল ফেলতে শেখেনি। এদের জীবনেও রসের দরকার আছে। কিন্তু ওরা 'বর্ষণ' চায় না। অথচ ওদের জীবনের উদ্দাম গতি, অবাধ স্বাধীনতা, ওদের কর্ম করার উৎসাহ পঞ্চককে আকৃষ্ট করে। অচলায়তনের সম্পর্কে এরা কিছুই জানে না। তাই ওদের গুরু, ওদের মন্ত্রতন্ত্র সম্পর্কে এদের কৌতূহল আছে। দু'এক জনের কৌতূহল এমনই যে, ওদের গুরুর কাছে তারা মন্ত্র নিতে চায়, মন্ত্র নিলেই আশ্চর্য কি একটা ফল পাবে বলে তাদের বিশ্বাস। লুকিয়ে

তাই কেউ তপস্যাও করে। যাইহোক, এরা যূনক বা যবন—একটা পৃথক সংস্কৃতি সম্পন্ন, কর্মমার্গে বিশ্বাসী—কিন্তু কর্মের চক্রে জীবনের সত্যকে এরা পাচ্ছেনা।

আর আছে দর্ভকের দল। অচলায়তনের খুব সন্নিকটেই তাদের বাস। তারা অস্পৃশ্য ও অশুচি অচলায়তনিকের কাছে। এরা একেবারে ভিন্ন সংস্কৃতির অধিকারী নয়। তাই সকাল থেকে তারা নাম গান করে, সন্ধ্যের সময় কাজ থেকে ফিরেও নাম গান করে ঠাকুরের। ছোঁওয়া খাবার পঞ্চককে দিতে তারা সংকোচবোধ করে, আচার্যের স্নানের জল কাকে দিয়ে তারা তোলাবে ঠিক করতে পারে না। দীনতা ও হীনমন্যতার ভাব তাদের খুবই প্রবল। স্পষ্ট করে ঠাকুরকে যেমন তারা ডাকতে পারে, পঞ্চক বা আচার্য তা পারেন না। এদের 'পারের কাণ্ডারী গো এবার ঘাট কি দেখা যায়'—এই সমবেত গানটি শুনে আচার্যের মনে হয়েছে যেন তাঁর পাথরের দেহ গলে গেল। কতো সহজ সরল প্রাণ নিয়ে যে কাণ্ডারীর খেয়ায় চড়ে বসা যায়—এদের জীবনধারাই তার প্রমাণ। এরা শাস্ত্রও কিছু জানে না। আচার্য তাদের বাড়ীতে গেছেন—এটা তাদের সৌভাগ্য। তারা কেয়াফুল কদমফুল নিয়ে, বাজনা বাজিয়ে আচার্যকে অভ্যর্থনা করতে চায়। মন্ত্র নেই বলে তারা শুধু গান গেয়ে চলে। হৃদয়ে প্রেমের বাতি জ্বেলে পরাণখানি তারা পেতে দেয় পরাণ-বঁধুর চরণ রাখার জন্যে। অন্তরের মধ্যে তাদের আছে ভক্তি। তারা অকেজো নয়। সন্ধ্যেয় তারা কাজ করে বাড়ী ফেরে। অচলায়তনে লড়াই চলছে শুনে তারা আচার্যকে সাহায্য করতে চায়। অচলায়তনিকেরা যে মন্ত্রলেখা আর তাগাতাবিজ দিয়ে দুখানা হাতকে আগাগোড়া কষে বেঁধে রেখেছে তা তারা জানে। অচলায়তনিকদের সঙ্গে তাদের সংস্কৃতিগত যোগ। তাদের মন্ত্রকে শোণপাংশুদের মতো আয়ত্ত করার দুরভিসন্ধি তাদের নেই। বরং মন্ত্র তারা জানেনা বলে দুঃখবোধ আছে। সুতরাং একদিকে এরা যেমন ভক্তিরস-পন্থী অন্যদিকে তারা একেবারে নিষ্ক্রিয় নয় অচলায়তনিকদের মতো। অবশ্য কর্মকাণ্ডে তাদের বিচার-বিবেচনা শক্তি নেই। তাদের ভক্তি জ্ঞানহারা। নৈবেদ্যের 'অপ্রমত্ত' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যেন এদেরই ভক্তির ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন—

> "যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য নাহি মানে,
> মুহূর্তে বিহ্বল হয় নৃত্যগীত গানে
> ভাবোন্মত্ত মত্ততায়, সেই জ্ঞানহারা
> উদভ্রান্ত উচ্ছল ফেন ভক্তি মদধারা
> নাহি চাহি, নাথ।"

এদের গুরুও নেই, দাদাঠাকুরও নেই, আছে গোঁসাইঠাকুর। তিনি যে কে তা নিয়ে তারা কোনোদিন চিন্তা করে না। এরা নিজেদের কোনো গণ্ডীর মধ্যে বেঁধে রাখেনি বলে গোঁসাইঠাকুর যখন তখন তাদের পাড়ায় যান ও তাদের রান্না তৃপ্তিসহকারে গ্রহণ করেন।

নাটকের শেষে শোণপাংশুদের সাহায্য নিয়ে পঞ্চককে পুরানো উপকরণ দিয়ে নূতন মন্দির গেঁথে তুলতে বলেছেন ঠাকুরদা। পঞ্চকই হবে এখন থেকে আচার্য। ঠাকুরদা বা গুরু পুরানো অচলায়তন ভেঙে দিয়েছেন। মহাপঞ্চকও থাকবেন। শোণপাংশুদের মধ্যে সংযম নেই, স্থিরতা নেই, তাদের চরিত্রে স্থিতি একটু থাকা দরকার। মহাপঞ্চকের সংস্পর্শে তারা জীবনচর্যার যথার্থ পথের সন্ধান পাবে। পঞ্চক শোণপাংশুদের কাছে পেয়েছে কর্মের প্রেরণা, দর্ভকদের কাছে পেয়েছে অন্তরের সারল্য আর নামগান করার সহজতা ও প্রেম। পঞ্চকের নিজের মধ্যেই ছিল সরসতা ও বাইরে বেরিয়ে আসার একটা ব্যাকুলতা আর শাস্ত্রের শাসন ও নিয়মের অনুশাসনের প্রতি বিরূপতা। দর্ভকদের জীবনাচরণ তার সহজাত সরসতাকে পুষ্ট করেছে, তার অধ্যাত্ম-জীবনের পথে দর্ভকদের প্রেমও অনেকখানি সহায়তা করবে। শোণপাংশু ও দর্ভক উভয় জাতির কাছ থেকেই পঞ্চক লাভবান হয়েছে। কিন্তু দেখা গেল, নূতন যে মন্দির গাঁথা হবে, সেখানে পঞ্চকের দল ও শোণপাংশুর দলই কাজ করবে। আয়তন ভাঙার সময় রাত্রে স্থবিরকের রক্তের সঙ্গে শোণপাংশুর রক্ত মিলে গেছে। ঠাকুরদাদা বলেছেন সেই মিলনেই কিন্তু শেষ করলে হবে না। "এবার আর লাল নয়, এবার একেবারে শুভ্র। নূতন সৌধের সাদা ভিতকে আকাশের আলোর মধ্যে অভ্রভেদী করে দাঁড় করাও। মেলো তোমরা দুইদলে, লাগো তোমাদের কাজে।" মন্দির গড়া শেষ হয়ে গেলেও মহাপঞ্চকের কাছে অস্থির গতিশীল শোণপাংশুরা স্থিতিশীলতার কিছু শিক্ষা নেবে। "ক্ষুধাতৃষ্ণা লোভ ভয় জীবন-মৃত্যুর আবরণ বিদীর্ণ করে আপনাকে প্রকাশ করার রহস্যও তারা শিখবে ঐ মহাপঞ্চকের কাছে। আঘাতসংঘাতমুখর কর্মচঞ্চল জীবনবাদী শোণপাংশুদের জীবনচর্যায় অধ্যাত্মবাদকে যুক্ত করতে হবে। আবার তারা ঐ নূতন আয়তনে থেকে অধ্যাত্মপরায়ণ অচলায়তনিকদের স্থির বদ্ধ গতিহীন জীবনচর্যায় কতকটা চাঞ্চল্য ও গতিদান করবে। এমনিভাবে অধ্যাত্মবাদ ও জীবনবাদের চমৎকার সমন্বয়েই হবে আদর্শ জীবন। ভিন্ন সংস্কৃতির অধিকারী হলেও তারা কেউ সম্পূর্ণ নয়। দুইকে মিলিয়ে নিয়েই জীবনের সম্পূর্ণতা। কিন্তু এদের অধ্যাত্মবাদের সাধনায় শুধু জ্ঞানই যথেষ্ট নয়, ভক্তি, প্রেম ও সরসতাও দরকার। পঞ্চক ছাড়া আর কোনো অচলায়তনিকদের মধ্যে তার একান্তই অভাব। শোণপাংশুদেরও সরসতা নেই—তাদের যে রসের দরকার সে-কথা ঠাকুরদাদাও বলেছেন। এটা তারা পাবে পঞ্চকের কাছ থেকেই। আর পঞ্চক এ জিনিসটিকে দর্ভকদের জীবনে প্রত্যক্ষ করে এসেছে। ঠাকুরদা আয়তন ভেঙে সেখানে এক বিরাট পরিবর্তন এনে দিয়েছেন। এখন এখানে জ্ঞানের পথে সাধনার সঙ্গে কর্মময় সাধনাকে যুক্ত করলেই প্রেম স্বতোই জাগ্রত হবে।

কিন্তু প্রশ্ন এই যে অচলায়তন নাটকে নূতন মন্দির তৈরীর কাজে দর্ভকদের ডাকা হল না কেন? মন্দির তৈরী শেষ হয়ে গেলে দর্ভকদের সেখানে স্থান হবে কি? এর উত্তরে বলা যায় দর্ভকজাতিরাও ভক্তিপন্থী অধ্যাত্মপরায়ণ। দুয়ের সংস্কৃতিগত

মিলও আছে। তাই একই আয়তনে একই সংস্কৃতির অন্তর্গত অধ্যাত্মবাদী দুই দলের এখনই কোনো প্রয়োজন নেই। এদের মধ্যে মৌল বিরোধও নেই। বিরোধ হল শোণপাংশুদের সঙ্গে। অথচ ঐ দুই সংস্কৃতির মিলনই বিশেষ ভাবে কাম্য। দর্ভকদের সঙ্গে অচলায়তনিকদের যে মিল কতো গভীর তা বোঝা যায়, শোণপাংশুদের সঙ্গে লড়াইএর সময়—তারা প্রাণ দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে অচলায়তনিকদের হয়ে যুদ্ধ করতে চেয়েছিল। পঞ্চকের নেতৃত্বে এখন যে সাধনা চলবে অচলায়তনে, সেখানে মহাপঞ্চকের জ্ঞানের সঙ্গে পঞ্চকের দর্ভক-পল্লী-পুষ্ট প্রেম, এবং শোণপাংশুদের কর্ম-প্রেরণাও যুক্ত হবে। এই তিনের সমন্বয় হলেই দর্ভকদের আদর্শ স্বীকৃতি পাবে। আর সেই লগ্নে দর্ভকদের সেখানে প্রবেশে কোনো বাধা থাকবে না। এখনই অধ্যাত্মবাদকে আর বড় করে তোলার দরকার নেই। যেটা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন তা হল জীবনবাদ। সেইজন্যেই রবীন্দ্রনাথ এদের মিলনের ওপর জোর দিয়েছেন। তাই পঞ্চক ও মহাপঞ্চককেই এখন সবচেয়ে বেশী দরকার। এদের মিলনের নামই জীবনের পূর্ণতা—সম্পূর্ণতা। এ মিলনের উদারতর ক্ষেত্রে 'কেহ নহে নহে দূর'; শোণপাংশুও যেমন দর্ভকদলও তেমনি স্বচ্ছন্দে এখানে যাওয়া-আসা করতে পারবে। জ্ঞান, ভক্তি (প্রেম) ও কর্ম—তিনই সাধনার পথ। কিন্তু এককভাবে কোনোটিই সম্পূর্ণ নয়। তিনের মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন। এই সমন্বয় ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ ও পাশ্চাত্য জীবনবাদের (কর্মবাদ) সম্মিলনে কীভাবে হতে পারে, তা রবীন্দ্রনাথ এখানে দেখাতে চেয়েছেন। গীতায় এই জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম-এ তিনের সমন্বয়ের কথা আছে। কিন্তু তাকে যুগোপযোগী কীভাবে জীবনে বরণ করে জীবনে পূর্ণতা আনা যায় তারই ইঙ্গিত আছে এ নাটকে।

॥ ৪ ॥

নাটকটির এই তত্ত্বের অন্তরালে আমাদের দেশের সমকালীন অবস্থা এবং পাশ্চাত্যের জীবনতত্ত্ব দুই-ই রবীন্দ্রনাথের মনে সক্রিয় ছিল। নাটকটি প্রকাশিত হওয়ার পর এর বিরুদ্ধে নানা সমালোচনা বের হয়, তার জবাব দিতে হয়েছিল স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে। তখন তিনি যা বলেছিলেন, তার কিয়দংশ উদ্ধারযোগ্য। "নিজের দেশের আদর্শকে যে ব্যক্তি যে পরিমাণে ভালোবাসিবে সেই তাহার বিকারকে সেই পরিমাণেই আঘাত করিবে, ইহাই শ্রেয়স্কর।...... দেশের মধ্যে এমন অনেক আবর্জনা স্তূপাকার হইয়া উঠিয়াছে যাহা আমাদের বুদ্ধিকে শক্তিকে ধর্মকে চারিদিকে আবদ্ধ করিয়াছে। ইহার বেদনা কি প্রকাশ করিব না। অন্তরের যে সকল মর্মান্তিক বন্ধন আছে বাহিরের শৃঙ্খল তাহারই স্থূল প্রকাশ মাত্র—অন্তরের সেই পাপগুলোকে কেবলই বাপু বাছা বলিয়া নাচাইব, আর ধিক্কার দিবার বেলায় ওই বাহিরের শিকলটাই আছে? আমাদের পাপ আছে বলিয়াই শাস্তি আছে। যত লড়াই এই শাস্তির সঙ্গে? আর যত মমতা ওই পাপের প্রতি? আমার পক্ষে প্রতিদিন ইহা

অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। অচলায়তনে আমার সেই বেদনা প্রকাশ পাইয়াছে। শুধু বেদনা নয়, আশাও আছে।" (অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র ২৭শে অগ্রহায়ণ, ১৩১৮ দ্রঃ রবীন্দ্ররচনাবলী ১১, পৃঃ ৫১০)।

সুতরাং অচলায়তনের বিকার, অচলায়তনের আবর্জনা আমাদের এই দেশেরই। এই ভারতবর্ষের মানুষের একটা বিরাট অংশ সনাতন হিন্দুধর্মের শাস্ত্রগত অনুশাসন, স্মৃতির বিধি-নিষেধ ও ব্রত-উপবাসকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য মনে করে। এ সকলের পাকে পাকে জীবন স্থির-নিশ্চল হয়ে গেছে। তাদের বুদ্ধি, শক্তি ও ধর্ম অন্ধ আচার ও শাস্ত্রীয় সংস্কারে আবদ্ধ। বাইরের পরিবর্তনশীল জগতের সঙ্গে, জীবনের সঙ্গে তারা যোগ হারিয়েছে। শাস্ত্রগত বন্ধন তাদের মর্মমূলকেও জড়িয়ে ধরেছে। সেইখানেই আসল গলদ, আসল পাপ। সেই পাপের উৎসাদন চাই, তাকে আঘাত করা চাই। কিন্তু শুধুই আঘাত নয়, বাইরের জগতের সঙ্গে ভারতবর্ষের এই চিরাগত জীবনকে যোগযুক্ত করে দিতে হবে। শোণপাংশুদের সঙ্গে অচলায়তনিকদের মিলন ঘটিয়ে, পঞ্চক ও মহাপঞ্চককে একই আয়তনে বসিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজের দেশের সমস্যা ও তার সমাধানের কথাই এ নাটকে চিন্তা করেছেন—একথা স্বীকার করতে কোনো বাধা নেই।

আর দুটি প্রতিবাদও উঠেছিল। এ নাটকে রবীন্দ্রনাথ মন্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন, হিন্দুর চিরপবিত্র মন্ত্রগুলিকে তিনি কটাক্ষ করেছেন এবং আমাদের দেশের সমাজকে তিনি ভাঙতে চাইছেন। এ দুটি অভিযোগেরও রবীন্দ্রনাথ জবাব দিয়েছিলেন। "অচলায়তনের গুরু কি ভাঙিবার কথাতেই শেষ করিয়াছেন? গড়িবার কথা বলেন নাই? পঞ্চক যখন তাড়াতাড়ি বন্ধন ছাড়াইয়া উধাও হইয়া যাইতে চাহিয়াছিল তখন কি তিনি (গুরু) বলেন নাই 'না যাইতে পারিবে না—যেখানে ভাঙা হইল, এইখানেই আবার প্রশস্ত করিয়া গড়িতে হইবে। গুরুর আঘাত, নষ্ট করিবার জন্য নহে, বড়ো করিবার জন্যই। তাঁহার উদ্দেশ্য ত্যাগ করা নহে, সার্থক করা।" (অধ্যাপক ললিতকুমারকে লিখিত পত্র, ৩রা অগ্রহায়ণ ১৩১৮)। বস্তুত এ নাটকে একটা সমাজকে ভাঙার কথা যেমন আছে, তেমনি সেই ভগ্নাবশেষ সমাজের উপকরণগুলি নিয়ে নতুন সমাজ-উপকরণ যোগ করে পুরাতনে-নতুনে সম্মিলনের কথাও আছে। তাই সমাজ ভাঙার অপরাধে তাঁকে অভিযুক্ত করা যায় না।

মন্ত্র সম্বন্ধে একই কথা বলা যায়। মন্ত্রের প্রতি তাঁর কোনো অশ্রদ্ধা নেই, কিন্তু মন্ত্র যখন সর্বস্ব হনে মানুষের মনের বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তখনই তার প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিরূপতা। মন্ত্রকেও তিনি ঘৃণা করেন না—কিন্তু তা যখন মানব-কল্যাণের পরিপন্থী হয় তখন তাকে আঘাত হানার প্রয়োজন আছে। অনুরূপ দৃষ্টান্ত দেখেছি 'মুক্তধারায়' যন্ত্রের ব্যাপারে। রবীন্দ্রনাথ ঐ একই চিঠিতে বলছেন, "মন্ত্রের সার্থকতা সম্বন্ধে আমার মনে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু মন্ত্রের যথার্থ

উদ্দেশ্য মননে সাহায্য করা—কিন্তু মন্ত্র যখন তাহার যথার্থ উদ্দেশ্যকে অভিভূত করিয়া নিজেই চরম পদ অধিকার করিতে চায়, তখন তাহার মতো মননের বাধা আর কী হইতে পারে।"

॥ ৫ ॥

'অচলায়তন' নাটকটি আষাঢ় মাসে ১৩১৮ সালে শিলাইদহে থাকার সময় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন। নাটকটির ঘটনা বর্ষার কিছু পূর্বে অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে শুরু হয়েছে এবং বর্ষার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই তা পরিণাম লাভ করেছে। নাটকের প্রথম দৃশ্যে বিশম্ভর মহাপঞ্চককে বলেছে, "দেখুন, একটা জনশ্রুতি শুনতে পাচ্ছি, বর্ষার আরম্ভে আমাদের গুরু নাকি এখানে আসবেন।" এর থেকে অনুমান করা সহজ যে গ্রীষ্মেই নাটকের ঘটনারম্ভ। গ্রীষ্মের রূঢ় রুক্ষ শুষ্কতা ও দাবদাহের অবসান ঘটিয়ে নামে শ্যাম সমারোহে সজল বর্ষা। অচলায়তনে নিয়ম-কানুন, ব্রত-উপবাস ও মন্ত্রতন্ত্রের কঠোরতায় জীবনে শুষ্কতা ও রুক্ষতা দেখা দিয়েছিল। তৃতীয় দৃশ্যে আচার্য বলছেন, "গুরু চলে গেলেন, আমরা তার জায়গায় পুঁথি নিয়ে বসলুম, তার শুকনো পাতায় ক্ষুধা যতই মেটে না ততই পুঁথি বাড়াতে থাকি। ······ কিন্তু আমার তালু যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। রসনায় যে রসের লেশমাত্র নেই।" আচার্য ও পঞ্চক দুজনেই আয়তনের মধ্যে বিধি-বিধানের চাপে নিদারুণ অস্বস্তিবোধ করেছেন। মহাপঞ্চক শুষ্কতা ও কঠোরতার প্রতীক চরিত্র, তাঁর মধ্যে বর্ষার সরসতাকে লাভের আগ্রহ নেই। কিন্তু পঞ্চক এবং আচার্য বর্ষার আগমনের জন্যে প্রতীক্ষমান। তাই তৃতীয় দৃশ্যে আচার্যের আকুলতা দেখে পঞ্চক বলেছে, "তোমার নববর্ষার সজল হাওয়ায় উড়ে যাক সব শুকনো পাতা—আয়রে নবীন কিশলয় তোরা ছুটে আয়, তোরা ফুটে বেরো।" চতুর্থ দৃশ্যে পঞ্চক যখন আবার বলছে, "আঃ দেখতে দেখতে কী মেঘ করে এল। শুনছ আচার্য বজ্রের পর বজ্র। আকাশকে একেবারে দিকে দিকে দগ্ধ করে দিলে যে।"—তখন আচার্য বলছেন, "ওই যে নেমে এল বৃষ্টি—পৃথিবীর কত-দিনের পথ চাওয়া বৃষ্টি—অরণ্যের কত রাতের স্বপ্ন দেখা বৃষ্টি। অচলায়তনের জীর্ণ সংস্কার ও অন্ধ আচারকে ভেঙে ফেলার জন্যে গুরুর আবির্ভাব ঘটেছে যোদ্ধবেশে। বাইরের প্রকৃতিতে বজ্র তারই প্রতীক। আচার্য বলেছেন পঞ্চককে, "বজ্ররবে যিনি দরজায় ঘা দিয়েছেন তাঁকে ঘরে ডেকে নাও—আর দেরী করোনা।" আবার এই গুরু আয়তনের জঞ্জাল সাফ করে ফেললে সেখানে আর বজ্রবিদ্যুতের ভয়ঙ্কর খেলা চলে না—সেখানে আলো আর পাখীর গান জেগে ওঠে। বাইরের প্রকৃতির বিভিন্ন রূপের সঙ্গে নাটকের ঘটনা ও চরিত্রের একটা সামঞ্জস্য রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। গ্রীষ্ম ও বর্ষার অন্তরতম রূপের সঙ্গে, গ্রীষ্মের বিদায় ও বর্ষার আগমনের সঙ্গে নাটকের সচল ঘটনাধারা তার মর্মবাণীকে মিলিয়ে পদক্ষেপ করেছে। এদিক থেকেও নাট্যঘটনা ও তার কালটি লক্ষণীয়।

॥ ৬ ॥

নাটকটির প্রধান চরিত্র মহাপঞ্চক, পঞ্চক, আচার্য ও দাদাঠাকুর। এছাড়া গৌণ চরিত্র হিসেবে উপাচার্য, উপাধ্যায়, সুভদ্র রাজা, বিশম্ভর, সঞ্জয়, তৃণাঞ্জন জয়োত্তম ও অধ্যেতা এবং দলবদ্ধভাবে বালকের দল, শোনপাংশুর দল ও দর্ভকদল। প্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে দাদাঠাকুর, আচার্য ও পঞ্চক ঠিক রক্তমাংসের পুরোপুরি বাস্তব চরিত্র নয়। বাকী চরিত্রগুলি বাস্তবতার পথে অঙ্কিত করা হলেও কোনো চরিত্র পূর্ণাঙ্গ নয়। একমাত্র ব্যতিক্রম মহাপঞ্চক চরিত্র। মহাপঞ্চকই নাটকের মধ্যে সবচেয়ে বেশী জীবন্ত। পঞ্চ ইন্দ্রিয়কেই তিনি শুধু সংযত রাখেন নি, তিনি মনকেও নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন বলে তাঁর মহাপঞ্চক নাম যথার্থ। অচলায়তনে যে সাধনা তিনি করছিলেন তাতে মন্ত্র ও শাস্ত্রীয় আচার খুবই প্রাধান্য পাচ্ছিল। পুঁথিগত জ্ঞানে তিনি শ্রেষ্ঠ। নীরস ও কঠোর জ্ঞানসাধনায় তাঁর মতো নিষ্ঠা আর কারো নেই। উপাচার্য তাঁকে বলেছেন 'শাস্ত্রকীট'। পিতার মৃত্যুর পর নিতান্ত দরিদ্র অবস্থায় এই আয়তনে তিনি এসেছিলেন। কিন্তু নিজগুণে তিনি সেখানে আজ অতি উচ্চ পদে আসীন হয়েছেন। নাটকের শুরুতেই আমরা মহাপঞ্চককে দেখি। আয়তনের পক্ষে অসঙ্গত গান করার জন্যে এবং বজ্রবিদারণ মন্ত্রটা মুখস্থ না করার জন্যে তিনি ভ্রাতা পঞ্চককে তিরস্কার করেছেন।

সুভদ্র আয়তনের জানালা খোলার ফলে একজটা দেবী যে ক্ষুণ্ণ হয়েছেন, তার প্রায়শ্চিত্তের বিধান মহাপঞ্চক ছাড়া আর কেউ দিতে পারেন নি। 'ছয়মাস মহাতামস সাধন করার' কথা যে জ্বলনান্তকৃত আধিকার্মিক বর্ষায়ণে আছে, তা একমাত্র তিনিই জানেন। সুভদ্রকে শাস্তি দেবার ব্যাপারে আচার্যের সঙ্গে তাঁর মতান্তর দেখা দেয়। আচার্য সুভদ্রকে কোনো শাস্তি না দিতে চাইলে মহাপঞ্চক বলেন 'এও কি কখনো সম্ভব হয়? যা কোনো শাস্ত্রে নেই' তা তাঁর করা উচিত নয়। আয়তনের সকলেই অশুচি হয়ে রইবেন সুভদ্রকে শাস্তি না দিলে। সনাতন হিন্দুধর্মের বিনাশ ঘটবে। 'এ অবস্থায় ওঁকে আচার্য বলে গণ্য করাই চলবে না।' এতে উপাচার্য ক্ষুণ্ণ হয়ে আচার্যের পক্ষ নিয়ে মহাপঞ্চককে কটূক্তি করেছেন। আচার্যের অভাবে উপাচার্যই আচার্য হবেন—মহাপঞ্চকের এই মন্তব্যে উপাচার্য তাঁকে প্রলুব্ধ করার অপরাধে অভিযুক্ত করে বলেছেন তিনি সুভদ্রের থেকেও বেশী 'পাপী'। সুভদ্রের ব্যাপারে আচার্যকে তিনি সংযত করার জন্যে বন্ধ করে রাখার আদেশ দিয়েছেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস এ ঘটনার ফলে অর্থাৎ একজটা দেবীর শাপে অচলায়তনের একটি পাথরও থাকবে না। ছাত্রদেরকে ঘোর বিপদের কথা তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। সুভদ্র মহাতামস ব্রত পালন করতে না পারার জন্যে আত্মগ্লানি অনুভব করতে থাকলে এই মহাপঞ্চকই আবার খুশী হন। স্থবিরপত্তনের রাজা মন্থরগুপ্ত এসে মহাপঞ্চকের কাছে যখন জানতে চান দাদাঠাকুরের দল অর্থাৎ শোণপাংশুরা রাজ্যের প্রাচীর কেন ভাঙতে

শুরু করেছে, তখন তিনি সুভদ্রের পাপের ফলে একজটা দেবীর শাপের কথা জানান এবং আচার্যের আচরণের কথা বললে রাজা মহাপঞ্চককেই আচার্যের পদে অধিষ্ঠিত করেন। রাজা আচার্যকে দর্ভকপাড়ায় কয়েকদিন বন্ধ করে রাখার নির্দেশ দিলে মহাপঞ্চকভ্রাতা পঞ্চককেও ঐ সঙ্গে সেখানেই নির্বাসন দেন। মহাপঞ্চক নিজের মন্ত্রতন্ত্র ও পুঁথিগত বিদ্যার ওপর এমনই আস্থাশীল যে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেনা কেউ অচলায়তনের প্রাচীর ফুটো করে দিতে পারে। উপাধ্যায়ের মুখে দ্বার ভাঙার কথা শুনে তিনি বিস্মিত হন। আয়তন আক্রান্ত হতে দেখে তৃণাঞ্জন, সঞ্জীব প্রভৃতি মহাপঞ্চকের ওপর বিশ্বাস হারিয়েছেন, কিন্তু তখনও মহাপঞ্চক বলেন যে ভিতরের লোহার দরজা বন্ধ আছে। "সে যখন ভাঙবে তখন চন্দ্রসূর্য নিবে যাবে। অচলায়তনের রক্ষক দেবতার আশ্চর্য শক্তিতে তখনও তাঁর অটুট আস্থা। অথচ কিছুক্ষণের মধ্যে চারদিক থেকে আলো আসতে দেখে বালকদের তিনি বলতে বাধ্য হয়েছেন, 'আজ কোনো নিয়ম রক্ষা করা চলবে বলে বোধ হচ্ছেনা।' যোদ্ধবেশে গুরু এলে গুরুর সঙ্গে তিনি তর্ক করেছেন, তাঁকে মানতে চাননি, প্রণাম করতে চাননি, নিরস্ত্র অবস্থাতেও আঘাত করতে চেয়েছেন তিনি গুরুকে। নিজের নৈষ্ঠিক সাধনার দর্পে তিনি বলেছেন, "পাথরের প্রাচীর তোমরা ভাঙতে পারো, লোহার দরজা তোমরা খুলতে পারো, কিন্তু আমি আমার ইন্দ্রিয়ের সমস্ত দ্বার রোধ করে এই বসলুম—যদি প্রায়োপোবেশনে মরি তবু তোমাদের হাওয়া, তোমাদের আলো লেশমাত্র আমাকে স্পর্শ করতে দেব না।" তিনি নির্ভীক। তাই গুরুর অনুবর্তী শোণপাংশুদের তিনি বলতে পারেন, "তোমরা মেরে ফেলতে পারো, তার বেশী ক্ষমতা তোমাদের নেই।' এমন মানুষকে বন্দী করা যে কতোখানি মূঢ়তা সেকথা গুরু স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। মহাপঞ্চক সকল শাস্তির ঊর্ধ্বে। 'ও আজ যেখানে বসেছে সেখানে তোমাদের তলোয়ার পৌঁছয় না। আয়তনের প্রাচীর ভেঙে সেখানে নূতন প্রাচীর তোলা হলে মহাপঞ্চক সেই আয়তনেই থাকবেন—তিনি এখন পরিবর্তিত মানুষ। আলোতে তাঁর দৃষ্টি খুলে গেছে। কি করে আপনাকে আপনি ছাড়িয়ে উঠতে হয়, সেইটে শেখাবার ভার তাঁর ওপর। গুরুদেবের সাহায্যে মহাপঞ্চকের ত্রুটি সংশোধন করে দেওয়া হয়েছে।

পঞ্চক চরিত্রটি খুবই আকর্ষণীয়। কিন্তু জটিল। শাস্ত্রশাসন তার ভালো লাগে না। অচলায়তনের বদ্ধ আবহাওয়ায় তার চিত্ত পীড়িত। সে ঐ বদ্ধ স্থান থেকে বাইরে মুক্তি চায়।

শাস্ত্রপাঠ ও শাস্ত্রজ্ঞানে সে আয়তনের সকল ছাত্র থেকে পিছিয়ে আছে। কিন্তু তার জন্যে তার এতটুকু দুঃখ নেই। অগ্রজ মহাপঞ্চকের সম্পূর্ণ বিপরীত-ধর্মী চরিত্র তার। মহাপঞ্চক গান ভালোবাসেন না, কিন্তু সে কেবলই গান করে। গুরু আসছেন বলে দাদা তাঁকে প্রস্তুত হতে বলেন, সে বলে যে গুরু এসে হয়তো দেখবেন 'আমরা যেদিক দিয়ে প্রস্তুত হতে গিয়েছি সে দিকটা উল্টো'। বালক সুভদ্রের জানালা

খোলাকে মহাপঞ্চক পাপ বলে মনে করেন এবং তার জন্যে একজটা দেবীর শাপ থেকে রক্ষা পেতে গেলে প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন। কিন্তু পঞ্চক এর মধ্যে কোনো পাপ আছে বলে মনেই করেনা, বরং সে আচার্যের সহায়তায় সুভদ্রকে শাস্তির হাত থেকে রক্ষা করবার চেষ্টা করে। ফলে তার দর্ভকপল্লীতে নির্বাসনদণ্ড হয়। হাসিমুখে সে তা মেনে নেয়। মোটকথা আয়তনের কঠোর নিয়মকানুন, ব্রত-উপবাস ও সূত্রবৃত্তির সে মূর্তিমান প্রতিবাদ। তার অন্তরের মিল আচার্যের সঙ্গে। আচার্যকে তাই সে বলে, 'আমি আচার-অনুষ্ঠান কিছুই জানিনে, আমি আপনাকেই জানি।' আচার্যও তার মধ্যে মুক্তিকে যেন প্রত্যক্ষ করেন। মানুষের মন যে "মন্ত্রের চেয়ে সত্য, হাজার বছরের অতি প্রাচীন আচারের চেয়ে সত্য"—একথা পঞ্চককে দেখে তাঁর মনে হয়েছে। আবার "যা আচার ও নিয়মের অনেক বেশী"—এমন একটা কিছু আচার্য পঞ্চককে দিয়েছেন।

পঞ্চকের চিত্ত আয়তনের স্থির ও নিয়মের যন্ত্রবদ্ধ জীবনে পীড়িত। তাই সে বাইরের শোণপাংশুদের সঙ্গে মাঝে মাঝে মেলামেশা করে। ভিন্ন সংস্কৃতির অধিকারী এই জাতির স্বাধীন জীবন, কর্মোন্মত্ততা, গতিশীলতা ও শাস্ত্রজ্ঞানহীনতা তাকে আকৃষ্ট করে। আবার দর্ভকদের জীবনের সারল্য, সহজপন্থায় শাস্ত্রজ্ঞান নিরপেক্ষ নামগান, নৃত্যও তাকে কম আকৃষ্ট করে না। সে পুরোপুরি এদের জীবনকে বরণ করতে অবশ্য পারে না। কিন্তু তার নিজ জীবনের অপূর্ণতাগুলি এদের জীবনধারার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য থেকে পূরণ করে নিতে চায়। ঐ দুই জাতির জীবনচর্যাও তো ত্রুটিহীন নয়। তাই তাদের দলে সম্পূর্ণভাবে যোগ দিতে পঞ্চক পারে না। শোণপাংশুদের অতিরিক্ত অস্থিরতা বা চিত্তস্থৈর্যের অভাবকে সে কখনোই গ্রহণ করতে পারে না। দর্ভকদের জ্ঞানহীন ভক্তি বা প্রেমাতিশয্যও তার কাম্য নয়।

দাদাঠাকুরই পঞ্চকের জীবনকে পূর্ণতায় ভরে দিয়েছেন। শোণপাংশু ও দর্ভকদের সম্পর্কে তার দৃষ্টি তিনি উন্মুক্ত করেছেন, অচলায়তন সম্পর্কেও তার ধারণাকে স্বচ্ছ করে দিয়েছেন। দাদাঠাকুর তার কাছে গুরু এবং দাদাঠাকুর দুইই। অর্থাৎ সে গুরুর নির্দেশে চলছে একথাটাও যেমন মনে করে, তেমনি সে নিজেও স্বাধীনভাবে চলছে একথাও ভোলে না। একটা চরম বা পরমের জন্যে তার মনের মধ্যে যে ব্যাকুলতা আছে তা দাদাঠাকুর জানেন। দাদাঠাকুর তাকে 'পুঁথির চাপ' থেকে উদ্ধার করবেন বলে আশ্বাস দেন। দাদাঠাকুরকে তার হৃদয়ে ঢেউ তোলবার জন্যে সে অনুরোধও করে। গুরুর আবির্ভাব-লগ্ন যে আসন্ন, বজ্রধ্বনির মধ্য দিয়ে সে অনেকটা তা অনুমান করতে পারে। দাদাঠাকুর পঞ্চককে ঐ অচলায়তনের উপযুক্ত ব্যক্তি মনে করেন। পুরাতন অচলায়তন যা ছিল কারাগার, তা তিনি ভেঙে দিয়েছেন, এখন সেখানে পুরাতন উপকরণ দিয়ে নতুন মন্দির গেঁথে তুলতে হবে। সেখানকার নূতন আচার্য হয়েছেন পঞ্চক, সে এখন সকলেরই আপন। যে যেখানে ছড়িয়ে আছে সবাইকে ডেকে সে এখানে বসাবে। শোণপাংশুরাও আসবে।

মহাপঞ্চকেরও প্রয়োজন। সংযম, স্থিরতা ও নিষ্ঠাকে বর্জন করলে চলবেনা। তাই মহাপঞ্চক ও পঞ্চকের সম্মিলিত প্রয়াসে অচলায়তন এখন সচলায়তনে রূপান্তরিত হবে।

অচলায়তনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র দাদাঠাকুর। তিনি আয়তনের গুরু। তিনিই প্রথম ওখানে আচার্যদেবকে প্রতিষ্ঠিত করে সুষ্ঠুভাবে জীবনচর্যার নির্দেশ দিয়ে চলে গিয়েছিলেন। পরে আচার ও নিষ্ঠা, মন্ত্র ও ব্রত উপবাসের জগদ্দল পাথর সেখানকার জীবনধারাকে নিশ্চল করে দেওয়ায় আবার গুরুর সেখানে আবির্ভাবের প্রয়োজন হয়েছে। গুরুর আবির্ভাবের সংবাদ সেখানে পৌছানোর পর থেকেই নাট্য-ঘটনায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। পুরাতন জীবনে ভাঙন ধরেছে। অচলায়তনিকেরা জানে গুরুর নির্দেশেই তাদের কাজকর্ম চলছে। দাদাঠাকুর সেখানকার গুরু।

কিন্তু গুরুর প্রবেশের পথ তারা সেখানে বন্ধ করে দিয়েছে বলে তাতে ভাঙনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। শোণপাংশুদের সঙ্গেও দাদাঠাকুরের যোগ ঘনিষ্ঠ। তাদেরও যে গুরু চালায় একথা তারা জানে না, তাই তিনি তাদের গুরু নন, দাদাঠাকুর। দর্ভকদের সঙ্গেও তাঁর অচ্ছেদ্য যোগ। তাদের তিনি গোসাইঠাকুর। শোণপাংশু ও দর্ভকদের সাধনার ত্রুটির কথাও দাদাঠাকুর জানেন। নাটকের সমস্ত ঘটনা তাঁর নখদর্পণে। আচার্যের কি ত্রুটি, মহাপঞ্চকের সাধনার গলদ কোথায় এবং কোথায় তার কৃতিত্ব, পঞ্চককে দিয়ে কী কাজ হতে পারে, শোণপাংশুদের কোন্ কাজে লাগানো যেতে পারে, এবং কীভাবে অচলায়তনকে সচলায়তন করা যায়, পঞ্চক মহাপঞ্চকে কীভাবে মিলন ঘটানো যায় সবই তাঁর জানা। তিনি সাধারণ মানুষ নন। তিনি ভগবান বা ঈশ্বর নন, কিন্তু ঈশ্বরেরই অত্যন্ত বিশ্বস্ত প্রতিনিধি। তাঁর মধ্য দিয়েই ভগবান তাঁর কাজ করে চলেন। তাই তাঁর কাছে জাতিভেদ বলে কিছু নেই। অস্পৃশ্য দর্ভকদের খাবার সানন্দে তিনি গ্রহণ করেন। সদানন্দময় দাদাঠাকুর প্রয়োজন হলে মানবসমাজের জঞ্জাল অপসারণের জন্যে যোদ্ধবেশ ধারণ করেন, আবার বালক-দলের খেলার আনন্দময় সঙ্গী হতে পারেন। নাটকের গূঢ়তত্ত্বের তিনিই ভাষ্যকার। তাঁর সব কথা, সব আচরণ ঠিক বোঝা যায় না। তাই তিনি সাংকেতিক চরিত্র।

আচার্যও একদা গুরুর প্রত্যাদেশ পেয়ে অচলায়তনের গুরুদায়িত্ব নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর অন্তরের মধ্যে জীর্ণ অচল পুঁথিভিত্তিক শাস্ত্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ছিল। তাই তিনি আয়তনের কাজের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। আয়তন থেকে তাঁকে দর্ভকপাড়ায় আটক করে রাখার শাস্তি তিনি সানন্দে গ্রহণ করেছেন। আয়তনের যত কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি, তা সবই তিনি স্পষ্টভাবে অনুভব করেছিলেন। একদিকে আয়তনের দায়িত্ব ও অন্যদিকে আয়তনের অধঃপতন—এ দুয়ে মিলে তাঁর চিত্ত অন্তর্দ্বন্দ্বময় হয়ে উঠেছিল। তাঁর চিত্ত শুকিয়ে উঠেছিল; গুরুর আবির্ভাব-কামনায় তিনি অধীর হয়ে উঠেছিলেন। অচলায়তনকে ভেঙে দিয়ে গুরু সেখানে নূতন ব্যবস্থা করলেন, আর আচার্যকে রাখা হল না। তাঁকে মুক্তি দিয়ে নিজের চিরসঙ্গী করে

নিলেন। এ চরিত্রও তাই শেষ পর্যন্ত বাস্তব বলে মনে হয় না, আধাসাংকেতিক হয়ে উঠেছে।

গুরু বা ঈশ্বরকে অপরোক্ষ করেছিলেন আচার্য আর মালী এবং শঙ্খবাদক। অচলায়তনের নিয়মবদ্ধ জীবনের বাইরে এরা। ফুলের সৌন্দর্য ও শুভ্রতা এবং শঙ্খধ্বনির মাধুর্য ও কল্যাণ এদের জীবনেরও মূলগত বৈশিষ্ট্য। তাই এদের চরিত্রেও কতকটা সাংকেতিকতা আছে।

উপাচার্য নির্লোভ। আচার্যেব প্রতি তাঁর গভীর আস্থা। আচার্যের শাস্তি তাই তিনি বরদাস্ত করতে পারেন নি। উপাধ্যায় সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্র উপাচার্যের। তিনি মহাপঞ্চকের নীতি ও আদর্শে বিশ্বাসী। সঞ্জয়, তৃণাঞ্জক বিশ্বম্ভর জয়োত্তম অধ্যেতা প্রভৃতি চরিত্র অচলায়তনের নিয়ম-নিগড়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা হলেও শেষের দিকে অচলায়তনের প্রাচীর ভাঙার চাক্ষুষ প্রমাণ পেয়ে তারা বিচলিত হয়েছে। আয়তনেব বালকদের চিত্ত সম্পূর্ণরূপে পাকা হয়ে ওঠেনি নিয়ম-কানুনের গাঁথুনিতে। তাই তারা মহাপঞ্চকের নিয়মের অনুবর্তী হলেও ঠাকুরদার প্রবেশে ও আয়তনে আলো ও পাখীর ডাক শুনে আনন্দে চঞ্চল হয়েছে। সুভদ্রর ওপর কিন্তু সংস্কারের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। তাই সে পাপের শাস্তি নেবার জন্যে বেশী আগ্রহ প্রকাশ করেছে। ঠাকুরদা শেষে তাকে সঙ্গী করে নিয়েছেন। দর্ভকদল ও শোণপাংশুর দলের মধ্য দিয়ে জাতিগত বৈশিষ্ট্যই সামগ্রিকভাবে দেখানো হয়েছে। নাম থেকেই বোঝা যায় স্থবির পত্তনের রাজা কীরকম। তাঁর নাম মন্থর গুপ্ত। শিখাসচ্ছন্দ মহাভৈরব তাঁর রাজ্যের প্রাচীর রক্ষা করলেও দাদাঠাকুরের দল যখন তা ভেঙে দিয়েছে তখন কোনো অপরাধ হয়েছে বলেই তাঁর বিশ্বাস। তিনিও সংস্কারগ্রস্ত। একজটা দেবীর শাপের ভয়ে তিনি আচার্য অদীনপুণ্যকে নির্বাসন দিতে এবং মহাপঞ্চককে আচার্য করতে ইচ্ছুক হয়েছেন দিকপাল ও ব্রহ্মচারীদের সাক্ষ্য করে।

॥ ৭ ॥

অচলায়তন নাটকটি তত্ত্বপ্রধান তো নিশ্চয়ই। এই তত্ত্বের প্রধান প্রতীক বা সংকেত হল 'অচলায়তন'। যে আয়তন, মন্দির বা স্থানের অধিবাসীরা সব অচল হয়ে গেছে, জীবনের গতি রুদ্ধ হয়েছে; নিয়মপাশে, সংস্কারের চাপে স্মৃতি-বিধানের অন্ধ আনুগত্যে যেখানকার জীবন জড়তাগ্রস্ত, শুষ্ক ও প্রাণহীন যন্ত্রবৎ যে রাজ্যের নাম 'স্থবিরপত্তন' এবং যে রাজ্যের রাজাব নাম 'মন্থর গুপ্ত' সেই রাজ্যেই 'অচলায়তন'। বাইরের জগতের সঙ্গে যোগ হারিয়ে বিরাট উঁচু সংস্কারের প্রাচীরে বেষ্টিত এ আয়তন। আয়তন মূলত একটা সমগ্র দেশ বা জাতির সংস্কৃতির প্রতীক।

শোণপাংশু ও দর্ভকদলও জীবনের দুই ধারার সংকেত। গতিশীল, পরিণামহীন, কর্মময় সংগ্রামশীল জীবনের অস্থিরতার প্রতীক শোণপাংশুর দল। আর জ্ঞানহারা ভক্তিমদমত্ত ফেনোচ্ছল হীনমন্ত্র জীবনের প্রতীক দর্ভকদের দল। অচলায়তনের

মহাপঞ্চক ও তাঁর অনুবর্তীরা যে জীবনের প্রতীক হয়ে উঠেছে, এখন তা অচল। কিন্তু এখানকার সংকেতিত জীবনের সঙ্গে শোণপাংশুদের সংকেতিত জীবনকে মিশিয়ে ও দর্ভকদের সংকেতিত জীবনের আদর্শকে কতকটা জ্ঞানসম্মত পথে গ্রহণ করে সচলায়তন গড়ে তোলার সংকেত আছে নাটকটিতে। সংকেতের সাহায্যে নাটকটির ভাব ব্যঞ্জিত হতে পারে, কিন্তু তাকে রূপ দিতে গেলে পুরোপুরি কতকগুলি সংকেতকে আশ্রয় করলে চলে না। তাই কাহিনীকে যেভাবে রূপ দেওয়া হয়েছে তা ঐ সংকেতিত ভাবেরই যেন রূপক। প্রচলিত রূপকে যেমন বাহ্যকাহিনীর অন্তরালে ভিতরের কাহিনী সমান্তরালভাবে চলে, এখানে তা আদ্যন্ত হবার উপায় নেই। মাঝে মাঝে সংকেত তো আছেই, তার সঙ্গে ঘটনা ও চরিত্রেও বাস্তবতা আনার চেষ্টা হয়েছে। ফলে এ রূপকও হয়ে পড়েছে মিশ্র। সেইজন্য নাটকটি সংকেত, রূপক ও বাস্তবতার মিশ্রণে রচিত একটি তত্ত্বেরই রসরূপ। দাদাঠাকুর বা গুরু তো পুরোপুরি সাংকেতিক চরিত্র, তবুও তার আচরণে ও কথায় বাস্তবতা আছে। আচার্যের চরিত্রও অর্ধসাংকেতিক। অচলায়তনিকদের সমস্যা-সমাধানের পন্থাটিও যথেষ্ট সাংকেতিক।

নাটকটির 'অচলায়তন' ও 'গুরু' এই দুই প্রতীক বা সংকেতকে যুক্ত করলেই নাটকটির ভাঙা ও গড়া দুই দিকই ব্যঞ্জিত হয়ে ওঠে। শুধু 'অচলায়তন' এই সংকেতে নাটকটির সমগ্র বক্তব্য আভাসিত হয় না। অবশ্য প্রতীকের সাহায্যে সমগ্র বক্তব্য আভাসিত করতেই হবে, এমন দাবী নাট্যকারের কাছে আমরা করতে পারি না। অচলায়তন ও গুরু এই দুই সংকেতের মধ্য দিয়েই নাটকটির পূর্ণরূপ। বরং 'গুরু' বললেও অচলায়তনের কথা অনিবার্যভাবেই মনে আসে। তাই নাটকটির পরিবর্তিত রূপে রবীন্দ্রনাথ হয়তো এর নাম অচলায়তনের বদলে 'গুরু' রেখেছিলেন। মালী শঙ্খবাদক চরিত্র দুটিও অর্ধসাংকেতিক চরিত্র।

নাটকের মহাপঞ্চক, উপাধ্যায়, সঞ্জয়, তৃণাঞ্জন, বিশ্বম্ভর, সুভদ্র, অধ্যেতা, জয়োত্তম ও বালকদলের চরিত্র-চিত্রণে বাস্তবতার পথই অবলম্বন করা হয়েছে। পঞ্চক ও আচার্য পুরোপুরি সাংকেতিক চরিত্র না হলেও আচার্যের শেষ পরিণাম যা হল তা বাস্তব-চরিত্রের নয়। সেখানেও তিনি সাংকেতিক হয়ে উঠেছেন। তাছাড়া তাঁর অনেক উক্তিও সংকেতধর্মী। পঞ্চকের মধ্যে অধ্যাত্ম-জীবনের প্রতি এমন একটা গূঢ় আকর্ষণ আছে, তার গানের মধ্যে এমন একটা ইঙ্গিত মাঝে মাঝে ফুটে ওঠে এবং যেভাবে সে গুরুর আসন্ন-আবির্ভাবের শব্দ ও তার প্রতিক্রিয়া-পরিণামের চিত্রকে অনুমান করতে পারে, তাকে পুরোপুরি বাস্তব চরিত্র বলা চলে না।

গানের মধ্য দিয়েও সাংকেতিকতা অনেকখানি ফুটে উঠেছে। পঞ্চকের কিছু কিছু গান এবং দাদাঠাকুরের গান সাংকেতিক। 'তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে, কেউ তা জানে না' বলে পঞ্চক যখন গেয়ে ওঠে বা ঐ গানেই যখন শুনি 'তোমার মতন এমন টানে কেউ তো টানে না' তখন ঐ 'তুমি' ও 'তোমার' শব্দে অরূপ অসীমের এক অনির্বচনীয় ব্যঞ্জনা ফুটে ওঠে। 'এ পথ দিয়ে কে আসে যায়

কোন্‌খানে, তা কে জানে তা কে জানে,' কিংবা 'ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে, আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে'। অথবা 'আমি হাত বাড়িয়ে আছি আমায় নাও কেড়ে নাও লুটে' প্রভৃতি গানে চিত্তের গভীরতর আকুলতা—অসীম ঈশ্বরকে উপলব্ধির ব্যঞ্জনা।

পঞ্চকের গানের মধ্য দিয়ে তার চিত্ত-ব্যাকুলতা, কখনো আনন্দোচ্ছ্বাস, কখনো বা বেদনা প্রকাশ পেয়েছে। গানগুলির মধ্য দিয়ে তার চরিত্র বিকশিত হয়ে উঠলেও আমাদের পূর্বে উদ্ধৃত গানগুলি ঈশ্বরের সংকেত করেছে। দর্ভকদলের গানগুলিও অধিকাংশ সাংকেতিকতার লক্ষণাক্রান্ত। তাদের 'ও অকূলের কূল ও অগতির গতি' ইত্যাদি গানটি অবশ্য গভীরতর ব্যঞ্জনাবহ নয়। কিন্তু সারাদিনের কাজের শেষে সন্ধ্যাকালে 'তাহারি পথ চেয়ে ঘরে জ্বালাই বাতি' বলে যখন তারা গান ধরে, তখন ঈশ্বরের একটা অস্পষ্ট সংকেত পাওয়া যায়। কিংবা তাদের যে গানটি আচার্যের জীবনকে শান্ত করেছে, সেই—

'পারের কাণ্ডারী গো এবার ঘাট কি দেখা যায়।
নামবে কি সব বোঝা এবার, ঘুচবে কি সব দায়।'

—পারের কাণ্ডারীর খেয়ায় চড়ে বসার চমৎকার ইঙ্গিতে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আবার মাদল বাজিয়ে দর্ভকদের নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে বাদলা দিনে কাজল মেঘে আঁধার করা তমাল বনে দিনের শেষে 'বঁধু'র জন্য প্রতীক্ষার সেই গানটি—

'নিবিড় হবে তিমির রাতি
জেলে দেব প্রেমের বাতি,
পরাণখানি দিব পাতি
চরণ রেখো তাহার পরে'।

—চিত্তে যে ভাবকে সংকেতিত করে তোলে, তাও 'বঁধুরূপী' ঈশ্বরের। অচলায়তনে গুরুর আবির্ভাব-মুহূর্তের ঠিক অব্যবহিত পূর্বে পঞ্চকের যে গানটি একটি বালক গেয়েছে, তা গুরুর চমৎকার আবির্ভাব-সংকেত—

"আলো, আমার আলো, ওগো
আলো ভুবন ভরা।
আলো নয়ন-ধোয়া আমার
আলো হৃদয় হরা।"

শোণপাংশুদের গান, তাদেরই স্বভাবধর্ম বা চরিত্র-প্রকাশক। তথাপি অচলায়তনের প্রাচীর ভেঙে দেওয়ার পর মহাপঞ্চক যখন তাদের মন্ত্রহীন, কর্মকাণ্ডহীন ম্লেচ্ছ বলে ঘৃণা প্রকাশ করেছে, তখন ঠাকুরদার সংস্পর্শে তাদের কণ্ঠে যে-গান জেগেছে তাতে ঐশ্বরিক অনুভূতির সংকেত আছে।

"যিনি সকল কাজের কাজি, মোরা
তাঁরি কাজের সঙ্গী।

... ...

ওরে ডাকেন তিনি যবে
তাঁর জলদমন্দ্র রবে
ছুটি পথের কাঁটা পায়ে দলে
সাগর গিরি লঙ্ঘি।"

॥ ৮ ॥

'অচলায়তন' নাটকটি লেখার ৬ বছর পরে ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে অভিনয়ের উপযোগী এরই এক সংক্ষিপ্ত রূপ 'গুরু' নামে রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেন। রবীন্দ্র রচনাবলীর ১৩শ খণ্ডে গ্রন্থ পরিচয়ে 'গুরু' নাটকটি সম্পর্কে বলা হয়েছে, "এই নাটকটি অচলায়তনের 'কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত ও লঘুতর' আকার। এই রূপান্তরে রবীন্দ্রনাথ অচলায়তনের অনেক অংশ বর্জন করেন এবং কয়েকটি নূতন অংশ যোগ করেন।"

প্রথমেই যেটা চোখে পড়ে সেটা হল 'গুরু' নাটকে দৃশ্য সংখ্যার হ্রাস। অচলায়তনে মোট দৃশ্য সংখ্যা ৬টি—১. অচলায়তনের গৃহ ২. পাহাড় মাঠ ৩. অচলায়তন ৪. দর্ভক পল্লী ৫. অচলায়তন এবং ৬. দর্ভক পল্লী। কিন্তু 'গুরু'তে দৃশ্য সংখ্যা ৪টি—১, অচলায়তন ২. পাহাড় মাঠ ৩. দর্ভক পল্লী ও ৪. অচলায়তন। অচলায়তনের ১ ও ৩নং দৃশ্য দুটিকে একত্রিত করে সামান্য কিছু অংশ বর্জন করে গুরুর ১নং 'অচলায়তন' শীর্ষক দৃশ্যটি রচিত হয়েছে। অচলায়তনের প্রথম দৃশ্যে পঞ্চকের গান দিয়ে নাট্যঘটনা শুরু হয়েছে, কিন্তু 'গুরু'তে একদল বালকের মধ্যে গুরু-আগমন-বার্তা নিয়ে কথোপকথনে শুরু। ১ম দৃশ্যে 'অচলায়তনে'র গানের সংখ্যাও 'গুরু'তে হ্রাস করা হয়েছে। শোণপাংশু না বলে 'গুরু'তে বলা হয়েছে 'যূনক'। দ্বিতীয় দৃশ্যটি একই নামে উভয় নাটকে রয়েছে, দৃশ্যটিকে কতকটা সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, পঞ্চক ও শোনপাংশুদের কথোপকথন এর কিছু অংশ গুরুতে (পঞ্চক ও যূনকদের কথোপকথন) কমেছে। 'ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে' পঞ্চকের এ গান এখানে বাদ দেওয়া হয়েছে। দাদাঠাকুরকে নিয়ে শোণপাংশুদের গানটিও এখানে নেই। দাদাঠাকুর ও পঞ্চকের কথোপকথন খুবই সংক্ষিপ্ত 'গুরু'তে।

তাছাড়া অচলায়তনের দুটি দর্ভকপল্লীর দৃশ্য 'গুরু'তে একটিতে আনা হয়েছে ও অনেক সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। অচলায়তনে দর্ভক পল্লীতে নাটক শেষ হয়েছে কিন্তু 'গুরু'তে 'অচলায়তনে' নাটকের সমাপ্তি। সুতরাং এখানে শেষ দৃশ্যেই গুরুর আবির্ভাব ও মহাপঞ্চকের সঙ্গে কথোপকথন। গুরুর ৩নং দর্ভকপল্লীর দৃশ্যেই গুরু পঞ্চকের সঙ্গে কথায় তার কর্তব্য নির্দেশ করে দিয়েছেন, কিন্তু মহাপঞ্চকের সম্পর্কে কিছু বলেন নি। তিনি অচলায়তনের দ্বার খুলতে যাচ্ছেন বলে চলে এসেছেন এবং শেষ দৃশ্যে যোদ্ধবেশে তাঁর আবির্ভাব ও অচলায়তন নাটকের ঐ ৫নং

দৃশ্যের মতই প্রায় ঘটনাধারা। গুরু নাটকের শেষে একটি নূতন গান দেওয়া হয়েছে—

'ভেঙেছে দুয়ার এসেছে জ্যোতির্ময়,
তোমারি হউক জয়।'

আর এ গান যূনক ও দর্ভক দলে মিলে গুরুকে প্রদক্ষিণ করতে করতে গেয়েছে। অর্থাৎ এ নাটকে দর্ভকদের এই আয়তনে প্রত্যক্ষভাবে আনা হয়েছে। গুরুর এই শেষ দৃশ্যে 'পঞ্চক'-এর প্রবেশ সম্পর্কে নাট্যকার কিছু বলেননি—এটা অবশ্য রবীন্দ্রনাথের অনবধানতা। অবশ্য একথা ঠিক যে 'গুরু' অচলায়তনের সংক্ষিপ্ত রূপই শুধু নয়, একে অভিনয়োপযোগী করা হয়েছে। তাই অচলায়তনের চেয়ে 'গুরু'র অভিনয়-মূল্য বেশী। অচলায়তনের শিথিল নাট্যবৃত্ত 'গুরু'তে অনেকখানি সংহত হয়েছে। ফলে এর নাট্যবেগ অপেক্ষাকৃত অধিক।

বাংলার মৌখিক ঐতিহ্যে রামকথা

মানস মজুমদার

ভূমিকা

রামকথার ঐতিহ্যটি প্রথমে লোকমুখেই গড়ে ওঠে। যথার্থই বলেছেন রবীন্দ্রনাথ —"রামায়ণ রচিত হইবার পূর্বে রামচরিত সম্বন্ধে যে-সমস্ত আদিম পুরাণকথা দেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল এখন তাহাদিগকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু তাহাদেরই মধ্যে রামায়ণের একটা পূর্বসূচনা দেশময় ছড়াইয়া ছিল, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।"[১] এরপর এলেন মহাকবি বাল্মীকি। মৌখিক ঐতিহ্যের রামকথাকে সুসংলগ্ন সুমার্জিত কাব্যরূপ দিলেন তিনি। মৌখিক রামকথা ব্যক্তি কবির প্রতিভাস্পর্শে শ্লোকবদ্ধ হলো, জন্ম হলো 'রামায়ণ' কাব্যের। 'রামায়ণ' কাব্যের আদিরূপটি গড়ে উঠলো আজ থেকে প্রায় ২৩০০ বছর আগে; আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৩য় শতকে।[২]

রামকথার মৌখিক ঐতিহ্যটি কিন্তু লুপ্ত হলো না। বরং উত্তর-বাল্মীকিকালে রামকথার মৌখিক ঐতিহ্যটি দুটি ধারায় বয়ে চললো। প্রথমটি সাধারণ লোকসমাজে প্রচলিত মৌখিক ঐতিহ্যের ধারা। দ্বিতীয়টি গীতিকুশল পরিস্থিতি-সচেতন শিক্ষিত গায়কদের রামকথার ধারা। রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের লবকুশের মতো এঁরা স্মৃতিনির্ভর বাল্মীকি-কাব্য গেয়ে বেড়াতেন। প্রয়োজনে শ্রোতাদের রুচি, চাহিদা ও প্রবণতা অনুযায়ী মূল কাব্যের পরিবর্তন ঘটাতে লাগলেন এই গায়কেরা। নতুন নতুন প্রসঙ্গ, চরিত্র, তত্ত্বোপদেশ সন্নিবেশিত হলো।[৩] এই সমস্ত রামকথা যখন বাল্মীকির নামে পুঁথিবদ্ধ হলো, তখন স্বভাবতই এক পুঁথির সঙ্গে অন্য পুঁথির অল্পবিস্তর প্রভেদ দেখা গেল।[৪] গায়কদের স্মৃতি-বিচ্যুতিই কথান্তরের মুখ্য কারণ। এসম্পর্কে উইনটারনিৎসের মন্তব্যটি তাৎপর্যপূর্ণ: "The only explanation for the great differences between the recensions is the fact that the text of the epic was for a long period only handed down by oral transmission. It is conceivable that the order of the verses became dislocated in the memory of the rhapsodists, that the wording must often have suffered considerable changes, and that the singers of different regions made different additions and extentions respectively."[৫] অনুমান, রামকথার মৌখিক ঐতিহ্যের ঐ দুটি ধারাই পরস্পরকে প্রভাবিত করেছে।

আরো পরে, নানা সময়ে, রামকথা-আশ্রয়ে দার্শনিক উপলব্ধির বহু বিচিত্র প্রকাশ দেখা গেল 'ভুসুন্দি রামায়ণ', 'অধ্যাত্ম রামায়ণ', 'অদ্ভুত রামায়ণ', 'যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ', 'আনন্দ রামায়ণ' প্রভৃতি গ্রন্থে।

শুধু কি তাই! ভারতবর্ষের সীমানা ছাড়িয়ে রামকথার মৌখিক ঐতিহ্য সুদূর অতীতে বিদেশে পাড়ি জমালো। পুরোহিত, ভিক্ষু, পণ্ডিত, নাবিক, বণিক, পর্যটক, —অনেকের মাধ্যমে সিংহল, বর্মা, কম্বোজ (কম্বোডিয়া), থাইল্যাণ্ড (সিয়ম), কোচিন চীন, মালয়, সুমাত্রা, জাভা, বালি, তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, চীন, কোরিয়া, জাপান, ফিলিপাইন প্রভৃতি নানা দেশে ভারতের রামকথা সমাদর পেলো, পেলো প্রতিষ্ঠা। আচার্য সুনীতিকুমারের ভাষায় এ হলো রামকথার Dig-Vijaya or "world conquest"; রামকথা হয়ে উঠলো, "a great inspiration in literature and art, throughout the greater part of Asia."[৬] দেশে দেশে রামকথার মৌখিক ঐতিহ্য নতুন নতুন রূপ নিলো।

ভারতবর্ষে বাল্মীকি-রামায়ণ কালে কালে বহু কবিকে রামকথাশ্রয়ী কাব্য ও নাটক রচনায় প্রেরণা জোগালো। ভাস লিখলেন 'প্রতিমা নাটক' ও 'অভিষেক নাটক'; কালিদাস (আনু ৪০০ খ্রীঃ) 'রঘুবংশ'; ভট্টি (আনু ৭ম শতক) 'রাবণবধ'; ভোজ 'রামায়ণ চম্পূ'; ভবভূতি (৭ম-৮ম শতক) দুটি নাটক লিখলেন 'মহাবীর চরিত' ও 'উত্তররামচরিত; কুমারদাস (৮ম-৯ম শতক) লিখলেন,—'জানকী হরণ'; অভিনন্দ (৯০০ খ্রীঃ) 'রামচরিত'; ক্ষেমেন্দ্র (১১শ শতক) লিখলেন কাব্য আর নাটক— 'রামায়ণ মঞ্জরী' ও 'কনক জানকী'; মুরারি 'অনর্ঘ রাঘব' নাটক, সন্ধ্যাকর নন্দী (১১শ-১২শ শতক) 'রামচরিত'; তার্কিক জয়দেব (১২শ শতক) 'প্রসন্ন রাঘব' নাটক। প্রাকৃতে প্রবর সেন (৫ম শতক) লিখলেন 'সেতুবন্ধ বা রাবণবধ'। সেই সঙ্গে বজায় রইলো বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় বাল্মীকি রামায়ণের অনুবাদ-প্রয়াস। তামিল ভাষায় কম্বন ('কম্বন রামায়ণম্': ১২শ শতক); বাংলায় কৃত্তিবাস (১৫শ শতক), অসমীয়ায় মাধব কন্দলী (১৬শ শতক) বাল্মীকি-রামায়ণের যে অনুবাদ করলেন তা ঠিক মূলানুগ হলো না। চললো নানা রূপান্তর। পুরনো অবধীতে তুলসীদাস (১৬শ শতক) লিখলেন 'রামচরিতমানস', যার অভিনবত্ব অনস্বীকার্য।

আঞ্চলিক ভাষায় লেখা এই সমস্ত রামায়ণ কাব্য অঞ্চল বিশেষে প্রচলিত রামকথার মৌখিক ঐতিহ্যটি যেমন আত্মসাৎ করলো, তেমনি পাঠ, পাঁচালি বা কথকতার ভিতর দিয়ে ঐ সমস্ত কাব্য লোকসমাজেও সুগভীর প্রভাব বিস্তার করলো। বহু বিচিত্র রামকথার সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠলো অক্ষরজ্ঞানহীন বা স্বল্পাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন লোকসমাজ। এ ব্যাপারে রামকথাশ্রয়ী নাটক ও যাত্রাপালাগুলির ভূমিকাও যথেষ্ট।

রামকথা ভারতবর্ষের লোকসমাজের কাছে একই সঙ্গে আনন্দ ও শিক্ষার উৎস। লোকসমাজের কতোকালের কতো হাসিকান্না, সুখ-দুঃখের সঙ্গে রামকথার যোগ! রামকথা লোকসমাজকে দেয় পথ চলার প্রেরণা, কর্তব্য-অকর্তব্যের নির্দেশ। এক-কথায় রামকথা শতাব্দী-পরম্পরায় লোকসমাজকে জুগিয়ে চলেছে মানসিক অন্নপানীয়। রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য মনে পড়ে: "রামায়ণ-কথা হইতে ভারতবর্ষের আবালবৃদ্ধবণিতা আপামরসাধারণ কেবল যে শিক্ষা পাইয়াছে তাহা নহে, আনন্দ

পাইয়াছে ; কেবল যে ইহাকে শিরোধার্য করিয়াছে তাহা নহে, ইহাকে হৃদয়ের মধ্যে রাখিয়াছে ; ইহা যে কেবল তাহাদের ধর্মশাস্ত্র তাহা নহে, ইহা তাহাদের কাব্য।"[৭]

ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের মতো বাংলার লোক-সমাজের পক্ষেও একথা সত্য। রামকথার লিখিত ধারাটির পাশাপাশি মৌখিক ঐতিহ্যের ধারাটিও বাংলার বুকে বহমান। কথকতায়, ছড়ায়, প্রবাদে-প্রবচনে, ধাঁধায়, গানে, লোকনাট্যে এই মৌখিক ঐতিহ্যের বহু বিচিত্র প্রকাশ। এখন সেই বৈচিত্র্যের অল্পস্বল্প পরিচয় দেওয়া যাক।

কথকতায় রামকথা

কথকতার শিল্পরূপটি মৌখিক। এর ঐতিহ্য বেশ পুরনো। লোকশিক্ষার ক্ষেত্রে কথকতা নিয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। ভারতকথা, ভাগবতকথার মতো রামকথাও কথকতার বিষয় হয়ে উঠেছে। কাব্য পাঠ বা আবৃত্তির সঙ্গে তার গদ্য-ব্যাখ্যা যেমন কথকতায় করা হয়, তেমনি কোনো কোনো অংশ গীত হয়, কোনো কোনো অংশকে আবার বাচিক অভিনয়ের সাহায্যে জীবন্ত করে তোলা হয়। সফল কথক হওয়ার জন্য প্রয়োজন কথকতার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা, সুরেলা সতেজ কণ্ঠস্বর, রসবোধ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও শ্রোতৃমণ্ডলীর মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে সচেতনতা। সে যাই হোক, কথকের দল রামকথাকে ধনী-নির্ধন, শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে সমস্ত বাঙালীর দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দিয়েছেন। আপন আপন বিদ্যা-শিক্ষা অনুযায়ী তাঁরা বাল্মীকি বা কৃত্তিবাসী রামায়ণের সাহায্য নিয়েছেন। কখনো কখনো তার সঙ্গে দেশজ গল্প-কাহিনী যুক্ত হয়েছে। কাল ও সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন কথকতাকে প্রভাবিত করেছে। সাধারণ লোকসমাজ কথককুলের মাধ্যমে রামকথার সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। সে পরিচয় যে ব্যর্থ হয় নি, তার প্রমাণ পাই লোকসমাজ-সৃষ্ট অজস্র ছড়ায়, প্রবাদ-প্রবচনে, ধাঁধায়, গানে বা লোকনাট্যে। রামকথাশ্রয়ী কথকতা লোকসমাজের নৈতিক উৎকর্ষ বাড়িয়েছে। যুগ-প্রয়োজনে শিক্ষা ও আনন্দদানের নতুন নতুন বহু মাধ্যমের উদ্ভব ঘটলেও কথকতার ধারাটি লোকবাংলার বুক থেকে আজো অবিলুপ্ত।

ছড়ায় রামকথা

লৌকিক ছড়ায় রাম-প্রসঙ্গের প্রয়োগ অবশ্য সামান্য। এ প্রয়োগ প্রধানত আনুষ্ঠানিক ছড়ার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। যেমন: কোনো কোনো মেয়েলি ব্রতের ছড়ায়, বিয়ের অনুষ্ঠানে নাপিতের ছড়া-কথনে বা তুকতাকের ছড়ায় রাম-লক্ষ্মণ-সীতা প্রভৃতির উল্লেখ লভ্য।

উদাহরণ হিসেবে দশপুত্তল ব্রতের ছড়ার কথা বলা যায়। দশপুত্তল বালিকাদের ব্রত। চৈত্র সংক্রান্তি এই ব্রতের কাল। ব্রতিনী এ ব্রতে কামনা জানায়: "সীতার মতো সতী হবো, রামের মতো পতি পাবো, লক্ষ্মণের মতো দেবর পাবো, কৌশল্যা

শাশুড়ী পাবো দশরথের মতো শ্বশুর পাবো।"[৮] সীতা ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ; স্বামীসর্বস্বপ্রাণা। স্বামীর সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে কায়মনোবাক্যে স্বামীর অনুগতা। ত্যাগ, সহিষ্ণুতা, তেজ ও সংকল্প-কঠোরতায় অতুলনীয়া তিনি। সীতা লোকবাংলার নারী সমাজের কাছে পত্নীত্বের চিরন্তন আদর্শ। উইনটারনিৎস ঠিকই বলেছেন: "the women love and praise Sita as the ideal of conjugal fidelity, the highest virtue of woman."[৯] মহত্ত্বে রামচরিত্র অতুলনীয়। পূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শ। নরচন্দ্রমা। ধর্মজ্ঞ, সত্য-প্রতিজ্ঞ, বিনীত, নীতিপরায়ণ, পূতচরিত্র, যশস্বী, জ্ঞানবান, জীবলোকের প্রতিপালক। গাম্ভীর্যে সমুদ্রতুল্য, ধৈর্যে হিমাচল, বলবীর্যে বিষ্ণু, সৌন্দর্যে চন্দ্র, পৃথিবীর মতো ক্ষমাশীল, ক্রোধে কালানল, বদান্যতায় কুবের, সত্যনিষ্ঠায় দ্বিতীয় ধর্ম। এ হেন রামের মতোই স্বামী বাংলার মেয়েদের কাম্য। ভারতীয় নারী সমাজের কাছে দেবরত্বের চূড়ান্ত কষ্টিপাথর হলেন লক্ষ্মণ। রামের বৈমাত্রেয় ভাই হয়েও রাম-সীতার প্রতি লক্ষ্মণের শ্রদ্ধা, আনুগত্য, ত্যাগ ও সেবামূলক মনোভাব লক্ষ্মণের এই প্রতিষ্ঠার হেতু। রাম-সীতার সঙ্গে স্বেচ্ছা-নির্বাসন বরণ করেছেন তিনি, জননী সুমিত্রা এবং পত্নী উর্মিলার আকর্ষণ তাঁকে সংকল্পচ্যুত করতে পারেনি, নির্বাসনকালে সমস্ত দুঃখকষ্ট হাসিমুখে সহ্য করেছেন, বিপদের মুহূর্তগুলিতে দেখিয়েছেন সাহস আর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সীতা-উদ্ধারে দিয়েছেন সংগ্রামী নেতৃত্ব। বিশ্বস্ত, মমতাপ্রবণ, সেবাপরায়ণ দেবর হিসেবে লক্ষ্মণ অতুলনীয়। আর তাই লক্ষ্মণ দেবরের কামনা। কৌশল্যা 'ব্রতোপবাসক্লিষ্টা', 'চিরনম্রমধুর প্রকৃতিসম্পন্না'[১০] স্নেহকল্যাণময়ী জননী। ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি। রামচন্দ্রের মতো কীর্তিমান পুত্রের জননী। পুত্রবধূর প্রতি তাঁর অপার মমতা। পুত্রবধূর জন্য অশেষ গর্ব —'তোমা হেন বধূ আমি ভাগ্য করি মানি।'[১১] শাশুড়ী হিসেবে তাই কৌশল্যাই কাঙ্ক্ষিতা। আর, দশরথ? অজাতশত্রু তিনি—'ন দ্বেষ্টা বিদ্যতে তস্য স তু দ্বেষ্টি ন কঞ্চন'। সত্যপরায়ণ, ধর্মাত্মা, সমুদ্রের মতো গম্ভীর, আকাশের মতো নির্মল। তুলনা নেই তাঁর স্নেহ-বাৎসল্যের। অসাধারণ কোমল চিত্ত। এ হেন দশরথের মতো শ্বশুরই তাই কাম্য। রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য মনে পড়ে: "রামায়ণের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাহা ঘরের কথাকেই অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইয়াছে। পিতা-পুত্রে ভ্রাতায়-ভ্রাতায় স্বামী-স্ত্রীতে যে ধর্মের বন্ধন, রামায়ণ তাহাকে এত মহৎ করিয়া তুলিয়াছে যে তাহা অতি সহজেই মহাকাব্যের উপযুক্ত হইয়াছে।...রামায়ণের মহিমা রাম-রাবণের যুদ্ধকে আশ্রয় করিয়া নাই, সে যুদ্ধঘটনা রাম ও সীতার দাম্পত্য প্রীতিকেই উজ্জ্বল করিয়া দেখাইবার উপলক্ষ মাত্র। পিতার প্রতি পুত্রের বশ্যতা, ভ্রাতার জন্য ভ্রাতার আত্মত্যাগ, পতিপত্নীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি নিষ্ঠা ও প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য কত দূর পর্যন্ত যাইতে পারে রামায়ণ তাহাই দেখাইতেছে।"[১২] 'রামায়ণ' হলো 'গৃহাশ্রমের কাব্য'।[১৩] বাংলার মেয়েলি ব্রতে গার্হস্থ্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কামনায় তাই রামায়ণের আদর্শ চরিত্রগুলির প্রাধান্য দেখি।

একটি ভাদুলী ব্রতের ছড়ায় শুনি :

সাগর! সাগর! বন্দি, তোমার সঙ্গে সন্ধি॥
রাম আসেন লক্ষ্মণ আসেন, আর আসেন নল।
তাই দেখে থেমে থাকবেন সমুদ্রের জল॥[১৪]

ব্যবসা-বাণিজ্য বা তীর্থ-ভ্রমণ উপলক্ষে যারা প্রবাসে জলযাত্রী সেই বাবা বা ভাই, স্বামী বা শ্বশুরের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের কামনায় ভাদুলী ঠাকুরানীর উদ্দেশে বাংলার মেয়েরা ভাদ্র মাসে এ ব্রত করে থাকে। ভাদুলী হলেন বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্রের শাশুড়ী। নিতান্তই লৌকিক কল্পনা। ব্রতের প্রস্তুতিপর্বে অনেক কিছুর প্রয়োজন। প্রস্তুতি পর্বের এক অঙ্গ হিসেবে উঠোন বা বারান্দায় একটি ছোট্ট গর্ত খোঁড়া হয়। গর্তটি হয় সমুদ্রের প্রতীক। তার পাশে আল্পনায় আঁকা হয় আরো ৬টি সমুদ্র। সেই সঙ্গে বড়ো এক নদী এঁকে তার ১৩টি মুখ মিশিয়ে দেওয়া হয় সমুদ্রের গায়ে। সব মিলে হলো ৭ সমুদ্র ১৩ নদী। ব্রতিনী সমুদ্র-কল্প গর্তে নদী আর বৃষ্টির জল ঢালতে ঢালতে উপরের ছড়াটি বলে থাকে। বাল্মীকি-রামায়ণের যুদ্ধ কাণ্ডের ২২ সংখ্যক সর্গে (কৃত্তিবাসী-রামায়ণের সুন্দরাকাণ্ডে) সমুদ্র-বন্ধনের প্রসঙ্গ আছে। রাম-লক্ষ্মণ সুরশিল্পী বিশ্বকর্মার পুত্র মহাবীর নলের সাহায্যে দুস্তর সমুদ্রে সেতু তৈরীতে সফল হয়েছিলেন। উত্তাল সমুদ্র হয়েছিলো রাম-লক্ষ্মণের বশীভূত। সীতা-উদ্ধারের পথ হয়েছিলো প্রশস্ত। ছড়াটিতে তাই রাম-লক্ষ্মণ-নলের উল্লেখ। প্রবাসী পরিজনদের কাছে সমুদ্র যাতে বিঘ্নসংকুল না হয়ে ওঠে তাই এ প্রার্থনা। প্রার্থনার ভিত্তিমূলে রয়েছে অনুকরণমূলক যাদুবিশ্বাস। প্রতীক সমুদ্রের কাছে প্রার্থনা জানানো হলো; বিশ্বাস, আসল সমুদ্র সে প্রার্থনায় সাড়া দেবে।[১৫] আর সমুদ্র-সম্বোধনে আদিম সর্বপ্রাণবাদ বা Animatism-এর প্রতিফলন। সমুদ্রের প্রাণ আছে, সমুদ্র বিপুল শক্তির অধিকারী, তাকে সন্তুষ্ট করে তাই স্বার্থরক্ষার চেষ্টা। বাল্মীকি-রামায়ণে (যুদ্ধকাণ্ড ২১-২২ সর্গ) বা কৃত্তিবাসী রামায়ণে (সুন্দরাকাণ্ড) অভীষ্ট পূরণের জন্য রামচন্দ্র প্রথমে সমুদ্রের উপাসনা করে পরে যে সমুদ্র-নিগ্রহে প্রবৃত্ত হয়েছেন তাও সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত।

ভাদুলী ব্রত অনেক দিনের পুরনো বলেই মনে হয়। নদী ও সমুদ্রের পুজো স্তব-স্তুতি তো বহুকাল আগে থেকেই চলে আসছে। ভাদুলী ব্রত প্রমাণ করছে, দূর অতীতেও ব্যবসা-বাণিজ্য বা তীর্থ-ভ্রমণ উপলক্ষে বাঙালী বিদেশে পাড়ি দিতো। রূপকথা, ব্রতকথা বা ব্রতকথা-আশ্রয়ী মঙ্গলকাব্যগুলিতেও অবশ্য তার পরিচয় মেলে।

বাল্মীকি-রামায়ণে দেখি রামচন্দ্রের বিয়ের অনুষ্ঠানের একটি পর্যায়ে উপস্থিত সকলের কাছে ইক্ষ্বাকু বংশের কুল পুরোহিত মহর্ষি বশিষ্ঠ এবং বিদেহরাজ জনক উভয় কুলক্রম কীর্তন করেছেন (বালকাণ্ড: ৭০-৭১ সর্গ)।[১৬] প্রথাটি একালেও চালু, অবশ্য ভিন্নরূপে। একালে নিমন্ত্রণ পত্রে পাত্রপাত্রীর অভিভাবকের পক্ষ থেকে উভয়ের বংশ পরিচিতি সংক্ষেপে দেওয়া হয় এবং পুরোহিত বিয়ের মন্ত্র উচ্চারণকালে

পাত্রপাত্রীর পিতার নাম গোত্রসহ উল্লেখ করেন। আর বাংলার কোনো কোনো অঞ্চলে উভয় পক্ষের নাপিতের ছড়া-কথনে রামচন্দ্রের বিয়ের অনুষ্ঠানটিকে একটু ভিন্নভাবে স্মরণ করা হয়। মুর্শিদাবাদ জেলার বয়াড় গ্রাম থেকে সংগৃহীত নিম্নোক্ত ছড়াটি যার নিদর্শন—

শুনুন শুনুন মহাশয় করি নিবেদন। জানকী-রামের বিবাহ করুন শ্রবণ॥ শ্রীরামের বিবাহের কালে শুনেছিলাম যেমন। হরের ধনু ভাঙিলেন শ্রীরঘুনন্দন॥ জনক প্রভৃতি করি মিথিলা নিবাসী। সভা করি বসিলেন যত বিপ্র ঋষি॥ অগ্রেতে বসিলেন যত দেবগণ। পশ্চাতে বসিলেন মিথিলার প্রজাগণ॥ আজ্ঞাতে নৃপবর গেলেন অন্তঃপুরে। কন্যা নিয়ে আসিলেন বিবাহ-মন্দিরে॥ সপ্তপাক প্রদক্ষিণ হইল যেমন। স্বর্গ হইতে পুষ্প বিষ্টি করে দেবগণ॥ আহা আনন্দিত আজ মিথিলা ভুবন॥ ·····মাল্যডালা নাড়েন যখন নরসুন্দর ভাই। রাম জানকীর বিবাহ দেখে আনন্দে সবাই॥···[১৭] এ ধরনের কোনো কোনো ছড়ায় পাই দান সামগ্রীর বর্ণনা আর অশুভ প্রতিরোধের চেষ্টা। অশুভ দৃষ্টির হাত থেকে বরকনেকে রক্ষাই যে ছড়ার উদ্দেশ্য।[১৮]

বাংলার লোকসমাজে প্রচলিত যাদুগুণসম্পন্ন কোনো কোনো ছড়ায় রাম-লক্ষ্মণ বা সীতার উল্লেখ লভ্য। যাদুমূলক এ সমস্ত ছড়াকে প্রধানত দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম শ্রেণীর ছড়াগুলি হিতকারক যাদুগুণসম্পন্ন (White magic)। যেমন, ভূত পেত্নী তাড়ানোর সেই বিখ্যাত ছড়াটি—"ভূত আমার পুত, পেত্নী আমার ঝি। রাম-লক্ষ্মণ সঙ্গে আছে করবি আমার কী?" রাম-লক্ষ্মণ এখানে রক্ষাকবচ। তাঁদের নামের মধ্যেই রয়েছে যাদু। তাঁরা হলেন অশেষ শক্তিমান। তাঁদের স্মরণে অশুভ শক্তির পরাভব ঘটে। প্রসঙ্গত 'ভূতের মুখে রাম নাম' প্রবাদটি স্মরণযোগ্য। ভূত রামকে ভয় পায়। ভূতের মুখে রাম-নাম তাই রীতিমতো অবিশ্বাস্য ব্যাপার। দ্বিতীয় শ্রেণীর ছড়াগুলি অহিতকারক যাদুগুণসম্পন্ন (Black magic)। অপরের ক্ষতি সাধনের জন্য ব্যবহৃত। যেমন এই ছড়াটি—

রাম কাটলেন কলা, সীতা দিলেন জাগ।
যে বর্ণের কলা তুই সেই বর্ণেই থাক॥[১৯]

কলার কাঁদি আধপাকা অবস্থায় কেটে তা পাকানোর ব্যবস্থা হতে চলেছে। বাংলার লোকসমাজের বিশ্বাস, সে সময় ঐ ছড়াটি বললে কলা আর পাকবে না। প্রশ্ন হলো, এমন একটি অশুভ প্রচেষ্টার সঙ্গে রাম-সীতার নাম যুক্ত হলো কি করে? বস্তুত পক্ষে, পৃথিবীর সবদেশের লোকসমাজেই ধ্বনি বা শব্দ-বিশেষের যাদুশক্তি স্বীকৃত। সে শব্দ বস্তু, স্থান, বা ব্যক্তিবাচক সব কিছুই হতে পারে। 'রাম-সীতা' শব্দে রয়েছে সেই যাদুগুণ। ক্ষতিকারক ব্যাপারেও তাই 'রাম-সীতা' শব্দের প্রয়োগ ঘটেছে। স্টিথ থম্পসনকে অনুসরণ করে বলা যায় এখানে Motif-টি হলো : 'Magic results from uttering powerful name' (D1766·7)[২০]

প্রবাদে রামকথা

উইনটারনিৎস লেখেছেন,—"Popular sayings and proverbs bear witness to the familiarity of the people with the stories of the Rāmāyaṇa."[২১] বাংলার মৌখিক প্রবাদ (Proverb), প্রবাদমূলক বাক্যাংশ (Proverbial phrase) ও বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছে (Idiom) এ মন্তব্য সমর্থিত। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

যৌবরাজ্যে রামচন্দ্রের অভিষেক অনুষ্ঠান আসন্ন, চারদিকে উৎসবের সমারোহ, কিন্তু অভিষেক অনুষ্ঠান আর সম্পূর্ণ হলো না; বিমাতার চক্রান্তে তাঁকে বনবাসে যেতে হলো। সৌভাগ্যের উচ্চচূড়া থেকে দুর্ভাগ্যের অতল গহ্বরে যেন পতন ঘটলো তাঁর (দ্র° বাল্মীকি-রামায়ণ, অযোধ্যা কাণ্ড; সর্গ: ১—৪০)। রামায়ণ-কাহিনীর এই নাটকীয়তা লোকচিত্তে তুলেছে তীব্র আলোড়ন। প্রবাদে তার চিহ্ন রয়ে গেছে—'কাল রাম রাজা হবে, আজ বনবাস'। বাল্মীকি-রামায়ণে কিন্তু দেখতে পাই, অভিষেকের জন্য নির্ধারিত দিনেই রামচন্দ্রকে বনবাসে যেতে হয়েছে। মনে হয়, আলোচ্য প্রবাদটির ভিত্তি কৃত্তিবাসী-রামায়ণের অযোধ্যা কাণ্ডের একটি পংক্তি—'রাম কালি রাজা হবে আজ অধিবাস।' একই ঘটনাকে আশ্রয় করে রচিত আর একটি প্রবাদও বাংলার লোকসমাজে সুপরিচিত। প্রবাদটি হলো—'কোথা রাম রাজা হবে, কোথা রাম বনবাসে যাবে'। জীবনের চরম সৌভাগ্যক্ষণে দুর্ভাগ্য নেমে এলে এ প্রবাদ স্মরণ করে লোকসমাজ, মানসিক শান্তি ও সান্ত্বনা খোঁজে।

'রাবণের হাতে যথা মারীচ কুরঙ্গ', 'এগুলে রাম পেছুলে রাবণ' ও 'মারীচের দশা' প্রভৃতির উৎস রামায়ণের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। বাল্মীকি-রামায়ণের আরণ্য-কাণ্ডের ৩৬ সংখ্যক সর্গে দেখি, রাবণের নির্দেশে মায়াবী মারীচ রামচন্দ্রকে ছলনায় প্রবৃত্ত। প্রবল প্রতাপান্বিত রাবণের আদেশ লঙ্ঘনের সাধ্য নেই তার। রাবণের অবাধ্য হলে মৃত্যু অনিবার্য। অন্যদিকে রয়েছেন স্বয়ং রামচন্দ্র, শক্তিশালী প্রতিপক্ষ। মারীচের সমস্ত চাতুরী যেখানে নিষ্ফল হতে বাধ্য এবং পরিণামে মৃত্যু অবধারিত। হতভাগ্য মারীচ অসহায়, 'উভয় সংকট'-এর সম্মুখীন সে। বাংলার প্রবাদ-সাহিত্যে এই অসহায়তা বাণীরূপ প্রাপ্ত। এগুলির উৎস কৃত্তিবাসী রামায়ণের কয়েকটি পংক্তি—"শ্রীরামেরে দেখিয়া মারীচ ভাবে মনে। পলাইয়া গেলে মোরে মারিবে রাবণে॥ আমারে মারিবে রাম নতুবা রাবণ। আমার কপালে আজি অবশ্য মরণ॥" (আরণ্যকাণ্ড)

রাবণের শক্তিশেলের আঘাতে রামানুজ লক্ষ্মণ হতচেতন। একমাত্র বিশল্যকরণীর প্রয়োগেই লুপ্ত সংজ্ঞা ফিরে পেতে পারেন তিনি। হনুমান তাই গন্ধমাদন পর্বত অভিমুখে ধাবিত হলো। হনুমানের অভিযান ব্যর্থ করার জন্য রাবণ পাঠালো মাতুল কালনেমিকে। কালনেমি এ কাজে সফল হলে তাকে লঙ্কা রাজ্যের অর্ধেক অংশ দানের প্রলোভন দেখালো রাবণ। কাজে সাফল্যলাভের আগেই মনে মনে লঙ্কা

ভাগে প্রবৃত্ত হলো কালনেমি। শেষপর্যন্ত হনুমানের হাতে তার বিনাশ ঘটলো। 'কালনেমির লঙ্কাভাগ'—এই শব্দগুচ্ছের উদ্ভব ঐ প্রসঙ্গ স্মরণে। বাল্মীকি-রামায়ণে এ প্রসঙ্গ নেই। কৃত্তিবাসী রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ড এর উৎস। কৃত্তিবাস কালনেমির মনে মনে লঙ্কা ভাগের যে কৌতুকপ্রদ বিবরণ দিয়েছেন তার প্রথম কয়েক পংক্তির নিদর্শন—"অতঃপর যাই আমি রাবণ গোচর। অর্ধ লঙ্কা ভাগ করি লইব সত্বর॥ দড়ি ধরে লব ভাগ উত্তর-দক্ষিণে। পূর্বদিক লব আমি না যাব পশ্চিমে॥ পশ্চিম সাগরে যদি বাঁধ ভেঙে যায়। পশ্চিমে রাবণে দিব ভাগ যত হয়॥......"

প্রবাদ রাম-নামের মাহাত্ম্য ঘোষণাকারী: 'শমন দমন রাবণ রাজা, রাবণ দমন রাম।' বাংলার লোকসমাজের বিশ্বাস: 'রাম নামে ভূত পালায়।' যুধিষ্ঠির ধর্মরাজ হতে পারেন, কিন্তু তাঁর রাজ্য আদর্শ রাজ্যের মর্যাদা পায়নি, সে মর্যাদা পেয়েছে 'রাম-রাজ্য'। 'সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই'—প্রবাদটিতে আদর্শ রাজা রামচন্দ্রের প্রশস্তি কীর্তিত।

সীতার জন্য বাংলার প্রবাদ-সাহিত্যে রয়েছে মমতাস্নিগ্ধ একটি আশ্রয়। সীতার প্রতি এ সমাজের সহানুভূতির অন্ত নেই। কেননা: 'জনম দুখিনী সীতা, নাই মাতা, নাই পিতা।' সীতা দুর্ভাগিনী: 'যাবৎ সীতা তাবৎ দুঃখ, মরলে সীতা ঘুচবে দুঃখ।' তুলনা নেই তাঁর কষ্টের: 'যাবৎ সীতা তাবৎ পরীক্ষা।' (তু° কৃত্তিবাসী-রামায়ণ, উত্তরা কাণ্ড, সীতার উক্তি—"নিরবধি অপবাদ দিতেছ আমারে। সভায় পরীক্ষা দিতে আসি বারে বারে।")[২২]

ধাঁধায় রামকথা

রামায়ণাশ্রিত মৌখিক ধাঁধার সংখ্যা অবশ্য বেশি নয়। কোনো না কোনো অদ্ভুতত্ব এ সমস্ত ধাঁধার অবলম্বন। বস্তুতপক্ষে অদ্ভুতত্বই এগুলিকে করে তুলেছে রহস্য-জটিল। ধাঁধাগুলিকে প্রধানত ৩টি শ্রেণীতে ভাগ করা চলে—

১. জন্মরহস্য নির্ভর ধাঁধা। অলৌকিক জন্ম-প্রসঙ্গ ফোকলোরের জগৎটিতে এক সুপরিচিত Motif. কর্ণ, পাণ্ডুপুত্রগণ, রামচন্দ্রাদি চার ভাই, দ্রৌপদী—সকলের জন্ম-বৃত্তান্তই অল্পবিস্তর অলৌকিক। মনসামঙ্গলের মনসার জন্মব্যাপারও অলৌকিকতা-মণ্ডিত। কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু প্রমুখ মহাপুরুষগণের জন্মবৃত্তান্তও অলৌকিক। ধাঁধার উদ্দেশ্য রহস্য-সৃষ্টি। অলৌকিক জন্ম-ঘটনা রহস্যনির্ভর। সীতার অলৌকিক জন্ম-প্রসঙ্গ স্বভাবতই তাই ধাঁধার বিষয়-মর্যাদা লাভ করেছে:

> বাপ জন্ম দিলা কিন্তু মা ছিলো না কাছে।
> ভূমিতে উৎপন্ন বটে নাহি ফলে গাছে॥
> অসম্ভব কথা যদি মানহ সকলে।
> এই কথা মিথ্যা নয়, মাটিতে নারী মিলে॥[২৩]

সীতা অযোনিসম্ভূতা, রাজর্ষি জনক হলমুখে তাঁকে লাভ করেন, ধাঁধাটির উপজীব্য

সীতার সেই জন্মরহস্য। 'Earth gives birth to woman'—এই Motif আশ্রয়ে ধাঁধাটির উদ্ভব (A 1234·4)[২৪]। প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য, অদ্ভুত রামায়ণে সীতা মন্দোদরী গর্ভজাতা। রাবণ আনীত মুনিগণের দেহরক্ত এবং মুনিবব গৃৎসমদ-সঞ্চিত মন্ত্রপূত দুগ্ধপানে মন্দোদরীর গর্ভসঞ্চারের ফলে সীতার জন্ম। স্বামী রাবণেব অনুপস্থিতিকালে মন্দোদরীর গর্ভসঞ্চার হেতু লোকলজ্জায় তিনি সদ্যোজাতা কন্যা সীতাকে কুরুক্ষেত্রভূমিতে প্রোথিত করেন। হলচালনা কালে রাজা জনক সেই কন্যাকে পান এবং কন্যাবৎ পালন করেন (৮ম সর্গ)। অদ্ভুত আচার্য (নিত্যানন্দ আচার্য) তাঁর বাংলা রামায়ণে (১৭শ শতাব্দী) বলেছেন, ইন্দ্রের বিদ্যাধরী মেনকার রূপদর্শনে রাজা জনকের রেতঃপাত ঘটলে তা স্বর্ণবর্ণ ডিম্বে পরিণত হয়। হলচালনা কালে রাজা জনকের হলের আঘাতে সেই ডিম ভেঙে কাঞ্চনবর্ণা সীতার আবির্ভাব ঘটে। আচার্য ড. সুকুমার সেন 'রামকথার প্রাক্-ইতিহাস' গ্রন্থে (১৯৭৭) জানিয়েছেন যে, ইরানীয় খোটানী ভাষার রামকথায় সীতা রাজা দশগ্রীবের (অর্থাৎ রাবণের) কন্যা। জ্যোতিষী-বাক্যে আতঙ্কিত দশগ্রীব সদ্যোজাতা কন্যাকে মঞ্জুষায় রেখে সে মঞ্জুষা নদীতে ভাসিয়ে দেন। এক ঋষি (=বাল্মীকি) সেই শিশুকন্যাকে প্রতিপালন করেন। রাম-লক্ষ্মণ দু'ভাই ঋষির আশ্রমে এলে সীতা তাঁদের প্রেমে পড়েন এবং উভয়কেই পতিত্বে বরণ করেন [পৃ. ১২-১৪]। ড. সেন আরো জানিয়েছেন, জৈন সাহিত্যে সংঘদাসের বসুদেব হিণ্ডীর চতুর্দশ খণ্ডে যে কাহিনী পাওয়া যায় তাতে আছে, "সীতা রাবণ-মন্দোদরীর কন্যা। পিতৃবংশের উচ্ছেদের হেতু হবে সে, এই ভবিষ্যদ্বাণী থাকায় একে পরিত্যাগ করে আসা হয়েছিল জনকের মাঠে। সেখানে তিনি সীতাকে লাঙলের ডগায় কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। জনকের পত্নী ধারিণী সীতাকে মানুষ করেছিলেন।" (পৃ. ১১) বাল্মীকি কথিত সীতার জন্মবৃত্তান্তের যে রূপক ব্যাখ্যা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, প্রসঙ্গত তা মনে পড়ে যায় (দ্র· ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা, ১৩১৮; 'পরিচয়' গ্রন্থভুক্ত)। রবীন্দ্রনাথের মতে, সীতার অর্থ হল-রেখা। জনক রাজার হলমুখে তাঁর উৎপত্তি এবং পাতাল-প্রবেশে জীবনের পরিসমাপ্তি। সীতা কৃষিরূপিণী। নবদূর্বাদলশ্যাম রামচন্দ্র কৃষিজাত শস্যশ্যামল রমণীয়-তারই নামান্তর। তিনি সীতাকে লাভ করেন ও রাক্ষসদের হাত থেকে তাঁকে উদ্ধার করেন। রাক্ষসেরা ছিলো অরণ্যচারী মৃগয়াজীবী। রামচন্দ্র কৃষি-সভ্যতা বিস্তারে নেতৃত্ব দেন, আর মৃগয়াজীবীদের হাত থেকে কৃষি সভ্যতাকে রক্ষা করেন। ছোট্ট একটি ধাঁধা, কিন্তু অনেক ভাবনা জাগায়।

কুশের জন্মবৃত্তান্ত আশ্রয়ী এই ধাঁধাটি বরিশাল অঞ্চল থেকে সংগৃহীত—

জন্ম দিলো না জন্মদাতা জন্ম দিলো পরে।
যখন তাহার জন্ম হলো মা ছিলো না ঘরে॥[২৫]

প্রচলিত একটি লোকবিশ্বাস, কুশ সীতার গর্ভজাত নন। সীতার বাল্মীকি-আশ্রম বাসকালে বাল্মীকি কুশ ঘাস দিয়ে একটি মূর্তি নির্মাণ করে তার প্রাণসঞ্চার করলে

তার নাম হয় কুশ। বাল্মীকি কুশকে সীতার হাতে তুলে দিয়ে তাকে লবের সঙ্গে পুত্রবৎ লালন পালন করতে বলেন। মূল বাল্মীকি রামায়ণ বা অদ্ভুত রামায়ণে অবশ্য কুশের এ জাতীয় জন্মপ্রসঙ্গ নেই। নেই কৃত্তিবাসী রামায়ণেও। পূর্ববাংলার স্ত্রী-সমাজে প্রচলিত চন্দ্রাবতীর রামায়ণে অবশ্য আছে। আর আছে তিব্বতী ভাষায় রচিত রামকথায়। আচার্য ড. সুকুমার সেন জানিয়েছেন: "রাম-সীতার এক ছেলে লব, সে হারিয়ে গেলে মুনিরা কুশ দিয়ে আর এক ছেলে গড়ে দেন।" (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৭) পশ্চিম সীমান্তবঙ্গের একটি ভাদুগানেও অনুরূপ প্রসঙ্গের প্রয়োগ লভ্য—

সীতা গেইছে সিনান কৈরতে
সীতার ছিলা নাই ঘাটে
কুশের ছিলা বেনাই মুনি
রাখ্যেছে সীতার ঘাটে।
সিনাই আস্যে শুধায় সীতা
ই ছিলা ট কে বটে
লাওমা সীতা, লাও মা সীতা
তুমারই লব কুশ বটে।[২৬]

বাংলার লোকসমাজে কুশের জন্ম সম্পর্কিত এই অলৌকিক বৃত্তান্তের প্রকৃত উৎস আমাদের অজানা। সম্ভবত এ কাহিনা লোককল্পনাজাত। এর Motifটি হলো: 'Man made from grass.' (A 1256. 1)[২৭]

২. দৈহিক বিশেষত্বনির্ভর ধাঁধা। অস্বাভাবিকতাই এক্ষেত্রে ধাঁধার প্রেরণা। কুড়িটি হাত ও কুড়িটি চোখের অধিকারী রাবণ স্বভাবতই ধাঁধার বিষয়—

হস্ত দুই শূন্যাকার চক্ষু দুই শূন্য।
দেব নয়, নর নয়, রাক্ষসেতেই গণ্য।[২৮]

আলোচ্য ধাঁধায় পাই দু'টি Motif. প্রথমটি—'Giant with many eyes' (F 531. 1.1.5), দ্বিতীয়টি—'Ten-headed giant' (F 531.1. 2.2 6)।[২৯] খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে Hesiod তাঁর Theogonia-তে গ্রীক পুরাণের একটি পুরনো কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন, যাতে ৫০ মাথা ও ১০০ হাত বিশিষ্ট তিন দৈত্য Briareōs ও তার দুই ভাইয়ের কথা বলা হয়েছে। এরা ছিলো Ouranos ও Gaia-র পুত্র।[৩০] গ্রীক পুরাণের এই কল্পনার সঙ্গে রাক্ষসরাজ রাবণের অবয়বগত কিছু সাদৃশ্য চোখে পড়ে।

রাবণ ও রাবণপত্নী মন্দোদরীকে নিয়েও ধাঁধা পাওয়া যায়। যেমন—

খয়ের ক্ষুদি বাটার পান। স্ত্রী পুরুষের বাইশ কান॥ এ বাটার পান খাবে যে। এ কথার উত্তর দেবে সে॥[৩১]

৩. দৈহিক বিশেষত্বের মতো পুরাণ-চরিত্রের আচরণ-বিশেষও ধাঁধার বিষয়। যেমন, রামচন্দ্র সম্পর্কিত এই ধাঁধাটি—

পশু নয় পশু সঙ্গে করয়ে ভ্রমণ।
কখনো যোগীর বেশ, কখনো রাজন ॥
অসম্ভব কার্য তার শুনে হাসি পায়।
পিতার কন্যার গর্ভে সন্তান জন্মায় ॥[৩২]

সীতা রামের বোন এ জাতীয় প্রসঙ্গ 'দশরথ জাতকে' (জাতক সংখ্যা ৪৬১) পাই। বাল্মীকি বা কৃত্তিবাসী রামায়ণে নেই। দশরথ জাতকে আছে, বারাণসীরাজ দশরথের অগ্র মহিষীর গর্ভে রাম-লক্ষ্মণ দুই পুত্র ও এক কন্যা সীতা জন্ম নেন। পরবর্তীকালে নানা বাধা বিপত্তি কাটিয়ে রামচন্দ্র সীতাকে বিয়ে করেন। ড. সুকুমার সেন তাঁর 'রামকথার প্রাক্-ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন—"রাম ইক্ষ্বাকু বংশের সন্তান। এই বংশে ভাইবোনের বিবাহ একদা যে একেবারে অজ্ঞাত ছিল না তার প্রমাণ বৌদ্ধশাস্ত্রে অন্যত্রও আছে।…ভাইবোনের বিবাহের কথা যে বংশের প্রসঙ্গে আছে সেই বংশেই বুদ্ধ জন্ম নিয়েছিলেন।" (পৃ. ৬৮—৬৯) আরো জানিয়েছেন তিনি, মহাবস্তুতে কোলিয়দের উৎপত্তি প্রসঙ্গে ইক্ষ্বাকু বংশের অনুরূপ আচারের উল্লেখ রয়েছে (পৃ. ৭১)।

মৌখিক এই ধাঁধাটির উৎস আমাদের অজানা। তবে জাতকের ঐ গল্প বা অনুরূপ কোন গল্পকে সম্ভাব্য উৎস বলা যেতে পারে।

গানে রামকথা

বাংলার লোকগীতিতে রামকথার প্রয়োগ-প্রাচুর্য বিস্ময়কর। বাংলার লোক-সমাজে রামায়ণের নানা প্রসঙ্গ যেমন স্বতন্ত্রভাবে গানের আকারে প্রচলিত, তেমনি আলকাপ, ঝুমুর, বোলান, টুসু, ভাদু, ঝাঁপান, সাখী, পাতা নাচ, বিয়ে, পট বা পুতুল নাচের গানেও রামকথা ব্যাপক স্থান জুড়ে রয়েছে।

মৌখিক রামায়ণ গানের মধ্যে পূর্ববঙ্গের স্ত্রীসমাজে প্রচলিত চন্দ্রাবতীর রামায়ণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চন্দ্রাবতী সপ্তদশ শতাব্দীর মনসামঙ্গলের কবি দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা। শিশুর জন্মে, উপনয়নে আর বিয়েতে তাঁর রামায়ণ গীত হয়। বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসী রামায়ণের সঙ্গে এ রামায়ণের অনেক অমিল। যেমন এতে পাই, রাম তাঁর বোন ককুয়ার প্ররোচনায় সীতাকে নির্বাসন দেন। অনুরূপ প্রসঙ্গ মালয়েশিয়া ও থাইল্যাণ্ডের রামায়ণেও দেখা যায়। সীতার পানিপ্রার্থীকে হরধনু উত্তোলন করতে হবে, এ শর্ত জনক রাজা কেন ঘোষণা করলেন সে সম্পর্কেও একটি নতুন গল্প শোনা যায় এ রামায়ণে। কুশের অলৌকিক জন্মবৃত্তান্তও এ কাব্যে লভ্য।

রামায়ণটি মূলে চন্দ্রাবতীর রচনা হলেও দীর্ঘ সময় জুড়ে মুখে মুখে প্রচারিত থাকায় তা মৌখিক স্বভাবই লাভ করেছে।

মৌখিক রামায়ণ গানের আর একটি ধারা পাই কুচবিহার-জলপাইগুড়ি অঞ্চলের 'কুষাণ' গান বা 'কুষাণে'-তে। একজন মূল গায়েনের পরিবর্তে লবকুশরূপী দুটি বালক-

গায়েনের মধ্যস্থতায় সমগ্র রামায়ণ কাহিনীটি এতে পরিবেশিত হয়। ইদানীং কুশকে বালিকার বেশে নাচতেও দেখা যাচ্ছে। কুশের নাম থেকেই সম্ভবত 'কুষাণ' বা 'কুষাণে' নামকরণ। রামায়ণ গান পরিবেশনের এই রীতিটি সুপ্রাচীন ঐতিহ্য-নির্ভর। একদা রামচন্দ্রের রাজসভায় উপস্থিত হয়ে বাল্মীকি মুনি লবকুশের মাধ্যমে সভার সকলকে রামায়ণ-গান শুনিয়েছিলেন। এ গানের গেয় রীতিটি সেকথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

বাংলার লোকসমাজে প্রচলিত গানগুলিতে রামায়ণের বিশেষ কয়েকটি ঘটনা, যেমন—দশরথের বাণে অন্ধমুনির পুত্রের মৃত্যু, রামচন্দ্রের তাড়কা বধ, অহল্যার শাপমুক্তি, হরধনু ভঙ্গ, পরশুরামের দর্পচূর্ণ, রামের অভিষেক প্রস্তুতি ও বনবাস, সীতাহরণ ও সীতাহরণে রাম-লক্ষ্মণের বিলাপ, রাবণের পতন, সন্তান-সম্ভবা সীতার নির্বাসন, অশ্বমেধ যজ্ঞ ও লবকুশের সঙ্গে লক্ষ্মণের যুদ্ধ প্রভৃতির প্রাধান্য। এ সমস্ত গানে লোকস্বভাবের প্রতিফলন কতখানি ঘটেছে ও কিভাবে ঘটেছে এখন তার কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

লোকসমাজের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সংস্কার-বিশ্বাস, ভালো লাগা-মন্দ লাগা, রসরুচি এ সমস্ত গানে প্রভাব বিস্তার করেছে। লোকসমাজের হৃদয়োত্তাপে জারিত এরা। যেমন, রামের বনগমনে লোকসমাজের প্রতিক্রিয়াটুকু ভাদুর সুরে এভাবে প্রকাশিত—

রাম নাকি রে বনে যাবি
　　মাকে ক্যানে বলো না।
মায়ের প্রাণ কি ধোয্য ধরে
　　হে রাম বনে যাইও না॥[৩৩]

শুধু কি তাই? দুর্ঘটনাজনিত অপমৃত্যুর কথা বলা হয়েছে আর একটি 'ভাদু' গানে—

রাম যখন রে পাঁচ বছরের
　　কুষ্ঠি দেখে গণকে।
হাজার বছর পরমাই রামের
　　মিত্যু আছে ফাঁড়তে।
মিত্যু আছে ফাঁড়তে রাম
　　ঘিত্য ঢাল অগ্নিতে।
বাউন-ফলার করাও হে রাম
　　পার পাবে সে ঘি হৈতে।[৩৪]

অপমৃত্যু থেকে পরিত্রাণের বিধান নির্দেশে লোকসমাজের সহজ সংস্কার-বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটেছে এখানে। প্রসঙ্গটি মূল রামায়ণ বহির্ভূত।

সীতাহরণে রামের মর্মবেদনায় সমগ্র লোকসমাজের হাহাকার-বেদনাই মেদিনীপুর জেলার বাঁশপাহাড়ী অঞ্চল থেকে সংগৃহীত নিম্নোক্ত 'ঝুমুর' গানটিতে শ্রুতিগোচর—

হের রে, লক্ষ্মণ ভাই, কুটীরেতে সীতা নাই,
রাক্ষসে গিলিল বুঝি, ভাই হে।
হা হা, ধনি, গুণমণি, কুথা গেল সীতামণি,
ব্যাকুলিত মণিহারা ফণি হে।[৩৫]

ঐ অঞ্চলের একটি 'টুসু' গানে অশোক বনে বন্দিনী শোকাতুরা সীতাকে সান্ত্বনা-বাক্য শুনিয়েছে সহানুভূতিশীল লোকসমাজ—

অশোক বনে কানছ সীতা, অশোকেরই ডাল ধরে,
কাইন্দ না, কাইন্দ না, সীতা, তোমার রাম আসবে ফিরে।[৩৬]

বাংলা কেন, সমগ্র উত্তর ভারত জুড়েই বিয়ের অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ে যে সমস্ত গান শোনা যায় তাতে রাম-সীতারই প্রাধান্য। বাল্মীকি বা কৃত্তিবাসী রামায়ণে কিন্তু রামসীতার বিয়ের বর্ণনায় এ ধরনের গীতিপ্রীতির পরিচয় নেই। উত্তর ভারতীয় লোকসমাজে শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের পাশাপাশি যে সমস্ত লোকাচার রয়েছে বিয়ের গানগুলি তার অঙ্গ। এ গান শুধু মেয়েরাই গেয়ে থাকে। বিয়ের অনুষ্ঠানকে আনন্দে ভরিয়ে তোলাই গানগুলির উদ্দেশ্য। বর-কনের গায়ে হলুদ, স্নান, বরযাত্রা, কনে সাজানো, মালা বদল, শুভদৃষ্টি, পাশা খেলা, কন্যা বিদায়, বধূবরণ, দধিমঙ্গল প্রভৃতি পর্যায়বদ্ধ নানা অনুষ্ঠানের সঙ্গে এ সমস্ত গানের যোগ। কন্যা বিদায়ের গানগুলি করুণ রসসিক্ত। যেমন, রাজশাহী অঞ্চল থেকে সংগৃহীত এই গানটি—

আগে চলে সীতা সতী পাছে চলে রাম।
রামের বামে সীতা চলে সোনার গোলোকধাম॥
যাত্রা করে সীতা সতী জনকেরি বালা।
রাম রাজার সাথে চলে হাতে ফুলের মালা॥
কাঁদে সীতা, কাঁদে রানী, কাঁদে পুরনারী।
অঝোরে কাঁদিয়া ফেরে সীতার সহচরী॥
কেঁদোনা, কেঁদোনা মাগো, আবার আসিব।
মা বলে ডাকিয়া, মাগো, পরাণ জুড়াব॥[৩৭]

সদ্য বিবাহিতা কন্যা স্বামীগৃহে চলে যায়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিদায় দিতে হয় তাকে। বিদায়ের লগ্নটিতে করুণ মর্মস্পর্শী দৃশ্যের অবতারণা ঘটে। আত্মীয়-পরিজনের হৃদয় বেদনায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। আলোচ্য গানে সেই মর্ম-যন্ত্রণাই প্রকাশিত। এ রামসীতা বাঙালী পরিবারের জামাতা ও কন্যা। রামায়ণের রামসীতা বস্তুতপক্ষে এখানে উপলক্ষ মাত্র।

'পটের গান' যথাযথভাবে উপভোগ করতে হলে গান শোনার সঙ্গে সঙ্গে তাকাতে হবে পটের ছবিগুলোর দিকে। তা না হলে পটের গানের তাৎপর্য স্পষ্ট হবে না। ছবির সঙ্গে গানের নিবিড় যোগ এখানে। ছবি আর গানের সাহায্যে পটুয়ার দল লোকবাংলার সংখ্যাতীত সাধারণের কাছে রামকথার রসটুকু পৌঁছে দেন। দুটি

ছবির মধ্যবর্তী অংশটুকু বর্ণনাত্মক গান দিয়ে ভরে তোলেন তাঁরা। সে গানের ভাষা লোকমুখবাহিত। অপুত্রক দশরথ শিকারে গেলেন—"শিকার করিতে রাজা করিলেন সাজন। সিন্ধুমনির স্তপবনে রাজা দিল দরশন॥" পটুয়ার ভাষায় 'মুনি' হন 'মনি'; 'তপোবন' হয় 'স্তপবন'। আর—"সিন্ধুমনিকে বাণ মারে সুরয নদীর কোলে। রাম নামের ধস্তি ক'রে সিন্ধু জলেতে পড়িল॥"[৩৮] কৃত্তিবাসের 'দিব্য সরোবর' পটুয়ার বিবরণে 'সুরয' নদীতে পরিবর্তিত হয়; 'সরযূ'ই 'সুরয'। মৃত্যু-মুহূর্তেও সিন্ধুমুনি অজাতক রামচন্দ্রের নামে জয়ধ্বনি দেন। লোকসমাজের ভক্তিপ্রবণতার প্রতিফলন ঘটে।

রামকথাশ্রয়ী বারোমাসী গানগুলি যুগপৎ প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্যে আমাদের বিস্মিত করে। 'কৌশল্যার বারোমাসী'তে রামের বনগমনে স্নেহবাৎসল্যময়ী জননী-হৃদয়ের আক্ষেপবেদনার মর্মস্পর্শী প্রকাশ—"মাঘ না মাসেতে রামরে বনবাসে যায়। অভাগিনী রামের মাগো কান্দিয়া বেড়ায়॥ রাজা অইত্যা রাজ্য লইত্যা মনে ছিল সাধ। কেকই মা পাষাণী অইয়া ঘটায় পরমাদ॥..."[৩৯] মাস যায়, মাস আসে। পুত্র-বিরহিণী জননী কৌশল্যার হাহাকার বাড়ে। বনবাসকালে রাম-সীতা-লক্ষ্মণের দুঃখভোগ সংক্রান্ত বারোমাসীও রয়েছে। "প্রথম চৈতেতে রাম কাননে প্রবেশ। শিরে জটা ধরেন রাম সন্ন্যাসীর বেশ॥...আইলা বৈশাখ মাস জলন্ত অনল। চলে যাইতে পুড়ে রামের চরণ কমল॥...জ্যেষ্ঠেতে যতেক দুঃখ পাইলা কাননে। আগো, সেই দুঃখের কথা সয়ে মনুষ্য পরাণে॥ আইলা আষাঢ় মাস বরিষার সময়।...ভিজিতে ভিজিতে রাম যায় তরুতল॥ শরাবনে দাও গো, লক্ষ্মণ, বাঁধিয়ে কুটির। রামসীতা কুটির ভিতর, লক্ষ্মণ বাহির॥ ভাদরে হৃদয়-জ্বালা সইতে নারি ঘরে। দারুণ কষ্টের পালা—রক্ত বহে নীরে॥...আশ্বিনে অম্বিকা-পূজা এ তিন ভুবনে। সন্ধিসেবা করেন রাম গহন কাননে॥...কার্তিকে কুটির ছাড়ি যান অন্য বনে। সারাদিন দেখা নাই ফলমূলের সনে॥...আইল অগ্রাণ মাস বাঁধিয়ে আপন। নতুন অন্ন খেতে প্রভুর সাধ গেল মন॥ ..পৌষে প্রলয় শীত ঘনায় হতাশ। আগো হিমালয় হইতে এবার আইলা বাতাস॥ · মাঘের মকর যাত্রা পঞ্চমীর তিথি। একচিত্তে পূজেন রাম দেবী সরস্বতী॥ ...ফাল্গুনে দুঃখের কথা সইতে নারি ঘরে।..."[৪০] লোকবাংলার মাটি জল উৎসব আর পূজাপার্বণকে ঘিরেই এ বারোমাসীর উদ্ভব। অশোক বনে বন্দিনী সীতার বারমাস্যাতেও[৪১] প্রধান ভূমিকা নিয়েছে বাংলার পল্লীপ্রকৃতি। পতি-বিরহিণী সীতার প্রতি লোকবাংলার নিবিড় সহানুভূতি ও সহমর্মিতা এ গানের আদ্যন্ত লভ্য। পূর্বোক্ত বারমাস্যাদ্বয়ও কৌশল্যা বা রাম-লক্ষ্মণ-সীতার প্রতি লোকসমাজের সুগভীর শ্রদ্ধা-প্রীতি মমতাসম্ভূত। এ জাতীয় বারমাস্যা সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য নিঃসন্দেহে সমর্থনযোগ্য: "they are rich in sincerity though not in craftmanship of composition."[৪২]

বাল্মীকি রামায়ণের বালকাণ্ডে দেবর্ষি নারদ ও বাল্মীকি মুনির কথোপকথনে বেশ

বোঝা যায়, রামচন্দ্রকে আশ্রয় করে আদর্শ মনুষ্য চরিত্রের মাহাত্ম্যখ্যাপনই তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো। রাম-চরিত্রে বিষ্ণুর মহিমা পরবর্তীকালে আরোপিত। উইনটারনিৎস বলেছেন—"only in Books I and VII is Rāma throughout conceived as a divine being an incarnation of the god Viṣnu. In Books II to VI, apart from a few passages which are doubtless interpolated, he is always only a mortal hero, and in all indisputably genuine parts of the epic there is no indication whatever of his being conceived as an incarnation of Viṣnu.[৪৩] মধ্যযুগের বাঙালী রামায়ণকারেরা রামচন্দ্রকে দেবতার আসনেই বসিয়েছেন। ভক্তের দৃষ্টিতে রামলীলা বর্ণনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন এই কবিকুল। রামচন্দ্র তাঁদের কাছে বিষ্ণুর অবতার বিশেষ। রাম-বৈরী রাবণ ও তার অনুচরবর্গ প্রচ্ছন্ন ভক্তমাত্র। ড. দীনেশচন্দ্র সেনের মন্তব্য এ-প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। তিনি লিখেছেন—"· the Bengali Poets could not convey an adequate idea of the grand sweep of the epic master's verses, nor of the strain to his lofty poetry.......The Bengali Poets will be shown here in their full glory—in their originality and strength, fully capable of adding a glorious leaf to the great epic and even outshining Vālmīki in many points. The *bhakti*-cult preached with so much force in its pages makes it a fountain of emotional felicities not to be found in the Rāmāyaṇa of Vālmīki. It is certainly a marvel that the battle-fields in the hands of the poets were changed into pulpits and the Rakṣasas into reformed Vaiṣṇavas of the Gauḍiya order !"[৪৪]

বাংলা রামায়ণের শ্রেষ্ঠ কবি কৃত্তিবাস তাঁর কাব্যের আদ্যন্ত নারায়ণের নরলীলার মাহাত্ম্য প্রতিপাদন-প্রয়াসী—"জন্মিলেন নারায়ণ, বধিবারে দশানন, দেবেরে করিতে অব্যাহতি।"[৪৫] নামভক্তিবাদের প্রচারক তিনি। রাম ভক্তবৎসল, তাঁর নাম-উচ্চারণেই ভক্তের মুক্তি, এই সহজ সরল বিশ্বাসের কীর্তনীয়া তিনি। রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য স্মরণযোগ্য—"কৃত্তিবাসের রামায়ণেও এই ভাবটি ধরা দিয়াছে। ভগবান যে শাস্ত্রজ্ঞানহীন অনাচারী বানরদেরও বন্ধু, কাঠবিড়ালির অতি সামান্য সেবাও যে তাঁহার কাছে অগ্রাহ্য হয় না, পাপিষ্ঠ রাক্ষসকেও যে তিনি যথোচিত শাস্তির দ্বারা পরাভূত করিয়া উদ্ধার করেন, এই ভাবটিই কৃত্তিবাসে প্রবল হইয়া ভারতবর্ষে রামায়ণ কথার ধারাকে গঙ্গার শাখা ভাগীরথীর ন্যায় আর একটা বিশেষ পথে লইয়া গেছে।"[৪৬] কৃত্তিবাস অবশ্য নাম-ভক্তিবাদের উদ্ভাবক নন। ভারতবর্ষের মাটি-জলের মধ্যেই রয়েছে তার অস্তিত্ব। কৃত্তিবাসের সমসাময়িক কালে বা কিছু পরে আবির্ভূত কবীর (আনুঃ ১৪৪০—১৫১৮ খ্রীঃ), নানক (১৪৬৯—১৫৩৮ খ্রীঃ), চৈতন্যদেব (১৪৮৬—১৫৩৩ খ্রীঃ), তুলসীদাস (আনুঃ ১৫২৩/৩১—১৬২৩/২৪ খ্রীঃ) প্রমুখ সাধুসন্ত

মহাপুরুষগণ প্রচারিত নাম-ভক্তিবাদের কথা এ-প্রসঙ্গে স্বভাবতই মনে পড়ে। কৃত্তিবাসের কৃতিত্ব, লোকমানসে ভক্তিবিশ্বাসের যে ফল্গুধারাটি প্রবহমান ছিলো রামকথা আশ্রয়ে তাকে দুকুলপ্লাবী ভাগীরথীর গতিসৌন্দর্য দান করলেন তিনি। লোকচিত্তে যা বিপুল আলোড়ন তুললো। শ্রীচৈতন্যের জীবনাদর্শ ও বাণী আর গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মান্দোলন যে পরবর্তী বাঙালী রামায়ণকারদের এ বিষয়ে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করলো তাতেও সন্দেহ নেই।

বাংলার লোকগীতিতে ভক্তিবাদের দৃষ্টান্ত সহজলভ্য। সামান্য কিছু দৃষ্টান্ত দিই। মেদিনীপুর জেলার হাতিবাড়ি অঞ্চল থেকে সংগৃহীত একটি 'ঝুমুর' গানের বিষয় রামচন্দ্রের হাতে পরশুরামের দর্পচূর্ণ। অনুরূপ প্রসঙ্গ-বর্ণনায় কৃত্তিবাসের পরশুরাম রামচন্দ্রের শরণাগত—"চিনিলাম তোমারে যে তুমি নারায়ণ।" (আদি কাণ্ড) আর আলোচ্য 'ঝুমুর' গানটিতে পরশুরামের উদ্দেশে ধ্বনিত হয়েছে ভক্তিব্যাকুল লোকসমাজের সতর্কবাণী—"পূর্ণ ব্রহ্মে না চিনিস হইয়ে ছন্নমতি। গোলোকের অধিপতি রাম নারায়ণ ॥"[৪৭]

মেদিনীপুর জেলার বাঁশপাহাড়ী অঞ্চলে প্রাপ্ত এই 'টুসু' গানটিতে যে সতর্কবাণী শোনা যায় তারও উৎস ভক্তিপ্রাণতা—

কেন মরবি রাবণ,
রামের নারী সীতারে ক'য়ে হরণ।
মানুষ নয় রাম রঘুমণির পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ।
ভাব অবতার তার রূপে করিতে দুষ্টের দমন।[৪৮]

কৃত্তিবাস ছিলেন ভক্তিরসের কারবারী। সহজেই লোকচিত্ত জয় করেছিলেন। বাংলার মৌখিক ঐতিহ্যে রাম-ভক্তিবাদের যে পরিচয় পাই তার পিছনে কৃত্তিবাসের প্রেরণা-সঞ্চারী প্রভাব অনস্বীকার্য।

লোকনাট্যে রামকথা

বাংলার লোকসমাজে লোকনাট্যের ধারাটি বেশ পুরনো। সপ্তম থেকে নবম শতাব্দীর ভিতর লেখা 'বৌদ্ধগান ও দোহা'য় 'বুদ্ধ নাটক' নামে যে নাটকের উল্লেখ রয়েছে তা আসলে লোকনাট্য। অনুমান করা চলে, সেকালে বা আরো পরে রামকথা নিয়ে এ ধরনের লোকনাট্যের চলন ছিলো। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্য-বিশেষ প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য। তাঁর মতে—"There was a time when the life of the Buddha offered the universal theme of Bengali folk-drama. Next to the Buddha, Krishṇa and Rāma both appeared on the scene. It is apparent that Krishṇa was immediately followed by Rāma, but the latter could not replace Krishṇa whose cult found a congenial environment for natural development on the soils of

Bengal. However, parallel with Krishṇa of the Bhāgavata Purāṇa, Rāmachandra of the Rāmāyaṇa also played a significant role as the hero of folk drama of Bengal from the medieval period upto the present time."[৪৯] মধ্যযুগে 'রামযাত্রা'র যে ঐতিহ্য গড়ে ওঠে তা আসলে লোকনাট্যই। ড. ভট্টাচার্য এর বিশেষত্ব ও ইতিহাস নির্দেশ করতে গিয়ে লিখেছেন—"Rāma-Yātrā is a form of folk drama based on the theme of the Rāmāyaṇa. At the time of its origin during the medieval ages it developed a religious character and was devotional in spirit. But in the course of time with the deterioration of its artistic character it developed a secular character. Rāma's worship of Caṇḍī before his attempt to kill Rāvaṇa and ultimately killing of Rāvaṇa by Rāma from the principal theme of the drama. The character of Hanumān plays a main role in it, but instead of creating a feeling of devotion, he performs rather a comic role today. Prose dialogues are occasionally used by the characters but there is no written text from them. They learn it orally from the senior members of the party. The theme mainly advances through vocal music performed by a class of vocalists who are not characters of the drama. All the while the vocalists go on repeating their music with the accompaniment of native instruments though a violin is also used to compose the orchestra. The characters participating in the performances are only few. Therefore, it is less expensive to hold its performance.

... ...

Though secular in character Rāma-Yātrā was generally performed during the great Bengali festival Durgā-Pūjā in the Autumn, Rāmachandra's worshipping of Durgā or Chaṇḍi being its main theme. But it failed to develop any artistic excellence either in performance or in literary composition. Moreover, with its secularization and loss of devotional sentiment it lost its appeal among the people."[৫০]

বর্তমানে শহরে রঙ্গমঞ্চ আর আধুনিক যাত্রার প্রভাবে লোকনাট্য ক্ষীণপ্রাণ। এগুলির মধ্যে নদীয়া-মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের কোনো কোনো 'বোলান' পালা রামকথাশ্রয়ী। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর' ৩য় খণ্ডে এ ধরনের বেশ কয়েকটি পালা মুদ্রিত হয়েছে (পৃঃ ১৪৮৪-১৫০২)।

উপসংহার

বাংলার মৌখিক ঐতিহ্যে রামকথার রূপবৈচিত্র্য অনস্বীকার্য। ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধার তুলনায় অবশ্য রামকথাশ্রয়ী গানেরই সংখ্যা-প্রাচুর্য। বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনে রামকথা নিয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। বাঙালীর বিয়ের আসরে রামলীতার আবির্ভাব ঘটেছে; বাঙালী কন্যা কামনা করেছে রামের মতো আদর্শ স্বামী, দশরথের মতো আদর্শ শ্বশুর, কৌশল্যার মতো আদর্শ শাশুড়ী, লক্ষ্মণের মতো আদর্শ দেবর। বাণিজ্য ও তীর্থযাত্রা থেকে নিকট পরিজনের সফল প্রত্যাবর্তন-বাসনায় বাংলার স্ত্রী-সমাজ রাম-লক্ষ্মণ-নলকে স্মরণ করেছে। রাম-লক্ষ্মণ নামোচ্চারণে অশুভ শক্তিকে অগ্রাহ্য করার সাহস খুঁজে পেয়েছে বাংলার লোকসমাজ। রামকথার অন্তর্ভুক্ত পাত্র-পাত্রী বিশেষের জন্ম-রহস্য বা দৈহিক বিশেষত্ব লোকসমাজকে আকর্ষণ করেছে, উদ্ভট আচরণ করেছে বিস্মিত। প্রবাদ, প্রবাদমূলক বাক্যাংশ আর বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছের ভাণ্ডারটি রামকথা থেকে লব্ধ উপাদান-উপকরণ সহায়তায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। রামকথা আস্বাদনে এ সমাজ আনন্দ পেয়েছে, শিক্ষা নিয়েছে, সতর্ক হয়েছে। রামচন্দ্র বাংলার মাটিতে কখনো পূর্ণ ব্রহ্মের বেশে আবির্ভূত, কখনো বা 'ঘরের ছাওয়াল'টি!

সত্যের খাতিরে অবশ্য স্বীকার করতেই হয় যে, বাংলার মৌখিক ঐতিহ্যে রামকথার তুলনায় শিবকথা ও কৃষ্ণকথারই প্রাধান্য। 'ধান ভানতে শিবের গীত' বা 'কানু ছাড়া গীত নাই' প্রবাদবাক্যে ঐ সত্যেরই প্রতিফলন। বাংলার লোকসমাজ প্রাত্যহিক জীবনাচরণে রামচন্দ্রের সংগ্রামী মনোভাবকে শেষপর্যন্ত বরণ করেনি, দরিদ্র অলস নেশাগ্রস্ত শিব ও তস্য ভার্যা শিবানীর প্রতিই বরং অধিকতর প্রীতিপক্ষপাত দেখিয়েছে; শিব-শিবানীর দাম্পত্য-কলহ পরমানন্দে উপভোগ করেছে; রাধাকৃষ্ণের প্রেম-বিলাস-কলা-কুতূহলী হয়েছে। সমাজ-সংসারের শাসনমুক্ত ইন্দ্রিয় সম্ভোগাত্মক প্রণয়লীলা বাংলার লোকসমাজকে আত্যন্তিক আকর্ষণ করেছে। একদা 'গ্রাম্য-সাহিত্য' প্রবন্ধে ('লোকসাহিত্য' গ্রন্থভুক্ত) এজন্য আক্ষেপ জানিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ —"এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, পশ্চিমে, যেখানে রামায়ণ-কথাই সাধারণের মধ্যে বহুল পরিমাণে প্রচলিত সেখানে বাংলা অপেক্ষা পৌরুষের চর্চা অধিক। আমাদের দেশে হরগৌরী-কথায় স্ত্রী-পুরুষ এবং রাধাকৃষ্ণ-কথায় নায়ক-নায়িকার সম্বন্ধ নানারূপে বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু তাহার প্রসর সংকীর্ণ, তাহাতে সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের খাদ্য পাওয়া যায় না।·· বাংলা দেশের মাটিতে সেই রামায়ণ-কথা হরগৌরী ও রাধাকৃষ্ণের কথার উপরে যে মাথা তুলিতে পারে নাই তাহা আমাদের দুর্ভাগ্য। রামকে যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে ও কর্মক্ষেত্রে নরদেবতার আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের পৌরুষ, কর্তব্যনিষ্ঠা ও ধর্মপরতার আদর্শ আমাদের অপেক্ষা উচ্চতর।"[৫১]

বাংলার লোকসমাজে শিবোপাসক বা কৃষ্ণোপাসকের সংখ্যা কম নয়। রামোপাসনার কোনো ঐতিহ্য কিন্তু বাংলার মাটিতে শক্ত প্রতিষ্ঠা পায়নি।

উল্লেখপঞ্জী

১. সাহিত্যসৃষ্টি (আষাঢ় ১৩১৪); সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী, শতবার্ষিক সংস্করণ, ১৩শ খণ্ড, পৃঃ ৭৮৮।

২. "It is probable that the original Rāmāyaṇa was composed in the third century B. C. by Vālmīki on the basis of ancient ballads."—M. Winternitz. A History of Indian Literature, Vol I, Section II, The popular Epics and the Purāṇs, The age of the Rāmāyaṇa, p. 517. (Oriental Books Reprint Corporation, New Delhi, Reprinted, 1977) জ্যাকবি, ওয়েবার প্রমুখ পণ্ডিতদের মতামত বিচার করে উইনটারনিৎস শেষপর্যন্ত ঐ সিদ্ধান্তে এসেছেন।

৩. এ-বিষয়ে উইনটারনিৎসের উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি লিখছেন: "We must imagine the Rāmāyaṇa as having been orally transmitted for a long time—perhaps through centuries—in the circles of travelling singers like the brothers Kuśa and Lava in the uttara-kāṇḍa. These singers or minstrels regarded the epic songs as their property, with which they took every kind of liberty. If they noticed that the audience was deeply moved by the touching plaints of Sitā, Daśaratha or Kauśalyā, they would fabricate a number of additional verses, so that they could linger over it for a longer time; if the battle-scenes met with greater appreciation from a more warlike public, then it was easy for the singer to gather together more and more new heroes for duels, to have a few more thousands or tens of thousands of monkeys or Rākṣasas slaughtered or to relate again with a little variation a heroic deed which had already been related; if the audience enjoyed comical scenes, especially those in which the monkeys appear, then it was tempting for the singer not only to spin out such scenes, but also to add new similar ones; if he had a learned audience of Brahmans before him, he sought to win their favour by spinning out the didactic portions, adding new moral maxims or inserting aphorisms taken from elsewhere;" (A History of Indian Literature, Vol I, Section II, The popular Epics and the

Purāṇs, The genuine and the spurious in the Rāmāyaṇa, P. 496—497.)

৪. এ সম্পর্কে উইনটারনিৎসের মতামত হলো : "We can, however, only speak of a 'more or less' definite form of the Rāmāyaṇa, for the manuscripts in which the epic has come down to differ us, greatly from one another, and there are at least three different recensions of the text, representing the transmission in different regions of India. These recensions differ from one another not only in reference to various readings of certain passages, but also in the fact that in each of them verses, long passages and even whole cantos occur, which are missing in others, also the order of the verses is very frequently different in the different recensions." (Ibid, P. 498)

৫. Ibid, P. 499.

৬. The Rāmāyaṇa—Its character, genesis history expansion and exodus a résumé (Prajña, Calcutta, 1978), P. 36.

৭. রামায়ণ (১৩১০), প্রাচীন সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী, শতবার্ষিক সংস্করণ, ১৩শ খণ্ড, পৃঃ ৬৬২ (৬)।

৮. ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক, বাঙলা ছড়ার ভূমিকা, কলকাতা, ১৯৭৮, পৃঃ ৪।

৯. A History of Indian Literature, Vol I, Section II, The popular Epics and the Purāṇs, The Rāmāyaṇa, both a popular epic and an ornate Poem, P. 477.

১০. ড. দীনেশচন্দ্র সেন, রামায়ণী কথা, কৌশল্যা (জিজ্ঞাসা সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৬৩), পৃঃ ১০৪।

১১. কৃত্তিবাসী-রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড (সাক্ষরতা সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৭৪), পৃঃ ৯৫।

১২. রামায়ণ (১৩১০), প্রাচীন সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী, শতবার্ষিক সংস্করণ, ১৩শ খণ্ড, পৃঃ ৬৬২(৫)।

১৩. পূর্বোক্ত প্রবন্ধ।

১৪. দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, দক্ষিণারঞ্জন রচনাসমগ্র, প্রথম খণ্ড, ঠাণদিদির থলে—বাংলার ব্রতকথা, কলকাতা, ১৯৭৯, পৃঃ ৩৭৯।

১৫. Stith Thompson-এর Motif-theory অনুযায়ী এখানে যে Motifটি পাই তা হলো : 'Magic results from worshipping god (goddess).' —D 1766·10. দ্র· Stith Thompson, Motif-Index of Folk-Literature, vol 2, P. 317 (Indiana University Press)

১৬. কৃত্তিবাসী-রামায়ণের আদিকাণ্ডে বিয়ের আসরে দুই পুরোহিত শতানন্দ ও বশিষ্ঠ চন্দ্রবংশ ও সূর্যবংশের কুলজি শুনিয়েছেন।

১৭. শ্রীঅহিভূষণ প্রামাণিকের কাছ থেকে মুর্শিদাবাদ জেলার পাঁচগ্রাম নিবাসী শ্রীসুশান্তকুমার সরকার কর্তৃক সংগৃহীত। শ্রীপ্রামাণিক ছড়াটি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন।

১৮. দ্র' ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক, বাংলা ছড়ার ভূমিকা, ১৯৭৮, ১৩৯ সংখ্যক ছড়া।

১৯. বীরভূম জেলা থেকে নিজস্ব সংগ্রহ।

২০. Motif Index of Folk-Literature, vol. 2, p. 317.

২১. A History of Indian Literature, vol. 1, p. 477.

২২. প্রবাদ, প্রবাদমূলক বাক্যাংশ ও বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছগুলি ড. সুশীলকুমার দে-র 'বাংলা প্রবাদ' (১৯৫২) গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

২৩. ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসাহিত্য, ৫ম খণ্ড, ১৯৭১, পৃঃ ৯৩।

২৪. Stith Thompson, Motif Index of Folk-Literature, vol. 1, 1966, p. 206.

২৫. ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৯১।

২৬. রামশঙ্কর চৌধুরী, ভাদু ও টুসু, ১৯৭৭, পৃঃ ৭০।

২৭. Stith Thompson, Ibid, vol 1, p. 208.

২৮. ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৮৮।

২৯. Stith Thompson, Ibid, vol 3, p. 143.

৩০. Dr. S. K. Chatterji, The Rāmāyaṇa its character, genesis, History Expansion and Exodus A Résumé, 1978, p. xv.

৩১. ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৮৯।

৩২. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৯১।

৩৩. রামশঙ্কর চৌধুরী, ভাদু ও টুসু, পৃঃ ২৭।

৩৪. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৮।

৩৫. ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর, ২য় খণ্ড, ১৯৬৬, পৃঃ ৭২৫।

৩৬. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৮২২।

৩৭. ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর, ৩য় খণ্ড, ১৯৬৫, পৃঃ ১৪৩০।

৩৮. ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসাহিত্য, ৩য় খণ্ড, ১৯৬৫, পৃঃ ৬২।

৩৯. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৫৬০-৫৬১।

৪০. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৫৬২-৫৬৪।

৪১. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৫৬৪-৫৬৬।

42. Dr. Bhabatosh Datta, The Rāmāyaṇa in Bengal, The Ramayana Tradition in Asia (Sahitya Academi), 1980, p. 560.

৪৩. M. Winternitz, A History of Indian Literature, Vol I, Section II, p. 496.

৪৪. Dr. Dinesh Chandra Sen, Bengali Ramayanas (1920), Chapter III, p 98-99.

৪৫. আদি কাণ্ড, সাক্ষরতা সংস্করণ, ১৯৬৩, পৃঃ ৫১।

৪৬. 'সাহিত্য সৃষ্টি', সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী, শতবার্ষিক সংস্করণ, পৃ ৭৯১।

৪৭. বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর, ২য় খণ্ড, ১৯৬৬, পৃঃ ৭২৪।

৪৮. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৮২৪।

৪৯. Oral Tradition of the Rāmāyana in Bengal, The Ramayaṇa Tradition in Asia, 1980, p. 608-609.

৫০. Ibid, p. 609-610.

৫১. রবীন্দ্র-রচনাবলী, শতবার্ষিক সংস্করণ, ১৩শ খণ্ড, পৃঃ ৭৩৩-৭৩৪।

অন্যথাখ্যাতিবাদ—মীমাংসক বনাম নৈয়ায়িক

অশোক চট্টোপাধ্যায়*

জ্ঞান সাধারণত দু প্রকার—প্রমাজ্ঞান ও ভ্রমজ্ঞান। যে জ্ঞান জ্ঞেয় বস্তুর প্রকৃত স্বরূপকে বিষয় করে উৎপন্ন হয় সেটি প্রমাজ্ঞান। এটি স্বীয় বিশেষ্যে স্বকীয় প্রকারের অবাধিত সম্বন্ধকে বিষয় করে। আর যে জ্ঞান এক বস্তুতে অন্য বস্তুর স্বরূপকে বিষয় করে তা হল ভ্রমজ্ঞান। এই জ্ঞানে বিশেষ্য ও বিশেষণের সম্বন্ধটি বাধিত। কিন্তু ন্যায়দর্শন অনুসারে এই দু প্রকারের জ্ঞান ভিন্ন আর একপ্রকার জ্ঞান আছে, তাকে নির্বিকল্পক জ্ঞান বলা হয়ে থাকে। এটি প্রমা বা ভ্রম কোন শ্রেণীরই অন্তর্গত নয়। তার কারণ এই জ্ঞানে কারও সঙ্গে কারও বিশেষ্যবিশেষণভাব থাকে না।

মোট এই তিন শ্রেণীর জ্ঞানের মধ্যে ভ্রমজ্ঞান প্রায় কোনও দার্শনিকের অস্বীকৃত না হলেও তার উপপাদনের প্রণালীগত নানাপ্রকার ভেদ দেখা যায়—আর তার ফলেই আত্মখ্যাতি, অসৎখ্যাতি, অখ্যাতি, অন্যথাখ্যাতি ও অনির্বচনখ্যাতি এই পাঁচ প্রকার খ্যাতিবাদের উদ্ভব হয়েছে। প্রাচীন পরম্পরাক্রমে এদের এক সংগ্রাহক শ্লোক প্রচলিত আছে—

> "আত্মখ্যাতিরসৎখ্যাতিরখ্যাতিঃ খ্যাতিরন্যথা।
> তথানির্বচনখ্যাতিরিত্যেতৎ খ্যাতিপঞ্চকম্ ॥"

দার্শনিকদের দৃষ্টিতে একটা উদাহরণের সাহায্য নিয়ে এগুলি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। শুক্তিকে রজত বলে বোঝা ভ্রম জ্ঞান। এ ক্ষেত্রে রজতের যে প্রত্যক্ষ হয় তা প্রায় সকল সম্প্রদায়ই স্বীকার করেন। প্রায় বলার কারণ আছে। মীমাংসক প্রভাকরের মতে এ ক্ষেত্রে রজতের স্মরণ স্বীকার করা হয়—প্রত্যক্ষ নয়। কিন্তু মজার কথা এই যে দৃশ্যমান যে স্থানে শুক্তিখণ্ড আছে সেখানে রজত নেই—এটাও সর্ববাদিসম্মত। কারণ রজত যদি থাকত তবে তার প্রমাত্মক প্রত্যক্ষই উৎপন্ন হত। সুতরাং 'ইদং রজতম্' এই জ্ঞানের উপপাদন নিয়ে বিভিন্ন খ্যাতিবাদের অবসরই হত না। অতএব প্রত্যক্ষবাদীরাও অবশ্য স্বীকার করেন যে সেখানে প্রকৃতপক্ষে রজত নেই। এখন স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে—যেখানে যেটি নেই সেখানে তার প্রত্যক্ষ হয় কিভাবে? প্রত্যক্ষের প্রতি বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষই কারণ। সন্নিকর্ষ মানে সম্বন্ধ। তাহলে রজত ঐ স্থানে না থাকায় তার সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধই তো হতে পারে না।

অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত বৌদ্ধরাও এ নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই সম্প্রদায় চার প্রকার—মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক নামে খ্যাত। এদের

---

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের রীডার।

মধ্যে মাধ্যমিক সম্প্রদায় হল শূন্যতাবাদী। তাঁরা বাহ্য ও আন্তর কোন বস্তুরই যথার্থ সত্তা স্বীকার করেন না। ব্যবহারিকসত্তাসম্পন্ন জ্ঞানে অসৎ বিষয়ই ভাসমান হয়ে থাকে। 'ইদং রজতম্' এ ক্ষেত্রে বিশেষ্য শুক্তিখণ্ড এবং বিশেষণ রজত এ দুটিই অসৎ। কাজেই তাদের খ্যাতি অর্থাৎ ব্যবহারিক যে জ্ঞান হয় তা হল অসৎখ্যাতি। নৈয়ায়িক দৃষ্টিতে এই মতের বিরুদ্ধে প্রধান বক্তব্য এই যে—দৃশ্যমান বস্তুকে অসৎ বলা যায় না। কারণ যা অসৎ অর্থাৎ আকাশকুসুমের মত অলীক, তার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ কোনক্রমেই সম্ভব নয়। যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক সম্প্রদায়ের মতে এখানে আত্মখ্যাতি স্বীকার করা হয়—কারণ তাঁরা সকলেই জ্ঞানের সত্তা স্বীকার করে থাকেন। আর জ্ঞানই তাঁদের মতে আত্মা। যোগাচার সম্প্রদায় কেবল ঐ আত্মার অর্থাৎ বিজ্ঞানেরই সত্তা স্বীকার করেন। তাঁদের মতে বাহ্যপদার্থের সত্তা নেই, কিন্তু অনাদি অবিদ্যাবাসনার ফলে জ্ঞানে নানা বাহ্যাকার আরোপিত হয় মাত্র। সৌত্রান্তিকগণ অনুমেয়রূপে, বৈভাষিকগণ প্রত্যক্ষরূপে বাহ্যপদার্থের সত্তা স্বীকার করেন।

'ইদং রজতম্' এক্ষেত্রে এই তিনটি বৌদ্ধ সম্প্রদায়েরই সমাধানের রীতি হল—ধর্মিপ্রদেশে রজত অসৎ হলেও আত্মস্বরূপজ্ঞানে আরোপিতরূপে তার সত্তা আছে আর সেটিই জ্ঞানের বিষয় হয়। তাই এটি আত্মখ্যাতি। তবে যোগাচারের সঙ্গে সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিকের মতভেদ মাত্র এই অংশে যে যোগাচার মতে কোনও বাহ্য পদার্থের সত্তা না থাকায় অসদধিষ্ঠানক আত্মখ্যাতি। আর সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিকমতে বাহ্য পদার্থের সত্তা থাকায় সদধিষ্ঠানক আত্মখ্যাতি।

এই দু প্রকার আত্মখ্যাতিবাদের বিরুদ্ধে নৈয়ায়িকরা বলেন যে রজত ধর্মিপ্রদেশে অসৎ অথচ আত্মস্বরূপজ্ঞানে আরোপিতভাবে মাত্র যার সত্তা স্বীকার করে তার যে জ্ঞানকে আত্মখ্যাতি বলা হচ্ছে সেই জ্ঞানের স্বরূপবোধক ব্যবহার 'ইদং রজতম্' এরূপ হতে পারে না,—'অহং রজতম্' অথবা 'ইদং অহম্' এরূপ হওয়া উচিত। কারণ ফলত তাঁদের মতসিদ্ধ আত্মাই তো জ্ঞানের বিষয় হচ্ছে।

অদ্বৈতবেদান্ত মতে এ স্থলে 'অনির্বচনখ্যাতি' স্বীকার করা হয়। তাঁরা বলেন 'ইদং রজতম্' এখানে জ্ঞানের বিষয় রজতকে সৎ বলা যায় না, কারণ সৎ হলে বিশেষ দর্শনের দ্বারা তা বাধিত হতে পারে না। আবার অসৎও বলা যায় না। কারণ অসৎ হলে কখনই তার প্রত্যক্ষ হতে পারে না। অতএব এক্ষেত্রে 'শুক্তিরূপ্য' নামে এক অনির্বাচ্য স্বরূপ বস্তুকে স্বীকার করতেই হয়; আর বৈদান্তিকেরা সেই অনির্বাচ্যস্বরূপের জ্ঞানই এক্ষেত্রে স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁদের এই মতও নৈয়ায়িক দ্বারা উপেক্ষিত হয়েছে। তার কারণ হল—অসংখ্য ভ্রম প্রত্যক্ষের বেলায় তার উপপাদানের জন্য এভাবে অসংখ্য অনির্বাচ্যস্বরূপ শুক্তিরূপ্যাদি কল্পনার আশ্রয় গ্রহণের কোনই প্রয়োজন নেই; প্রসিদ্ধ অন্য উপায়েই এই সব ভ্রমাত্মক প্রত্যক্ষ হতে পারে।

এর পরে আসে অখ্যাতিবাদের কথা। মীমাংসক প্রভাকর সম্প্রদায় অখ্যাতি-বাদী। তাঁদের মতে 'ইদং রজতম্' এই প্রতীতির ক্ষেত্রে এটি অব্যবহিত দুটি জ্ঞান। একটি হল ইদং পদের দ্বারা প্রতিপাদ্য শুক্তিখণ্ডের প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান—আর অপরটি রজতাংশের স্মরণাত্মক জ্ঞান। এই দুটি জ্ঞান পৃথক—শুক্তিখণ্ডবিশেষ্যক অভেদসম্বন্ধা-বচ্ছিন্নরজতত্বাবচ্ছিন্নপ্রকারতাক রূপ একটি বিশিষ্ট জ্ঞান অথবা সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-রজতত্বনিষ্ঠপ্রকারতাক রূপ কোন একটি বিশিষ্ট জ্ঞান নয়। এই জন্যই ঐ প্রতীতি ভ্রম নয়—দুটি প্রমাজ্ঞান, আর বিশিষ্ট জ্ঞান নয় বলেই এটি খ্যাতি নয়, অর্থাৎ অখ্যাতি। খ্যাতি মানেই হল বিশিষ্ট জ্ঞান এটাই প্রাভাকরদের অভিমত।

তত্বচিন্তামণিকার গঙ্গেশোপাধ্যায় প্রত্যক্ষখণ্ডে অন্যথাখ্যাতিবাদ প্রকরণে উক্ত প্রভাকরমতকেই পূর্বপক্ষরূপে গ্রহণ করেছেন আর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারের দ্বারা সেই মত খণ্ডন করে অন্যথাখ্যাতিবাদ স্থাপন করেছেন। 'অন্যথা' অর্থাৎ যে বস্তু যা নয় তাকে সেই বস্তুরূপে অথবা যে অধিকরণে যে সম্বন্ধে যে বস্তু নেই সেই অধিকরণে সেই সম্বন্ধে তা আছে বলে যে 'খ্যাতি' অর্থাৎ জ্ঞান—তাই হল অন্যথাখ্যাতি। প্রাভাকর-সম্প্রদায় এরূপ জ্ঞানকে অপ্রামাণিক বলেছেন। তাঁদের অভিপ্রায় হল যে এ প্রকার এক বিশিষ্টজ্ঞান স্বীকার করার পক্ষে সাধক প্রমাণ কিছুই নেই। কারণ নৈয়ায়িকেরা যদি বলেন, "রজতার্থিপ্রবৃত্তিবিষয়ত্বং রজতত্বপ্রকারকানুভববিষয়ত্বব্যাপ্যং রজতার্থি-প্রবৃত্তিবিষয়মাত্রবৃত্তিধর্মত্বাৎ রজতমাত্রবৃত্তিধর্মবৎ" এই জাতীয় অনুমানই বিশিষ্টজ্ঞানরূপ অন্যথাখ্যাতির সাধক প্রমাণ, তাহলে প্রাভাকর সম্প্রদায় বলবেন যে ঐ প্রকার অনুমানের হেতুতে 'রজতমাত্রবৃত্তিত্ব' উপাধি আছে।

এই অনুমান ও তার দ্বারা অন্যথাখ্যাতির উপপাদন আর বিরুদ্ধপক্ষের উদ্ভাবিত উপাধি এগুলো আরও বিশদভাবে আলোচনা করা যাক। যে ব্যক্তি রজতার্থী তার প্রবৃত্তির বিষয় কোন্ বস্তু? এটা সকলেই স্বীকার করবেন যে যে বস্তুকে সেই ব্যক্তি রজত বলে বুঝেছে সেই বস্তুই তার প্রবৃত্তির বিষয়, অন্য কোন বস্তু নয়। অতএব ঐ অনুমানের 'রজতার্থিপ্রবৃত্তিবিষয়মাত্রবৃত্তিধর্মত্ব' রূপ হেতুটি উক্ত 'রজতার্থিপ্রবৃত্তিবিষয়ত্ব' রূপ পক্ষে আছে। সুতরাং ঐ অনুমানের যেটি সাধ্য অর্থাৎ 'রজতত্বপ্রকারকানুভব-বিষয়ত্ব ব্যাপ্যত্ব' সেটিও সেখানে নিশ্চয়ই আছে। দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা হয়েছে রজতমাত্রবৃত্তিধর্মকে। রজতমাত্রবৃত্তিধর্ম রজতত্ব। সেখানে ঐ হেতু ও সাধ্য দুটিই আছে তা সর্ববাদিসম্মত—এভাবে তাঁরা নৈয়ায়িকদের বক্তব্য কল্পনা করেছেন। তাতে ফল এই যে 'ইদং রজতম্' স্থলীয় যে প্রবৃত্তি তার বিষয়ত্ব থাকছে শুক্তিখণ্ডে। অতএব পক্ষ যে বিষয়ত্ব তা শুক্তিখণ্ডেও থাকল, অতএব তার ব্যাপক যে রজতত্বপ্রকার-কানুভববিষয়ত্ব তাও অবশ্যই শুক্তিখণ্ডে আছে। তা হলে রজতত্বাভাববিশিষ্ট-শুক্তিখণ্ডবিশেষ্যক রজতত্বপ্রকারক অনুভব সাধিত হল। সেটিই অন্যথাখ্যাতি, অর্থাৎ ভ্রম। এভাবে কল্পিত নৈয়ায়িকদের যে অভিপ্রায় এতে দোষ দেবার জন্য যে 'রজতমাত্রবৃত্তিত্ব'কে উপাধি বলেছেন তা সঙ্গত—এই ভাবে তাঁরা রজতত্বপ্রকারক

অনুভবের বিষয়ত্ব অর্থাৎ বিশেষ্যত্ব একমাত্র রজতেই স্বীকার করেন। ভ্রম স্বীকার না করায় অন্তবস্তুতে ঐ বিশেষ্যত্ব বিচার্য বিষয়, নিশ্চিত নয়। অতএব ঐ প্রকারানুভব-বিষয়ত্বের ব্যাপ্যস্বরূপ সাধ্য কেবল রজতত্বেই আছে। রজতমাত্রবৃত্তিত্বও তাতে আছে—সুতরাং সাধ্যের ব্যাপক হয়েছে। কিন্তু রজতার্থিপ্রবৃত্তিবিষয়মাত্রবৃত্তিধর্মত্ব শুক্তিত্বেও আছে, আর তাতে রজতমাত্রবৃত্তিত্ব না থাকায় সেটি হেতুর অব্যাপক হয়েছে। অতএব উপাধিপ্রদর্শন সঙ্গতই হয়েছে—প্রাভাকর সম্প্রদায় এইভাবে নানাপ্রকার অনুমান ও তাতে দোষোদ্‌ভাবনরীতি দ্বারা অন্যথাখ্যাতির বিরুদ্ধতা করেছেন।

চিন্তামণিকার গঙ্গেশ মীমাংসকদের এই যুক্তিগুলোকে পূর্বপক্ষরূপে উপস্থাপন করে অন্যথাখ্যাতির সিদ্ধান্তপথে প্রথম পদক্ষেপ এইভাবে করছেন—'উচ্যতে রজতার্থিতাজন্যা শুক্তৌ প্রবৃত্তিঃ ইষ্টপ্রবৃত্তিবিষয়বিশিষ্টজ্ঞানসাধ্যা প্রবৃত্তিত্বাৎ শুক্তৌ শুক্ত্যর্থিপ্রবৃত্তিবৎ"। এই গ্রন্থপ্রতিপাদ্য অনুমান প্রমাণ অবলম্বন করে এই অনুমানের অভিলাপবাক্যের মধ্যে বর্তমান ইষ্টপদে ইষ্টতাবচ্ছেদক অর্থাৎ প্রবৃত্তির জনক যে ইচ্ছা তার প্রকারীভূতধর্ম এই প্রকার ব্যাখ্যা করে মথুরানাথ বলেছেন—"তথা চ সমবায়সম্বন্ধেন স্বপ্রকারপ্রকারক-স্ববিশেষ্যবিশেষ্যকজ্ঞানসাধ্যেতি সাধ্যম্"—এ স্থলে স্বত্বঘটিত হয়েছে বলে অননুগম-দোষের যে শঙ্কা হতে পারে তা খণ্ডনের জন্য মথুরানাথ টীকায় লিখলেন "প্রাচীননয়ে স্বত্বস্যানুগতত্বাৎ"।

এই অনুমানে চিন্তামণিকার 'শুক্তৌ শুক্ত্যর্থিপ্রবৃত্তিবৎ' এই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছেন। এই যথার্থবিষয়ক প্রবৃত্তিরূপ দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রে ঐ হেতু হল শুক্তিবিশেষ্যক শুক্ত্যর্থিপ্রবৃত্তিতে প্রবৃত্তিত্বরূপ। আর এখানে 'সমবায়সম্বন্ধেন স্বপ্রকারপ্রকারকস্ববিশেষ্য-বিশেষ্যকজ্ঞানসাধ্যত্ব' রূপ নিকৃষ্ট সাধ্যও আছে; কারণ ঐ সাধ্যের ঘটক স্বপদে প্রবৃত্তি, তার প্রকার শুক্তিত্ব, বিশেষ্য শুক্তি। সমবায়সম্বন্ধে সেই শুক্তিত্বরূপপ্রকার-প্রকারক এবং শুক্তিরূপ বিশেষ্যবিশেষ্যক "ইয়ং শুক্তিঃ" ইত্যাকারক যে জ্ঞান তা পূর্বে থাকলেই পরক্ষণে শুক্ত্যর্থীর প্রবৃত্তি জন্মে। কাজেই ঐ প্রবৃত্তিতে তথাবিধ জ্ঞান-সাধ্যত্বরূপ সাধ্য যে আছে তা সকলকে স্বীকার করতেই হবে। তাহলে এই দৃষ্টান্ত-মূলে প্রবৃত্তিত্বরূপহেতুতে উল্লিখিত স্বপ্রকারপ্রকারকস্ববিশেষ্যবিশেষ্যকজ্ঞানসাধ্যত্বরূপ সাধ্যের ব্যাপ্তি নিশ্চিত হওয়ায় যথার্থ জ্ঞানাধীন প্রবৃত্তিক্ষেত্রের মত ভ্রমাধীন প্রবৃত্তিক্ষেত্রেও—অর্থাৎ রজতার্থীর যে শুক্তিতে প্রবৃত্তি তাতেও প্রবৃত্তিত্বরূপ হেতু থাকায় ঐ স্বপ্রকারপ্রকারকস্ববিশেষ্যবিশেষ্যকজ্ঞানসাধ্যত্বরূপ সাধ্যের অবশ্যসিদ্ধি হবে; এক্ষেত্রে স্বপদে রজতত্বপ্রকারক শুক্তিবিশেষ্যক প্রবৃত্তি এ কেউই অস্বীকার করতে পারবে না। এখানে মনে রাখতে হবে যে চিন্তামণিকার ও মথুরানাথের লেখায় অভেদ সম্বন্ধে রজতকে প্রকার বলা হয়নি। তাই তাঁদের রীতি অনুসরণ করেই সমবায় সম্বন্ধে রজতত্ব প্রকারক—এই প্রকার উপস্থাপিত করা হয়েছে। অভেদ সম্বন্ধের অভিপ্রায় হলে রজতপ্রকারকই বলতে হবে।

সেই যে শুক্তিবিশেষ্যকরজতত্বপ্রকারক প্রবৃত্তি তাতেও উক্ত সাধ্যের অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধে রজতত্বপ্রকারক শুক্তিবিশেষ্যকজ্ঞানসাধ্যত্বরূপ সাধ্যের সিদ্ধি অনিবার্য হয়ে পড়ে। অতএব ফলতঃ সাধ্যতাবচ্ছেদকীভূত সেই প্রকার জ্ঞানরূপ ভ্রম অর্থাৎ অন্যথাখ্যাতিও অনিবার্য হয়ে যায়।

এর ওপর অবশ্য বিরুদ্ধবাদীর কিছু বক্তব্য থাকতে পারে। তাঁরা বলতে পারেন যে ন্যায়ের সমানতন্ত্র বৈশেষিকশাস্ত্রে সমবায়কে অতীন্দ্রিয় বলা হয়েছে। সুতরাং সমবায়সম্বন্ধে রজতত্বপ্রকারক শুক্তিবিশেষ্যক যে প্রত্যক্ষাত্মক ভ্রম উপপাদনে নৈয়ায়িকদের এত প্রয়াস তা তো সমানতন্ত্রবিরুদ্ধ। এই আক্ষেপের সমাধানের জন্য চিন্তামণিকার বলেছেন, "সমবায়াতীন্দ্রিয়ত্ববাদিনং প্রতি অগৃহীতাসংসর্গকধর্মধর্মি-বিষয়কমেকং জ্ঞানং সিধ্যতি"। এ অংশের যথাশ্রুতার্থ এরূপ সমবায়ের অতীন্দ্রিয়ত্ব-বাদিমতে এপ্রকার স্থলে ধর্ম ও ধর্মীর পরস্পরের মধ্যে কোনও সম্বন্ধ নেই এরূপ জ্ঞান না থাকাকালীন ধর্মস্বরূপ রজতত্বকে এবং ধর্মিস্বরূপ শুক্তিকে মাত্র বিষয় করে একটি জ্ঞান হয়ে থাকে—এই অর্থ গ্রহণ করলে সেটি ভ্রমসিদ্ধির প্রতিকূল হয়ে দাঁড়ায়, কারণ অসম্বদ্ধভাবে শুক্তি ও রজতকে বিষয় করে 'শুক্তিরজতে' (শুক্তি ও রজত) এ প্রকার যে নির্বিকল্পক জ্ঞান তাকে তো ভ্রম বলা যায় না। এজন্য মথুরানাথ এই অংশের ব্যাখ্যায় বললেন—"অগৃহীতাসংসর্গকধর্মধর্মিবিষয়কমিতি, সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্নধর্মধর্মিভাবাখ্য-স্বরূপসম্বন্ধবিশেষসংসর্গকমিত্যর্থঃ"। এর তাৎপর্য হল এই—'সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন' এই অংশ পরিচায়ক। অর্থাৎ বস্তুগত্যা সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয়ে থাকে যে রজতত্বনিষ্ঠ-নিরবচ্ছিন্নধর্মতা অর্থাৎ প্রকারতা তন্নিরূপিতধর্মিতা অর্থাৎ বিশেষ্যতা সম্বন্ধেই রজতত্ব-ধর্মটি শুক্ত্যংশে ভাসমান হবে। তাহলে এটি বিশিষ্ট জ্ঞান আর ভ্রম, সমবায়ের অতীন্দ্রিয়ত্বমতে 'রক্তো ঘটঃ' ইত্যাদি বিশিষ্ট প্রত্যক্ষের উপপত্তির জন্য ঐ প্রকার ধর্ম-ধর্মিভাবাখ্য স্বরূপসম্বন্ধবিশেষের স্বীকার না করলে উপায় নেই। তাই মথুরানাথ এখানে বলেছেন—"তৈঃ সমবায়স্য সংসর্গমর্যাদয়া ভানানভ্যুপগমেঽপি সমবায়সম্বন্ধা-বচ্ছিন্ন-ধর্মধর্মিভাবাত্মকস্বরূপসম্বন্ধবিশেষস্য সংসর্গমর্যাদয়া ভানাভ্যুপগমাৎ"।

এর বিরুদ্ধেও অবশ্য প্রাভাকরদের কিছু বক্তব্য থাকতে পারে। তাঁরা বলতে পারেন এই যে শুক্ত্যর্থী বা রজতার্থী যে কোন লোকের শুক্তিতে প্রবৃত্তি হবে তার কোন স্থানেই বিশিষ্টজ্ঞানের কারণতা কল্পনা করার দরকার নেই—তার কারণ হল—ইষ্টতাবচ্ছেদকধর্মরূপে ইষ্টের উপস্থিতি ও ধর্মীর প্রত্যক্ষ যদি থাকে, আর সেই ধর্মীতে ইষ্টের ভেদজ্ঞান যদি না থাকে তবেই সেই ধর্মীতে ইষ্টতাবচ্ছেদকপ্রকারক প্রবৃত্তি হবে। কাজেই 'ইদং রজতম্' এই বিচার্যস্থলে ইদং পদপ্রতিপাদ্য সম্মুখবর্তিশুক্তিখণ্ডের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ এবং রজতত্বপ্রকারে রজতের স্মৃতি পৃথকভাবেই উৎপন্ন হবে। কিন্তু সেই সময়ে শুক্তিতে রজতের ভেদ জ্ঞান না থাকাতেই রজতার্থী ব্যক্তি শুক্তিতে প্রবৃত্ত হয়ে থাকে। সেই জন্য বিশিষ্টজ্ঞান কল্পনা করার কোন প্রয়োজন নেই।

এই ভাবে বহু দীর্ঘ বাদপ্রতিবাদের পর নৈয়ায়িকেরা তাদের চরম সিদ্ধান্তে

পৌঁছেছেন। তাঁরা যুক্তি দিলেন যে যথার্থ প্রবৃত্তি স্থলের কার্যকারণভাব কল্পনায় প্রতিপক্ষের কারণতাবচ্ছেদক হল—"পুরোবর্তি বিশেষ্যপ্রত্যক্ষসহকৃত ইষ্টতাবচ্ছেদক-প্রকারক ইষ্টোপস্থিতিসমানকালীন তাদৃশবিশেষ্যধর্মিক ইষ্টভেদজ্ঞানাভাবত্ব' আর ন্যায়মতে 'পুরোবর্তিবিশেষ্যক ইষ্টতাবচ্ছেদকপ্রকারকনিশ্চয়ত্ব' হল কারণতাবচ্ছেদক। সুতরাং এপক্ষে অনেক লাঘব থাকায় এবং প্রমাজ্ঞানে মতবিরোধ না থাকায় প্রতিবাদিপক্ষেরও এরূপে কারণতা কল্পনাই অবশ্য কর্ত্তব্য। কারণ যথার্থপ্রবৃত্তিস্থলের এই প্রকার কার্যকারণভাবে ইষ্টভেদাগ্রহকে নিবিষ্ট করবার কোনই প্রয়োজন নেই; যেহেতু বিশিষ্ট জ্ঞানরূপ কারণ সংঘটিত হতে হলে তার পূর্বে বা পরে বিশেষ্যে ইষ্টভেদজ্ঞান স্বভাবতই থাকতে পারবে না। তা যদি হয় তাহলে নৈয়ায়িক বলবেন যে যথার্থ অযথার্থ এ দু প্রকার প্রবৃত্তির বেলাতেই লাঘবতঃ নৈয়ায়িকদের প্রদর্শিত একরূপেই কারণত্ব কল্পনা সমীচীন। তা হলে অন্যথাখ্যাতি অর্থাৎ ভ্রমও অনিবার্য।

প্রাভাকরমতের বিরুদ্ধে চিন্তামণিকার আরও বললেন, "ন চ ভেদাগ্রহাৎ প্রবৃত্ত্যুপপত্তিরপি; বিপরীতচতুষ্কে যুগপৎপ্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যাপত্তেঃ"। বিশেষ্যে ইষ্টভেদ জ্ঞানাভাবকে প্রবৃত্তির জনক বললে যেখানে 'ইমে রজতরঙ্গে নেমে রঙ্গরজতে' এই প্রকার সমূহালম্বন জ্ঞান হয়, তার পরে রজত ও রঙ্গ উভয় বস্তুতেই যুগপৎ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির আপত্তি হয়। এক জায়গায় পাশাপাশি দুটি সমান চাকচিক্যসম্পন্ন বস্তু আছে, তার প্রথমটি রজতখণ্ড আর দ্বিতীয়টি রঙ্গখণ্ড। ন্যায়মতসিদ্ধ এই সমূহালম্বনে প্রথম খণ্ডটি রঙ্গত্বপ্রকারে আর দ্বিতীয় খণ্ডটি রজতত্বপ্রকারে ভাসমান হবে, আর প্রথম খণ্ডে অর্থাৎ রজতে রজতভেদ, দ্বিতীয় খণ্ডে অর্থাৎ রঙ্গে রঙ্গভেদ বিষয় হবে। এখানে প্রাভাকরমতে রজত ও রঙ্গে স্ব স্ব ভেদাবগাহিতা স্বীকার করা যায় না, কারণ তাতে অন্যথাখ্যাতি স্বীকার করা হয়। সেই জন্য সেই মতে এই প্রকার ভেদের উপস্থিতি পৃথকভাবে স্বীকার করতে হয়, আর এই দুই ধর্মীতেই স্ব স্ব ভেদের অসংসর্গজ্ঞানের অভাব আছে এটা মানতে হবে। এরূপ অবস্থায় রজতার্থীর পক্ষে তাদের মতসিদ্ধ প্রবৃত্তির কারণ যে ধর্মীর প্রত্যক্ষ, আর রজতত্বপ্রকারক উপস্থিতি এবং রজতভেদ-জ্ঞানের অভাব তা থাকায় দু জায়গাতেই প্রবৃত্তির আপত্তি, আর অগৃহীতাসংসর্গক ইষ্টভেদোপস্থিতি থাকায় দুটি স্থলেই নিবৃত্তির আপত্তি। কিন্তু ন্যায়মতে ঐ স্থানে রজতার্থীর ঐরূপ ভ্রমের ফলে কেবল রঙ্গেই রজতত্বপ্রকারক প্রবৃত্তি হবে, রজতে হবে না। সুতরাং এইমতে যুগপৎ সমানধর্মিক প্রবৃত্তির ও নিবৃত্তির আপত্তিস্বরূপ দোষ নেই। এখন প্রশ্ন হতে পারে যে প্রাভাকরমতের ওপর দোষ দেখাবার জন্য প্রথমতঃ কারণতাবচ্ছেদকের গৌরবরূপ যে দোষ তুলে ধরা হয়েছে সে ছাড়াও আবার এই প্রবৃত্তিনিবৃত্তির যৌগপদ্যাপত্তিরূপ দোষ প্রদর্শনের কারণ কি? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে প্রাভাকর সম্প্রদায় বলতে পারেন তাঁরা ভ্রমস্বীকার না করেও সংবাদিবিসংবাদি সর্বপ্রকার প্রবৃত্তির কারণতা একরূপে কল্পনা করতে যাওয়ায় কারণতাবচ্ছেদকধর্মের যে গৌরব হয়েছে তা 'ফলমুখ গৌরব দোষাবহ নয়' এই নিয়ম

অনুসারে অধিক্ষেপের যোগ্য নয়—সে জন্যই যুগপৎ প্রবৃত্তিনিবৃত্তির আপত্তি স্বরূপ দ্বিতীয় দোষ দেখান হয়েছে।

এখন ন্যায়মতের ওপর আর একটি প্রশ্ন হতে পারে এই যে 'ইদং রজতম্' ইত্যাদি স্থলে যে ভ্রমাত্মক প্রত্যক্ষ স্বীকার করা হল তার কিভাবে উপপত্তি হবে? বিশেষ্যাংশে ইন্দ্রিয়সংযোগ থাকলেও বিশেষণীভূত রজতত্ব বা রজতাংশে ইন্দ্রিয়ের কোনও সম্বন্ধ সম্ভব নয়, তার কারণ সেই সময়ে সেখানে রজতের অস্তিত্বই নেই। এই অবস্থায় তার বা তদ্ধর্মরজতত্বের প্রত্যক্ষযোগ্য কারণ সংঘটিত হয় না। এ প্রশ্নের উত্তরে নৈয়ায়িক বলেন শুক্তিখণ্ড বা রঙ্গখণ্ড এই জাতীয় যে সব দ্রব্য রজতের মত অত্যন্ত শুভ্র, উজ্জ্বল আর চাকচিক্যসম্পন্ন তার যে কোন একটির সঙ্গে ইন্দ্রিয় সংযোগ হলেই রজতার্থীর রজতত্বপ্রকারে রজতের স্মৃতি হয়। সেই স্মৃতির দ্বারা উপনীত রজতের বা রজতত্বেরই পুরোবর্তিবিশেষ্যে অভেদ বা সমবায় সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে। এখানে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগাদি কোনও লৌকিক সন্নিকর্ষ প্রকারাংশে না থাকলেও ঐ স্মৃতিস্বরূপ জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ থাকাতেই রজত বা রজতত্বপ্রকারক প্রত্যক্ষ অনায়াসেই হতে পারে।

চমস্কির ভাষাবিজ্ঞানের ঐতিহ্যগত পটভূমি

রামেশ্বর শ'

আমেরিকার Massachusetts Institute of Technology-র অধ্যাপক আব্রাহাম নোয়াম্ চমস্কি (Abraham Ncam Chomsky) প্রথমে 'Syntactic Structures' (১৯৫৭) ও পরে 'Aspects of the Theory of Syntax' (১৯৬৫) প্রকাশ করে ভাষাবিজ্ঞানে যে নতুন আন্দোলনের সূত্রপাত করেন তার অভূতপূর্ব বৈশিষ্ট্য হল তার ব্যাপকতা। তার মৌলিকত্বের কথা স্মরণে রেখেও বলা যায়, এই আন্দোলনের ব্যাপকতার তুলনা ভাষাবিজ্ঞানের ইতিহাসে এর আগে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। বিশ শতকের গোড়ার দিকে (১৯০৬-১১) সুইস্ ভাষাবিজ্ঞানী ফার্দিনান্দ্ দ্য সস্যুর (Ferdinand de Saussure) জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বক্তৃতা দেন তা ১৯১৬ সালে তাঁর ছাত্রদের নোট থেকে সংগৃহীত হয়ে 'Cours de linguistic générale' (Course in General Linguistics) নামে প্রকাশিত হবার পরে ভাষাবিজ্ঞানে যে নতুনত্ব সাধিত হয়েছিল, তাও কম যুগান্তরকারী ছিল না; তার অভিনবত্বকে কেউ কেউ জ্যোতির্বিজ্ঞানে কোপার্নিকাসের বৈপ্লবিক চিন্তার সঙ্গে তুলনা করেছেন।[১] কিন্তু সস্যুর-এর আন্দোলন মৌলিক হলেও চমস্কির আন্দোলনের মতো এতখানি ব্যাপক-প্রভাববিস্তারী ছিল না। ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্র ছাড়িয়েও আন্তর্বিদ্যা (inter-disciplinary) প্রভাববিস্তারে চমস্কির অবদানের তুলনা ভাষাবিজ্ঞানে আর নেই। সাহিত্যে শেক্স্পীয়র, মনোবিজ্ঞানে ফ্রয়েড, দর্শনে কাণ্ট, বিজ্ঞানে আইনষ্টাইন, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মার্ক্স্ যেমন জ্ঞানরাজ্যের একটি নির্দিষ্ট শাস্ত্র (discipline) ছাড়াও অন্য শাস্ত্রের উপরে এবং জনচিত্তে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছেন, ভাষাবিজ্ঞানে তেমনটি চমস্কির আগে আর কেউ করতে পারেন নি। চমস্কির এই ব্যাপক স্বীকৃতির মূলীভূত কারণ কি? এই কারণ হল চমস্কি কর্তৃক ভাষার সৃজনী দিকের ('creative aspect') প্রতিষ্ঠা।

আধুনিক যুগে জড়বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে বিশ্বজগতের সমস্ত বিষয়ের মতো ভাষা-ব্যাপারকেও বিজ্ঞানের নিয়মের দ্বারা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা প্রবল হয়ে উঠে। আর তার কঠোরতার (rigours) ফলে ভাষাবিজ্ঞানে এক রকম যান্ত্রিকতার প্রবণতা দেখা যায়। ব্লুমফিল্ড্ গোষ্ঠীর (Bloomfieldians) ভাষাবিজ্ঞানীরা এমন যান্ত্রিক কঠোরতার সঙ্গে ভাষার বহিরঙ্গের গঠন বিশ্লেষণে অতিরেক সৃষ্টি করেন যে তার ফলে গঠনসর্বস্বতার (structuralism) জন্ম হয়। মনোবিজ্ঞানে ব্যবহারবাদীরা (behaviourists) যেমন নির্দিষ্ট সময়ে ঘণ্টা বাদনের সঙ্গে সঙ্গে কুকুরের মুখে লালা-ক্ষরণের প্রক্রিয়াটিকে যান্ত্রিকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, প্রায় সেই রকম

যান্ত্রিকভাবে ব্যাখ্যা করা হল সমগ্র ভাষাব্যাপারকে।[২] কিন্তু মানুষের মন একটি জীবন্ত সৃজনশীল সত্তা। এরকমের যান্ত্রিকতা দীর্ঘকাল তার তৃপ্তি বিধান করতে পারে না। ব্লুমফিল্ড্‌-গোষ্ঠী ভাষার সৃজনী দিকটি উপেক্ষা করেছিলেন। তাঁরা একথা ভুলে গিয়েছিলেন যে, ভাষাব্যাপারটি সাহিত্যের মতো অনেকটাই মানুষের সৃজনীচেতনার সঙ্গে যুক্ত। সাহিত্যকে যেমন বিজ্ঞানের সূত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না, ভাষাকেও তেমনি বিজ্ঞানের বিধানে পুরোপুরি বেঁধে ফেলা যায় না। বিজ্ঞানের মতো সূত্র রচনা করে ভাষাপ্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করা যায়, কিন্তু তার অন্তর্নিহিত সৃজনীদিকের অফুরন্ত সৃষ্টির সম্ভাবনাকে বিজ্ঞানের ফর্মুলায় বেঁধে ফেলা যায় না। চম্‌স্কি এসে ভাষার এই সৃজনী দিকের স্বীকৃতি দিলেন। ভাষার এই সৃজনী দিকের উপরেই চম্‌স্কির ভাষাদর্শন প্রতিষ্ঠিত বলে আধুনিক যুগে তার এই ব্যাপক স্বতঃ-উৎসারিত স্বীকৃতি। ভাষার অফুরন্ত সৃজনী সম্ভাবনার উপরে চম্‌স্কির রূপান্তরমূলক-সংজননমূলক (transformational-generative) ভাষাবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করে অধ্যাপক রবিনস্‌ বলেছেন :

"The objects of the transformationalists are to be attained by framing linguistic descriptions in terms of rules that embody the creative capacity of a native speaker to generate or produce and to understand an infinite number of sentences...."[৩]

স্বয়ং চম্‌স্কি দুঃখ করে বলেছেন, আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা ভাষার সৃজনী দিকটি উপেক্ষা করেছেন, ফলে তাঁদের ভাষাবর্ণনায় রয়ে গেছে এক মূলীভূত ঘাটতি :

"Modern linguistics......has not attempted to deal with the creative aspect of language use. It thus suggests no way to overcome the fundamental descriptive inadequacy of structuralist grammars."[৪]

চম্‌স্কির এই উক্তিতেই দু'টি ইঙ্গিত পাই : এক, ভাষার সৃজনী দিকের স্বীকৃতি না দিলে ভাষা বর্ণনায় থেকে যায় অপূর্ণতা ; দুই, এই সৃজনীদিকের স্বীকৃতি আধুনিক গঠনমূলক ভাষাবিজ্ঞানীরা (structuralists) দেন নি, কিন্তু পূর্ববর্তী ভাষাবিজ্ঞানীদের মধ্যে তা পাওয়া যেতে পারে। বস্তুত চম্‌স্কির ভাষাবিজ্ঞানের এই দিকটি পুরোপুরি নয়, কিন্তু অনেকখানি, পূর্ব-ঐতিহ্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত। চম্‌স্কিপন্থী ভাষাবিজ্ঞানীদের অনেকে নতুনত্বের অত্যুৎসাহে ঐতিহ্যের এই উত্তরাধিকারটুকু অস্বীকার করাতেই গর্ব বোধ করেন ; কিন্তু চম্‌স্কি নিজে ঐতিহ্যের ঋণ স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হন নি। বর্তমান প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে, চম্‌স্কির ভাষাবিজ্ঞানের অনেকগুলি মূল ধারণাই ঐতিহ্য থেকে গৃহীত এবং অনেক মূল ধারণার সূচনা হয়েছিল তাঁর পূর্বসূরিদের ভাষাচিন্তায়।

পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির মূল পীঠস্থান গ্রীসের মনীষী প্লেটোকে প্রতীচ্যের প্রথম ভাষাজিজ্ঞাসু বলা যায়। দর্শনশাস্ত্র, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, তর্কশাস্ত্র, নন্দনতত্ত্ব ইত্যাদি

পশ্চিমের যে-কোনো বিদ্যার প্রথম সূত্রপাত সন্ধান করা হয় তাঁর 'কথোপকথনে' (Dialogues)। ভাষার সৃজনমূলক দিকেরও প্রথম ইঙ্গিত পাই প্লেটোর কথোপকথনেই। ভাষাকে তিনি চিন্তার সঙ্গে যখন এক করে দেখেন, তখন বোঝা যায় ভাষার বহিরঙ্গ গঠনের চেয়ে অন্তরঙ্গ চিন্তাসম্পদের দিকটি তাঁর কাছে বড়। এই চিন্তার মধ্যে রয়েছে সৃজনী-সত্তার স্বীকৃতি। তাঁর মতে ভাষার জন্ম মানুষের অন্তর্নিহিত সৃজনী-সত্তা থেকে যার নাম তিনি দিয়েছেন 'আত্মা' (soul):

"Thought (dia´nosia) is the same as language, with this exception that thought is the conversation of the soul with herself which takes place without voices, while the stream which, accompanied by sound, flows from thought through lips, is called language (lo´gos)"[৫]

এখানে ভাষার অন্তরালশায়ী ভাবসত্তাকে আবিষ্কার করা হয়েছে বলে প্লেটোর ভাষাদর্শনকে মনোধর্মী (mentalistic) বলা যায়। চম্‌স্কির ভাষাবিজ্ঞানও যে mentalistic theory, সে কথা চম্‌স্কির নিজের স্বীকৃতিতেই আমরা পাই:

"......in the technical sense, linguistic theory is mentalistic, since it is concerned with discovering a mental reality underlying actual behavior."[৬]

প্লেটোর পরে অ্যারিস্টটল। অ্যারিস্টটল যদিও প্লেটোর শিষ্য, তবু দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে তাঁর অবস্থান প্লেটোর বিপরীত কোটিতে। প্লেটো ছিলেন ভাবুক ও ভাববাদী। কিন্তু অ্যারিস্টটল ছিলেন বাস্তবসচেতন বৈজ্ঞানিক মানসিকতার অধিকারী। ভাষাকেও অ্যারিস্টটল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিধিবদ্ধভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ভাষার সৃজনী দিকটি অস্বীকার করেন নি। মানুষের মন যখন নতুন নতুন বাগ্‌ভঙ্গি ('new modes of speech') সৃষ্টি করে চলে তখন তিনি সেই মনের সৃজনশীল দিকের স্বাধীনতা স্বীকার না করে পারেন নি:

"On the other hand the Diction becomes distinguished and non-prosaic by the use of unfamiliar terms, i. e. strange words, metaphors, lengthened forms, and everything that deviates from the ordinary modes of speech."[৭]

ব্যাকরণের যান্ত্রিক বিধান থেকে বা গতানুগতিক বাগ্‌রীতি থেকে সরে আসার এই যে স্বাধীনতা ও শক্তি, এটাই ভাষার পিছনে সৃজনশীল মনের শক্তি। আরো লক্ষণীয়, ব্যাকরণের বাঁধা নিয়ম থেকে সরে আসাকে তিনি ভাষার নিন্দনীয় ত্রুটি বলছেন না: 'It is not right to condemn these modes of speech'। আমরা জানি, তিনি এখানে সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা সম্পর্কে নয়, কাব্যভাষা সম্পর্কে আলোচনা করছেন। কিন্তু একথাও স্পষ্ট যে, ভাষাকে তিনি শুদ্ধিবাদীর (purist) দৃষ্টিতে দেখেন নি। ফলে ব্যাকরণ তাঁর কাছে নির্দেশমূলক (normative) নয়, বাস্তব

সত্যমূলক (positive)। কিন্তু পরবর্তীকালে মধ্যযুগে পাশ্চাত্যে ব্যাকরণ—বিশেষত লাতিন ব্যাকরণ—হয়ে উঠেছিল যান্ত্রিক নির্দেশমূলক। অথচ অ্যারিষ্টটল প্রথম যুগের ভাষাবিজ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও এই নির্দেশমূলকতা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রাস করেনি। দৃষ্টিভঙ্গির এই মুক্তি চম্‌স্কির মধ্যে বর্তেছে। নির্দেশমূলকতা থেকে মুক্তি আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গির একটি বড় বৈশিষ্ট্য।[৮] এই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক প্রতিষ্ঠার মূলে অবশ্য ব্লুমফিল্ডের ভূমিকাই সমধিক। ব্লুমফিল্ডই আধুনিককালে নির্দেশমূলক দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে বিশেষভাবে সোচ্চার হয়ে উঠেন।[৯] তারই ফলে আধুনিক মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিষ্ঠা হয়। চম্‌স্কি ব্লুমফিল্ডপন্থী ছিলেন না, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির এই উত্তরাধিকার সচেতন অথবা অচেতনভাবে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর generative grammar যে normative বা prescriptive নয় তা তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন :

"......a generative grammar is not a model for a speaker or a hearer. It attempts to characterize in the most neutral possible terms the knowledge of the language that provides the basis for actual use of language by a speaker-hearer. When we speak of a grammar as generating a sentence with a certain structural description, we mean simply that the grammar assigns this structural description to the sentence......this generative grammar does not, in itself, prescribe the character or functioning of a perceptual model or a model of speech production."[১০]

অ্যারিষ্টটলের পরবর্তী গ্রীক ও লাতিন বৈয়াকরণেরা মোটামুটিভাবে অ্যারিষ্টটলের ব্যাকরণের কাঠামো অনুসরণেই তাঁদের ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন, যদিও অ্যারিষ্টটলের positive ও মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি তাঁদের ছিল না। তাঁরা তাঁদের নিজেদের ভাষারই ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে এই বিশ্বাস প্রচ্ছন্ন ছিল যে, তাঁদের ব্যাকরণের basic categories সব ভাষার ক্ষেত্রে সাধারণভাবে প্রযোজ্য। তাঁদের এই ধারণা অংশতঃ ভ্রান্ত ; তাঁরা প্রত্যেক ভাষার নিজস্ব গঠনগত স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করতে পারেন নি। এ কথা ঠিক ; কিন্তু আবার প্রত্যেক ভাষার নিজস্বতা স্বীকার করেও বলা যায়, সর্বভাষায় প্রযোজ্য হতে পারে ভাষার এমন কতকগুলি মূলীভূত সাধারণ সত্যও আছে—গ্রীক ও লাতিন বৈয়াকরণদের এই দার্শনিক প্রত্যয় পুরোপুরি মিথ্যাও নয়। পরবর্তীকালে চম্‌স্কি ভাষার বিশ্বগত সত্যের ('linguistic universals') যে তত্ত্ব গড়ে তোলেন তা নিঃসন্দেহে অনেক উন্নত ও স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত। কিন্তু তাঁর এই তত্ত্বের সূচনা আমরা প্রাচীন বৈয়াকরণদের তত্ত্বের মধ্যেই বীজাকারে পাই।

তেমনি বাক্যকে subject-predicate-এ ভাগ করার যে রীতি গ্রীক ও লাতিন

বৈয়াকরণদের মধ্যে পাই, তা থেকে চমস্কির NP-VP (Noun Phrase—Verb Phrase) বিভাগ অনেক সূক্ষ্ম ও জটিল। কিন্তু ঐতিহ্যের এই পূর্ব-সূচনা ছিল বলেই চমস্কির ভাষাতত্ত্বে সুপণ্ডিত অধ্যাপক Lyons-এরও মনে এসেছে :

"A traditionally-minded grammarian might say that the subject is a 'noun phrase' (NP), which consists of the definite article (T) and a noun (N); and that the predicate is a 'verb phrase' (VP) which consists of a varb (V) with its object."[১১]

চমস্কির বিভাগের সূক্ষ্মতা স্বীকার করে নিয়েই বলা যায়, গ্রীক ও লাতিন বৈয়াকরণদের প্রবর্তিত এই মূল বিভাগ-রীতির প্রতিষ্ঠা না পেলে চমস্কির পক্ষে NP-VP-এর ধারণা গড়ে তোলা সম্ভব হত কিনা সন্দেহ। চমস্কির বাক্য-রূপান্তরতত্ত্বের (transfor-mation theory) বীজও লাতিন বৈয়াকরণদের মধ্যে পাওয়া যায়। প্রত্যক্ষ উক্তি (direct speech) থেকে পরোক্ষ উক্তিতে (indirect speech) রূপান্তর এবং আবার বিপরীতক্রমে রূপান্তরের যে রীতি তাঁরা সূত্রবদ্ধ করেন তাতেই রূপান্তর-প্রক্রিয়ার প্রাথমিক রূপ লক্ষ্য করা যায়।

ভাষার অন্তরালশায়ী সৃজনী-চেতনার কথা আগে বলেছি। এই চেতনার পরোক্ষ উত্তরাধিকার চমস্কি পেয়েছিলেন গ্রীক মনীষীদের কাছ থেকে; কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে তিনি এটি পেয়েছিলেন জার্মান ভাষাতত্ত্ববিদ্ ভিল্‌হেল্‌ম্ ফন্ হুম্‌বোল্টের কাছ থেকে। হুম্‌বোল্টের 'über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues' (On the Variety of Human Speech) গ্রন্থের শীর্ষ নামে ভাষাবৈচিত্র্যের উল্লেখ থাকলেও গ্রন্থটি সাধারণ ভাষাবিজ্ঞানের একটি অগ্রণী রচনা। এতে ভাষার মনোগত দিকটির উপরে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে একে মনোবিজ্ঞানাশ্রয়ী ভাষাবিজ্ঞানেরও (Psycho-lingistics) প্রথম গ্রন্থ বলা যায়। এতে মনীষী হুম্‌বোল্ট্ ভাষার মানসিক দিকের উপরে এতখানি গুরুত্ব দিয়েছেন যে, ভাষাকে প্লেটোর মতোই মানবমনের বা মানবাত্মার সঙ্গে একাত্ম করে তুলেছেন :

"Ihre Sprache ist ihr Geist und ihr Geist ihre Sprache".[১২]

একজন মাতৃভাষাভাষী (native speaker) তার মনের সহজাত সৃজনশীল দিক থেকে সীমাবদ্ধ উপাদানের সাহায্যে যে অফুরন্ত বাক্য রচনা করে চলে সেই সত্যটির প্রতি তিনিই প্রথম অঙ্গুলি-সঙ্কেত করেন :

"Die Sprache muss von endlichen Mitteln einen unendlichen Gebrauch machen."[১৩]

চমস্কির ব্যাকরণের মূলতত্ত্বও তা-ই। ভাষায় আমরা যে অফুরন্ত বাক্য ব্যবহার করার সম্ভাবনা রাখি তার সবগুলোই আমরা পারিপার্শ্বিক থেকে শিখি না, বা শিখে মস্তিষ্কের মধ্যে ধরে রাখি না; সেটা সম্ভবও নয়। আমাদের মনের মধ্যে ভাষার উপাদান সমন্বয় করে বাক্যগঠনের মূল নিয়মগুলিই থাকে। সেই নিয়মাবলী

প্রয়োগ করে আমরা সীমাবদ্ধ উপাদানের সাহায্যে অপরিসীম বাক্যবৈচিত্র্য সৃষ্টি করি :

"The infinite set of potential sentences must be covered by a finite system of basic elements and combinatory rules, since a human being can only store a finite grammar in his brain."[১৪]

চম্‌স্কির ভাষাবিজ্ঞানের একান্ত মূলীভূত একটি বিষয় হল Competence ও Performance-এর পার্থক্য। Competence হল মাতৃভাষার বক্তার ও শ্রোতার ঐ ভাষা বলার ও বোঝার অন্তর্নিহিত পূর্ণ সম্ভাবনা এবং ভাষার নিখুঁত আদর্শ রূপ যা আমরা শুধু কল্পনা করতে পারি। কিন্তু সব আদর্শের মতো এই আদর্শ রূপটিও আমরা কখনো বাস্তবে পুরোপুরি রূপায়িত করতে পারি না। আর Performance হচ্ছে ভাষার ব্যবহারিক বাস্তব রূপ। ভাষাকে আমরা যতই পরিকল্পিত পরিশুদ্ধ করে ব্যবহার করি না কেন, আমাদের ব্যবহৃত রূপ কখনো আমাদের ভাষার আদর্শরূপের পরিপূর্ণতা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে লাভ করতে পারে না। আমাদের ভাষা-সাধনায় হয় তো আমরা ভাষার ব্যবহারিক রূপকে ক্রমশ আদর্শ রূপের পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছি। চম্‌স্কির এই competence ও performance-এর প্রতীতির পূর্বসূচনা পাই Saussure-এর language ('langue') ও speech ('parole')-এর ধারণায়। বিশেষজ্ঞেরা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন চম্‌স্কির ধারণাটি ভুঁইফোঁড় কিছু নয়; ঐতিহ্যের ধারায় এর পূর্বসূচনা, যদিও এর কিছু অভিনবত্বের দিকও আছে :

"The distinction between competence and performance, a necessary dichotomy in the investigation of any aspect of complex human behavior, has always existed in linguistics. It has in fact been observed almost universally, though only recently has it been so explicitly formulated and insisted upon. Saussure's famous distinction between 'langue' and 'parole' is partially analogous to competence and performance"[১৫]

আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীদের মধ্যে এড্‌ওয়ার্ড্‌ স্যাপিরের (Edward Sapir) কিছু-কিছু চিন্তাধারাও চম্‌স্কির মধ্যে বর্তেছে। বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানীদের মধ্যে স্যাপির্‌ ব্লুমফিল্ডের সমসাময়িক হলেও ভাষাদর্শনে তিনি ব্লুম্‌ফিল্ড্‌ থেকে অনেকটা স্বতন্ত্র। ফ্রান্‌ৎস্‌ বোয়াস্‌, (Frans Boas), লিওনার্ড্‌ ব্লুম্‌ফিল্ড্‌ (Leonard Bloomfield) প্রভৃতি ভাষাবিজ্ঞানীরা যেখানে ভাষার বহিরঙ্গ গঠন (structure) বিশ্লেষণে তাঁদের দৃষ্টিকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছিলেন, ভাষার অন্তরঙ্গ দিক অর্থের (meaning) উপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন নি, স্যাপির সেখানে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছিলেন। তিনি ভাষা ও সাহিত্য দু'য়েই সমান আগ্রহী ছিলেন বলে বুঝতে পেরেছিলেন ভাষার 'অর্থ'ই

(meaning) ভাষার প্রাণ, অর্থবহতাই ভাষার উপযোগিতা প্রমাণ করে। ভাষার গঠন তার দেহমাত্র। তাই তিনি ভাষার অর্থগত গুরুত্বের (semantic value) সঙ্গে ভাষার গঠনগত দিকের (structure) যোগ অস্বীকার করতে পারেন নি। স্যাপিরের নির্দিষ্ট ভাষার এই অর্থগত দিক ও গঠনগত দিকের ধারণার উপরেই চমস্কির deep structure ও surface structure-এর প্রতিষ্ঠা। চমস্কি তাঁর ব্যাকরণে দুইদিকেরই গুরুত্ব স্বীকার করেছেন :

"......the syntactic component of a grammar must specify, for each sentence, a 'deep structure' that determines its semantic interpretation and a 'surface structure' that determines its phonetic interpretation. The first of these is interpreted by the semantic component ; the second, by the phonological component."[১৬]

সর্বশেষে আসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্যের স্বীকৃতি। চমস্কির উদার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি আমাদের বিস্মিত করে যখন দেখি তিনি নিজেই বলছেন, ভাষার অফুরন্ত বাক্য আমরা রচনা করে চলি কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়ম ও সীমাবদ্ধ উপকরণের সাহায্যে —এই ধারণাটি অভিনব নয়। এই ধারণার উৎস যেমন হুম্বোল্টে তিনি পেয়েছেন তেমনি পেয়েছেন পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী'তে : "What is more, it seems that even Pāṇini's grammar can be interpreted as a fragment of such a 'generative grammar' in essentiaially the contemporary sense of this term."[১৭] পরবর্তী গবেষকেরা আরো এগিয়ে গেছেন এবং চমস্কির deep structure ও surface structure-ও তাঁরা পাণিনির রচনায় আবিষ্কার করেছেন।[১৮]

সামগ্রিক বিচারে মনে হয়, চমস্কির অভিনব ভাষাবিজ্ঞানের তত্ত্বগুলি আকস্মিক অনিকেত (rootless) কোনো ব্যাপার নয়। চমস্কির নিজের কথায় "'its roots are firmly in traditional linguistics".[১৯]

১। Verburg, P. A. ; 'Lingua', 2, 1950, 441.

২। "Bloomfield did attempt to work out of his philosophy of grammar within the behaviorist boundaries."—Grinder, John T. and Elgin, Suzete Haden : 'Guide to Transformational Grammar, 'Holt, Rinehart' Winston Inc., 1973, p. 31.

৩। Robins, R. H. :'A Short History of Linguistics', London, 1969, p. 227.

৪। Chomsky, Noam : 'Aspects of the Theory of Syntax', Cambridge, Massachusetts, 1976 (1th. printing), p. 6.

৫। Plato : 'Dialogues' (''Sophist'').

৬। Chomsky, Noam : 'Aspects of the Theory of Syntax', Cambridge, Massachusetts, 1976. p. 4.

৭। 'Poetics,' Sec. 22. ('Aristotle on the Art of Poetry', trans. by Ingram-Bywater, London, 1959, p. 75).

৮। আধুনিক ভাষাদৃষ্টি সহজ করে ব্যাখ্যা করে একজন বলেছেন :

"......grammarians have absolutely no authority to prescribe what is 'right' or 'wrong' but can merely state what is the actual usage, and they are good or bad grammarians as they report truthfully on this point."

—Wyld, H. C. : 'Historical Study of the Mother Tongue', p. 3.

৯। "An unfortunate outgrowth of the general grammar idea was the belief thar the grammarian···can···prescribe how people ought to speak.......This gave the authoritarians their chance : they wrote normative grammars, in which they often ignored actual usage in favor of speculative notions...Both the belief in 'authority' and some of the fanciful rules (as, for instance, about the use of of 'shall' and 'will') still prevail in our schools."

—Bloomfield, Leonard : 'Language', New York, 1933, p. 6.

১০। Chomsky, Noam : 'Aspects of the Theory of Syntax', Cambridge, Massachussetts, 1976, p. 9.

১১। Lyons, John : 'Chomsky', London, 1970, p. 57.

১২। Humboldt, Wihhelm von : 'Uber die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues,' Darmstadt, 1949, p. 41.

১৩। Ilid, p. 103.

১৪। Bierwisch, Manfred : 'Modern Linguistics', The Hague, 1971, p. 48.

১৫। King, Robert D. : 'Historical Linguistics and Generative Grammar', New Jersey, 1969. p. 11.

১৬। Chomsky, Noam : 'Aspects of the Theory of Syntax', Cambridge, Massachusetts, 1976 p. 16.

১৭। Praface to 'Aspects of the Theory of Syntax', 1976. p. v.

১৮। Subrahmanyam, P. S. : 'Deep Structure and Surface Structure in Pāṇini' (Indian Linguistics, Vol. 36, No. 4. p, 346 (Dec. 1975).

১৯। 'Current Issues in Linguistic Theory', The Hague, 1964, p, 25.

বিদ্যাসাগরের বাসুদেব চরিত গ্রন্থের প্রামাণিকতা ও সম্ভাব্য হিন্দী মূল

সুধাকর চট্টোপাধ্যায়*

বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে বিদ্যাসাগর কতখানি স্থান অধিকার করে আছেন এতদিন তাই নিয়ে পণ্ডিতে পণ্ডিতে বেশ মতানৈক্য ছিল। তবে মোটামুটি সবাই একরকম ধরে নিয়েছিলেন বিদ্যাসাগরের বাংলা গদ্যে ঈশ্বরত্ব বা ঐশ্বর্য না থাকলেও তার মধ্যে একটা সুন্দর ভারসাম্য এবং প্রসাদগুণ ছিল। তাঁর লেখা মোটামুটি চলেছিল অনুবাদ অনুসরণের পথে, তাই স্রষ্টা হিসাবে তাঁর রচনায় এমন কিছু পাওয়া যাবে না যাতে তাঁকে খুব উচ্চাঙ্গের মৌলিক লেখক বলা যেতে পারে। অন্ততঃ পরবর্তীকালের সাহিত্যসাধনার কথা চিন্তা করলে গদ্য সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁর স্থান যে প্রথম সারিতে বলা চলে না এ বিষয়ে অনেক পণ্ডিত এক মত। তবে অনুবাদক হিসেবে তাঁর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে এবং অনুবাদ অনুসরণের মধ্য দিয়ে তিনি যে বাংলা গদ্য সাহিত্যে একটা মর্যাদার আসন পেতে পারেন সে বিষয়ে কোনও দ্বিমত নেই। এতদিন আমাদের জানা ছিল যে বিদ্যাসাগরের প্রথম গদ্য রচনা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে সেরেস্তাদার থাকা কালে ভাগবতের দশম স্কন্ধ অবলম্বনে রচিত "বাসুদেব চরিত" গ্রন্থ। বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৪১ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগের সেরেস্তাদার বা প্রথম পণ্ডিতের পদ পেয়েছিলেন। ১৮৪৭ সালে হিন্দী 'বৈতাল পচ্চীসী' অবলম্বনে রচিত তাঁর "বেতাল পঞ্চবিংশতি" গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের নির্দেশে। কিন্তু "বাসুদেব চরিত" গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় নি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যু ঘটে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ৭১ বৎসর বয়সে এবং মৃত্যুর তিন-চার বৎসরের মধ্য বিহারীলাল সরকার [বিদ্যাসাগর (১৮৯৪)] এবং চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (বিদ্যাসাগর ১৮৯৫) তাঁর জীবনী প্রকাশিত করেন। দুজনের সঙ্গেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল এবং চণ্ডীচরণ বিদ্যাসাগরের বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। (১) এঁদের জীবনী থেকে জানা যায় বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮১১—১৮৪৭ এর মধ্যে "বাসুদেব চরিত" রচনা করেন।

(২) বিদ্যাসাগরের গ্রন্থটি মুদ্রিত হয় নি। কিন্তু পাণ্ডুলিপিটি জীর্ণ অবস্থায় বিদ্যাসাগর পুত্র নারায়ণবাবুর কাছে তাঁরা দেখেছিলেন।

(৩) বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হাতের লেখার সঙ্গে পরিচয় ছিল তাঁদের এবং তাঁরা উভয়েই এই পাণ্ডুলিপি থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

---

* ডঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কলেজের বাংলার অধ্যাপক এবং বিদ্যাসাগরের প্রদৌহিত্র স্থানীয় ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের পাঠচক্রে তিনি যে আলোচনা করেছিলেন এটি তারই সংক্ষেপিত রূপ। আলোচনার কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি অকালে প্রাণত্যাগ করেন। এই আলোচনা 'বাংলা সাহিত্য পত্রিকা'য় প্রকাশিত হোক এই ছিল তাঁর অন্তিম ইচ্ছা।

(৪) বিহারীলাল সরকার গ্রন্থটি আদ্যোপান্ত পড়েছেন এবং বলেছেন—

ক. "বাসুদেব চরিত" শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ অবলম্বন করিয়া রচিত।

খ. কোনও স্থানে মূল ভাগবতের কাহিনী পরিত্যক্ত

গ. কোনও স্থানে ভাব মাত্র গৃহীত

ঘ. কোনও স্থান অবিকল ভাষান্তরিত।

বিহারীলাল সরকার আরও বলেছেন এক হিন্দী "প্রেম সাগর" ভিন্ন বাংলায় শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ে এমন সুললিত গদ্য গ্রন্থ ছিল না। বিহারীলাল "বাসুদেব চরিত" থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন একাধিক। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও স্বতন্ত্র স্থান থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এখন ডঃ সুকুমার সেন মত প্রকাশ করেছেন, যে বর্তমানে এসিয়াটিক সোসাইটিতে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের এক সিভিলিয়ান ছাত্রের কৃষ্ণলীলা বিষয়ক একটি বই আছে। বইটির লেখক হেনরি সারজ্যাণ্ট। ডঃ সেনের মতে—"তখন তিনি বোধকরি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষক ছিলেন—সারজ্যাণ্টকে সাহায্য করিয়াছিলেন। এই হইতেই বোধহয় 'বাসুদেব চরিত' কিংবদন্তীর উৎপত্তি।"

ডঃ সেনের সিদ্ধান্ত যে ভুল তা অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় "আধুনিক বাংলা সাহিত্যের দ্বিপ্রহর" গ্রন্থে বিশদভাবে দেখিয়েছেন। তিনি হেনরি সারজ্যাণ্ট-এর পাণ্ডুলিপি এবং 'বাসুদেব চরিত' গ্রন্থের উদ্ধৃতিগুলির তুলনামূলক আলোচনা করেছেন এবং বিহারীলাল সরকারের উদ্ধৃত অংশের সঙ্গে হেনরি সারজ্যাণ্টের অনুরূপ অংশের পার্থক্য কোথায় তা চমৎকারভাবে দেখিয়েছেন। আর চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় যে উদ্ধৃতি দুটি দিয়েছেন তার সঙ্গে হেনরি সারজ্যাণ্টের গ্রন্থের কোনও মিল নেই। চণ্ডীচরণের দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটি বিষয়ে আমি বিশেষ আলোচনা করব।

"বাসুদেব চরিত" গ্রন্থের প্রামাণিকতা বিচার করলে দাঁড়ায়—

(ক) হয় বিহারীলাল মিথ্যা কথা বলেছেন নয় নারায়ণবাবুর কাছ থেকে যে পুঁথি পেয়েছেন তা জাল। নারায়ণবাবু অর্থাৎ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্র আমার বাবার মামা হতেন। নারায়ণবাবুর অনেক দোষ হয়ত ছিল, কিন্তু তিনি জালিয়াৎ ছিলেন একথা শুনিনি। তাছাড়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হাতের লেখা তখন অনেকের কাছেই ছিল এবং বিহারীলালবাবু সে লেখা বিশেষ চিনতেন। সুতরাং যদি বিহারীলাল বাবুর কথা ঠিক হয় তাহলে তা হেনরি সারজ্যাণ্টের লেখা নয়—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বহস্ত লিখিত।

(খ) চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় "বাসুদেব চরিত" থেকেও উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি পৃষ্ঠার সংখ্যা পর্যন্ত উদ্ধৃত করেছেন। হেনরি সারজ্যাণ্টের বইটিতে ঐ পৃষ্ঠাগুলিতে অনুরূপ বিষয় নেই।

(গ) এছাড়া চণ্ডীচরণ যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা বিদ্যাসাগর ছাড়া অন্য কারো হওয়া সম্ভব নয়। তার কারণ তাঁর একটি উদ্ধৃতি ভাগবতের ঠিক অনুবাদ নয়, অনুসরণও নয়, কিন্তু ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে জন গিলক্রিস্টের অনুপ্রেরণায় লাল্লুলাল

প্রেমসাগর নামে ভাগবতের দশম স্কন্ধের হিন্দী ভাষান্তর করে প্রকাশ করেছিলেন ১৮৬০ সম্বতে অর্থাৎ ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে, তার সঙ্গে আশ্চর্য্য মিল আছে।

(ঘ) বিদ্যাসাগর মহাশয় লাল্লুলালের "প্রেমসাগর" গ্রন্থ যে ভাল করে পড়েছিলেন তা জানা যায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ১৮৫২ সালের ১৫ই জানুয়ারীতে লেখা হিন্দী "বৈতাল পচ্চীসী"র ইংরাজী ভূমিকায়। সেখানে তিনি লাল্লুলাল প্রসঙ্গে বলেছেন, Lallu Lal kab the elegant writer of Premsagar."

(ঙ) বিদ্যাসাগর মহাশয় লাল্লুলালের হিন্দী গ্রন্থ অবলম্বন করে বাংলায় "বেতাল পঞ্চবিংশতি" (১৮৪৭) লিখেছিলেন।

(চ) "বাসুদেব চরিত" গ্রন্থের লেখক নিঃসন্দেহে সংস্কৃত ও হিন্দী জানা কোনও ব্যক্তি এবং যিনি সহজ সরল বাংলাও লিখতে পারেন, রসিকতাও করতে পারেন। চণ্ডীচরণের উদ্ধৃতি সহযোগেই তা প্রমাণ করব। এমন ব্যক্তি নারায়ণবাবু নিঃসন্দেহে নন। আর বিহারীলালের উদ্ধৃতিগুলির মধ্যে ভাগবতের অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তিনিই লাল্লুলালের 'প্রেমসাগর' গ্রন্থের কথা বলেছিলেন। চণ্ডীচরণ লাল্লুলালের 'প্রেমসাগর' গ্রন্থের কথা স্মরণ করেন নি, কিন্তু তাঁর উদ্ধৃতিগুলির মধ্যে একটিতে বিদ্যাসাগরী ঢং ও লাল্লুলালের অনুসরণ অত্যন্ত স্পষ্ট।

(ছ) চণ্ডীচরণের উদ্ধৃতির মধ্যে 'বাসুদেব চরিত' গ্রন্থের একটি কবিতা আছে। সে কবিতাটি ভাগবতের অনুবাদ নয়, লাল্লুলালের অনুবাদ। লাল্লুলালের 'প্রেমসাগর' গদ্যে রচিত কিন্তু মাঝে মাঝে কবিতা আছে। মূল ভাগবত সংস্কৃতে পদ্যে বিরচিত। তাতে অনেক ছন্দ আছে। লাল্লুলাল কাহিনীর একটি প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গ যাবার কালে গদ্যের মধ্যে কবিতা ব্যবহার করেছেন। "বাসুদেব চরিত" গ্রন্থে কেবল কবিতা নয়, হিন্দীর ভাষান্তর (সংস্কৃতের নয়) বিস্ময়কর।

(জ) প্রশ্ন উঠতে পারে বিদ্যাসাগর মহাশয় কি কবিতা লিখেছিলেন? আমরা সকলেই জানি বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃতে কবিতা লিখে কলেজ থেকে অনেক টাকার পুরস্কার পেয়েছিলেন। এছাড়া রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর মহাশয় বিরচিত "জল পড়ে পাতা নড়ে" স্মরণ করেছেন। এখন অবশ্য "জল পড়িতেছে পাতা নড়িতেছে" পাঠান্তর লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু যদি রবীন্দ্রনাথের ভ্রম না হয়ে থাকে তাহলে "জল পড়ে পাতা নড়ে" পাঠের মধ্যে কবি বিদ্যাসাগরের কিছুটা পরিচয় কি পাওয়া যায় না? পরবর্তী-কালের বেনামী রচনাতে বিদ্যাসাগরের পয়ার ছন্দের কবিতা পাওয়া যায়।

(ঝ) বিহারীলাল এবং চণ্ডীচরণ উভয়েই বিদ্যাসাগর রচিত "বাসুদেব চরিত" গ্রন্থের কথা বলেছেন। হেনরি সারজ্যান্টের (এসিয়াটিক সোসাইটি A 41 সংখ্যক পুঁথি) গ্রন্থের নাম "বাসুদেব চরিত" নয়।

(ঞ) অনুবাদক যেখানে মূল থেকে সরে এসে স্বতন্ত্র পথগামী হয়েছেন সেখানে দুজন অনুবাদকের রচনার তুলনামূলক আলোচনা করব। কারণ পরীক্ষার খাতা দেখার ক্ষেত্রে দুটি ছাত্র যখন ঠিক উত্তর করে তখন কে কার নকল করেছে বোঝা

যায় না। কিন্তু দুজনে যখন একই রকম ভুল করে বা একই রকম বিচ্যুতি দেখায় তখন একজনের লেখার সঙ্গে অপরের লেখার যোগ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। লাল্লুলাল এবং বিদ্যাসাগর উভয়েই ভাগবত থেকে সরে এসে একই রকম কথা বলেছেন তখন উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ অস্বীকার করা যায় না। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় "বাসুদেব চরিত" থেকে যে দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটি দিয়েছেন ("বাসুদেব চরিত"-এর পাণ্ডুলিপির ৬৪ পৃ) তার সঙ্গে মূল ভাগবতের অংশ বিশেষ এবং লাল্লুলালের অনুরূপ অংশের তুলনামূলক আলোচনা করা যাক।

কৃষ্ণলীলার ঐ অংশটি হল মূল সংস্কৃত ভাগবতের দশম স্কন্ধের ২৪ অধ্যায়— ইন্দ্রযজ্ঞভঙ্গ। আমরা পঞ্চানন তর্করত্নের প্রামাণ্য বাংলা (অনুবাদ সংস্করণ) থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

"শ্রীকৃষ্ণ গোপগণের বিশ্বাসজনক অন্যপ্রকার রূপ ধারণ করিয়া "আমি পর্বত" এই বলিয়া রাশি রাশি বলি ভোজন করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে তাঁহার শরীর বিশাল হইয়া উঠিল। অনন্তর ব্রজবাসীদিগের সহিত আপনিই সেই পর্বতরূপী আপনাকে নমস্কার করিয়া কহিলেন, কি আশ্চর্য! সকলে দেখ এই পর্বত মূর্তিমান হইয়া আমাদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ করিলেন। ইনি কামরূপী। বনবাসী মনুষ্য সকল ইঁহাকে অবজ্ঞা করে সেইজন্য ইনি তাঁহাদিগকে বিনাশ করিয়া থাকেন। আমরা আপনাদিগের এবং গোপগণের মঙ্গলের নিমিত্ত ইঁহাকে নমস্কার করি।" শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় এই প্রকার যথাবিধানে যজ্ঞ করিয়া গোপগণ তাঁহার সহিত ব্রজে প্রত্যাগমন করিলেন।

চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত

পঞ্চবিংশ অধ্যায় : গোবর্দ্ধন ধারণ

"শুকদেব কহিলেন, রাজন! নিজের পূজা ভঙ্গ হইয়াছে শুনিয়া ইন্দ্র কৃষ্ণাধীন নন্দাদি গোপের উপর ক্রুদ্ধ হইলেন।"

[শ্রীমদ্ভাগবত : পঞ্চানন তর্করত্ন : অষ্টম সং পৃ ৫৮৬।৮৭]

[মূল ভাগবত—

কৃষ্ণঃ তু অন্যতমং রূপং গোপবিশ্রম্ভণংগতঃ ।১০।২৪।৩৫
শৈলঃ অস্মি ইতি ব্রুবন্ ভূরি বলিম্ আদৎ বৃহদ্বপুঃ ॥
তস্মৈঃ নমো ব্রজজনৈঃ স চক্রে আত্মনা আত্মনে।
অহো পশ্যত শৈলঃ অসৌ রূপী নঃ অনুগ্রহং ব্যধাৎ ॥ ৩৬
এষঃ অবজানতঃ মর্ত্যান্ কামরূপী বনৌকসঃ।
হন্তি হি অস্মৈ নমস্যামঃ শর্মণে আত্মনঃ গবাম্ ॥ ৩৭
ইতি অদ্রি গো-দ্বিজ-মখং বাসুদেব প্রণোদিতাঃ।
যথা বিধায় তে গোপাঃ সহ কৃষ্ণা ব্রজং যযুঃ ॥ ৩৮
[ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পরমহংসী সংহিতায়ং দশম স্কন্ধে পূর্বার্ধে চতুর্বিংশ অধ্যায়ঃ।

অথ পঞ্চবিংশঃ অধ্যায়ঃ।

শ্রীশুক উবাচ

ইন্দ্রঃ তদা আত্মনঃ পূজাং বিজ্ঞায় বিহতাং নৃপ।

গোপেভ্যঃ কৃষ্ণনাথেভ্যঃ নন্দাদিভ্যঃ চুকোষা সঃ॥ ১]

বিদ্যাসাগর কৃত ঐ অংশের চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ধৃত উদ্ধৃতি :—

"এইরূপে কৃষ্ণের পরামর্শানুসারে দেবরাজের পূজা পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনবাসীরা গোবর্ধন পর্বতের অর্চনার বিধি সংস্থাপন করিলেন এবং মূর্তিমান দেব দর্শন করিয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, দেখ ভাই, আমরা এতাবৎকাল পর্য্যন্ত ইন্দ্রের পূজা করিয়াছিলাম কখন দর্শন পাই নাই কিন্তু অদ্য একবার মাত্র অর্চনা করিয়া গিরিদেবের দর্শন পাইলাম অতএব এতদিন আমরা এমন প্রত্যক্ষ দেবতার উপেক্ষা করিয়া বৃথা কালক্ষেপ করিয়াছি। আজ কৃষ্ণ হইতে আমাদের ভ্রম নিবারণ হইল। কৃষ্ণ দেখিতে বালক বটে কিন্তু বুদ্ধিতে আমাদের পিতামহ। এইরূপে নানাবিধ কথোপকথন করিয়া কৃষ্ণগুণগান করিতে লাগিলেন এবং নৃত্যগীতাবসানে পুনরায় পর্বত প্রদক্ষিণ করিয়া কৃষ্ণের সহিত বৃন্দাবন প্রবেশ করিলেন।

ত্যজিয়া ইন্দ্রের পূজা পর্বতে পূজিল।

শুনিয়া ইন্দ্রের মনে ক্রোধ উপজিল॥"

[চণ্ডীচরণ : বিদ্যাসাগর : বাসুদেব চরিত পৃ. ৬৪]

লাল্লুলালের ভাষায় :—

"তিস কাল নন্দলালউধর অতি মোটা ভারী দূসরী দেহ ধর বড়ে বড়ে হাথ পাঁব কর কমলনয়ন চন্দ্রমুখ হো মুকুট ধরে, বনমালা গেরে পীত বসন ঔর রত্নজড়িত আভূষণ পহন মূহঁ পসারে চুপচাপ পর্বত কে বীচ সে নিকলে ঔর ইধর আপ হী নে দূসরে রূপ কো দেখ সব সে পুকার কে কহা দেখো গিররাজ প্রগট হো দর্শন দিয়া জিনকী পূজা তুমনে কী লগায় কীনী হৈ।

ইতনা বচন সুনায়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রজী নে গিরিরাজ কো দণ্ডবৎ কী ঔসকী দেখা দেখী সব গোপ প্রণাম কর আপ্‌স মেঁ কহনে লগে কি ইস ভাঁতি ইন্দ্রনে কব দর্শন দিয়া থা। হম নে বৃথা উসকী পূজা কী। ঔর ক্যা জানিয়ে, পুরখাওঁবে ঐসে প্রত্যক্ষ দেবতাকো ছোড় ক্যোঁ ইন্দ্রকো মানা। ইয়হ বাত সমঝমেঁ নহী আতী ইয়োঁ। সব বতবায় রহে থে········ গোপীগোপ ········ফির পর্বত কী পরিক্রমা দে দূসরে দিন গোবরধন সে চলে হঁসতে হঁসতে বৃন্দাবন আয়ে········

ইতি শ্রীলাল্লুলাল কৃতে প্রেম সাগরে গোবর্ধন পূজা নাম

পঞ্চবিংশ অধ্যায়ঃ। অধ্যায় ২৬

দোহা—সুরপতি কী পূজা তজী করি পর্বত কী সেব।

তবহি ইন্দ্র কা সহ কোপ কে সব বুলায়ে দেব॥]

উপরে উদ্ধৃত অংশের বিদ্যাসাগর কৃত 'পরস্পর কহিতে লাগিলেন······কালক্ষেপ

করিয়াছি।" এবং লাল্লুলালের "সব গোপ প্রণাম কর……ইন্দ্র কো মানা।"—এই উভয়ের মধ্যে মিল লক্ষ্য করুন। পরবর্তী অংশের মিল লক্ষ্য করুন। শেষকালে 'বাসুদেব চরিত' থেকে উদ্ধৃত কবিতার সঙ্গে লাল্লুলালের কবিতার মিল লক্ষ্য করুন। ভাগবতে ইন্দ্রের পূজা পরিত্যক্ত হবার কথার পর পর্বত পূজার কথা নেই। লাল্লুলালে এবং বিদ্যাসাগরে আছে। তারপর ইন্দ্রের ক্রোধ বর্ণিত আছে এইভাবে "গোপেভ্য কৃষ্ণনাথেভ্যঃ নন্দাদিভ্যঃ চুকোপ সঃ।" লাল্লুলাল এদের প্রতি ক্রোধের কথা বলেন নি কেবল দেবতাদের ডাক দেবার কথা বলেছেন। বিদ্যাসাগরও কৃষ্ণাধীন নন্দ আদি গোপের কথা বলেন নি। লাল্লুলালের ন্যায় রাজাকে সম্বোধন করেন নি এবং এই পয়ারের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের বেনামী রচনা "ব্রজবিলাস"—এর পয়ার ছন্দের কবিতা দেখুন। শেষতঃ বিদ্যাসাগরীয় পরিহাসের বিশিষ্ট ঢংটুকু লক্ষ্য করা যাক— "কৃষ্ণ দেখিতে বালক বটে কিন্তু বুদ্ধিতে আমাদের পিতামহ।"

ইন্দ্র মিত্র "করুণাসাগর বিদ্যাসাগর" গ্রন্থে বিহারীলাল এবং চণ্ডীচরণ উভয়ের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। সুখময়বাবু ঠিকই বলেছেন 'বাসুদেব চরিত' বিদ্যাসাগরের প্রথম রচনা হলেও এর ভাষা আশ্চর্য রকমের সুন্দর। বিশেষ করে নিচের অংশটি (চণ্ডীচরণের প্রথম উদ্ধৃতি) দেখুন :—

ভাগবতের গদ্যে বঙ্গানুবাদ : পঞ্চানন	**বাসুদেব চরিত : বিদ্যাসাগর**	**প্রেমসাগর : লাল্লুলাল**
একদা বলরাম প্রভৃতি গোপ-বালকেরা ক্রীড়া করিতে করিতে আসিয়া মাতা যশোদাকে নিবেদন করিল, "কৃষ্ণ মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়াছে।" হিতৈষণী যশোদা শিশুর হস্তদ্বয় ধারণপূর্বক ভয়-চকিতলোচন পুত্রকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন "রে দুর্বিনীত! নির্জনে মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়াছিস কেন? এই সকল ব্রজ-বালক এবং জ্যেষ্ঠ রামও বলিতেছে।"*	একদিবস কৃষ্ণ বলরাম ও অন্য অন্য গোপ বালকেরা একত্র মিলিয়া খেলা করিতেছিলেন ইতিমধ্যে বলরাম প্রভৃতি গোপ-নন্দনেরা নন্দমহিষীর নিকটে গিয়া কহিল ওগো কৃষ্ণ মাটী খাইয়াছে। **আমরা বারণ করিলাম শুনিল না।** তখন পুত্রবৎসলা যশোদা অস্তব্যস্তে আসিয়া কৃষ্ণের **গণ্ড ধরিলেন** এবং তর্জ্জন করিয়া কহিলেন, রে দুষ্ট, তুই মাটি	আগে একদিন কৃষ্ণ-বলরাম সখিয়োঁ কে সঙ্গ রেত মেঁ খেলতে থে কি কান্‌হা নে মিট্টি খাই। তো এক সখী নে যশোদা সে জা লগাঈ, **বহ ক্রোধ কর হাথ মে ছড়ী লে আঈ**। মাঁ কো রিস ভরী আতী দেখ মুঁহ পোঁছ কর ডর কর খড়ে হো রহে, দেখতে হী উনহোঁনে… কহা ক্যোঁওরে! তুনে মিট্টি ক্যওঁ খাঈ?" প্রেমসাগর : নবম অধ্যায়

সং মূল—১০ম স্কন্ধ। ৮ম অধ্যায়। ৩২-৩৪

একদা ক্রীড়ামানাঃ তেঃ রামাদ্যাঃ গোপদারকাঃ কৃষ্ণ। মৃদং ভক্ষিতবান্ ইতি মাত্রে ব্যবেদয়ন্। ৩২

সা গৃহীত্বা করে কৃষ্ণম্ উপালভ্য হিতৈষিণী। যশোদা ভয় সম্ভ্রান্ত প্রেক্ষণাক্ষাম্ অভাষত ॥ ৩৩

কস্মাৎ মৃদম্ অদান্ত আত্মন্ ভবান ভক্ষিতবান রহঃ। বদন্তি তাবকা হি এতে কুমারাঃ তে অগ্রজঃ অপি অয়ম্ ॥ ৩৪

খাইয়াছিস্ রহ **আজ আমি তোকে মাটি খাওয়া ভাল করিয়া শিখাইতেছি।"**

উদ্ধৃত অংশে বিদ্যাসাগর স্থূল অক্ষরে মুদ্রিত অংশগুলিতে নূতনত্বের সঙ্গে পরিপক্ব পরিহাসপ্রিয়তার পরিচয় দিয়েছেন। লাল্লুলাল নূতনত্ব যোগ করেছেন যশোদার হাতে ছড়ি দিয়ে। বিদ্যাসাগর মহাশয় সখীদের বাদ দিয়েছেন। মূল সংস্কৃত ভাগবতে এর পূর্বে ও সখাদের সঙ্গে ক্রীড়ারত কৃষ্ণের বর্ণনা ছিল। তাই লাল্লুলাল এক সখীকে দিয়ে যশোদার কাছে লাগাবার বর্ণনা করেছেন। বিদ্যাসাগর বাদ দিয়েছেন সখীদের কথা।

উপরের আলোচনা থেকে আমার শেষ কথা হোল "বাসুদেব চরিত" কোনও কিংবদন্তী নয়। তা বিদ্যাসাগরেরই লেখা। আর বিদ্যাসাগর লাল্লুলালের গ্রন্থটিকে ভাগবতের অনুবাদের কাজে লাগিয়েছেন, যে কাজ ভালো সংস্কৃত-হিন্দী-বাংলা জানা লোকের পক্ষেই সম্ভব।

আন্তর্জাতিক সম্মেলন : একটি অভিজ্ঞতা

সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৮০ সালে আমেরিকার উইস্‌কনসিন বিশ্ববিদ্যালয় সাউথ এশিয়ান ষ্টাডিজ বিভাগ থেকে ইন্টারন্যাশন্যাল এসোসিয়েশন অব্‌ বুদ্ধিস্ট্‌ ষ্টাডিজ-এর সাধারণ সম্পাদক এ. কে. নারাইন-এর পত্র এল—

Dr. Subhas Chandra Banerjee ; Secretary University Colleges of Arts and Commerce ; Asutosh Building, Calcutta University Calcutta 700073.

Dear Dr. Banerjee, this is to inform you that the 3rd conference of the International Association of Buddhist studies is to be held jointly with the XIVth Congress of the International Association for the History of Religions from August 17-22, 1980, in Winnipeg Canada. Because of your interest and scholarship in the area of folklore I would like to invite you to attend this conference and present a paper on Buddhist literature and culture and Folklore of Bengal.

All future correspondences regarding the conference should be directed to Professor Leslie S. Kawamura, Dept. of Religious Studies, The University of Calgary, 2920 24th Ave. N. W., Calgary, Alberta T24 1N4, CANADA. He is the local co-ordinator for the IABS conference, and will be able to give you further information about the panels, conference arrangements, etc. Looking forward to seeing you in Canada, yours sincerely, Professor A. K. Narain, General Secretary, IABS. এর কয়েকদিন পরেই ২৯শে ফেব্রুয়ারী আর একটি পত্র পেলাম ফোর্টিন্থ কংগ্রেস অফ দি ইন্টারন্যাশন্যাল অ্যাসোসিয়েশন ফর দি হিষ্ট্রি অফ রিলিজিয়ান-এর সদর দপ্তর কানাডার উইনিপেগের ম্যানিটোবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অফ রিলিজিয়নের ডোনাল্ড ওয়েবীর কাছ থেকে, যিনি এই ফোর্টিন্থ্‌ কংগ্রেসের এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টার। তিনি জানালেন—On behalf of the Program Committee of the XIVth Congress of the IAHR, I have great pleasure in inviting you to participate in the Congress of the University of Monitoba during August 17-21, 1980, you are

invited to deliver your academic paper/research report in Section 3—Buddhism—I.A.B.S.

If you have not already done so, please use the enclosed form and complete your registration for the Congress. Information on accommodation and costs is enclosed. The Program/Abstracts booklet will be available in early July, 1980. (Please note that a 200 word abstract of your paper/report must reach the office of the Congress Secretariate by 15 March, 1980.)

your acceptance of this invitation wlll be much appreciated.

এই আমন্ত্রণ পত্র পাবার পর আহ্বায়কদের কাছ থেকে একটি প্রোগ্রাম এসে পৌছায়—

PROGRAM

The Academic program of the Congress will be divided into the customary specialist areas and will be carried in twenty sections.

I	II
African Religions	Methodology and Hermeneutics
Near Easter Mediterranean	Comparative and Phenomenological Studies
Buddhism	Anthropology of Religions
Christianity	Linguistics and Textual
East Asian Religions	Interpretation
Indian Religions	Psychology of Religion
Islam	Sociology of Religion
Judaism	Philosophy of Religion
Native Traditions in	Femininity of Religion
the America	Literature and Religion
	Art and Religion
	Religion, Ethics, and Society.

এরই সঙ্গে অনুরোধ এল একটি বিষয়ের সারাংশ পাঠাবার জন্য। বিষয়টির শীর্ষনাম ইতিপূর্বেই পাঠিয়ে দিয়েছিলাম সে-টি ছিল 'ইম্প্যাক্ট অফ বুদ্ধিজম অন দি ফোক্ রিলিজয়ন অফ বেঙ্গল'—যার মূল বিষয় ছিল বাংলার যে সব লৌকিক ধর্ম-সম্প্রদায় এখনও হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের পাশাপাশি নিজস্বতা নিয়ে লোক-সমাজের মধ্যে বর্তমান সেই সব বাউল, নাথ, নিরঞ্জন ধর্ম ইত্যাদির মধ্যে এখনও বৌদ্ধ ধর্মের

কিছু কিছু উপাদান যে অবস্থান করছে তাকে তথ্য ও প্রমাণাদির সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করা। ইতিপূর্বে প্রখ্যাত অধ্যাপক বিনয় সরকার, ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই ধারায় গবেষণা করে বহু তথ্য আবিষ্কার করে তাঁদের বিভিন্ন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। অপরদিকে বাংলার লোক-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও লোক-ধর্ম সম্পর্কে আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বহু গ্রন্থাদি ও গবেষণাপত্র রচনা করেছিলেন নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে। বাংলার লোকধর্মে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব সম্পর্কিত আলোচনা যেগুলি ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল তার মোটামুটি দুটি ধারা। একটি পরিপূর্ণভাবে দার্শনিক ও ধর্মনৈতিক দৃষ্টিতে পর্যালোচনা, অন্যটি সমাজবিজ্ঞানের অন্তর্গত নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে বিচার বিশ্লেষণ। এই দুয়ের সমন্বয় এবং এর সঙ্গে সাহিত্যের রস যুক্ত করে ব্যাপারটিকে যদি আরও বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করা যায় তা হলে এককালে বাংলাদেশে লোক-জীবনে মহাপ্রভাবশালী বৌদ্ধধর্মের কিছু কিছু নিদর্শন, বর্তমানে সেই ধর্মের বিলীয়মান রূপ ও তার খণ্ডাংশ বাউল গানে বাউল সাধনার আচারআচরণে ধর্ম পূজার মন্ত্রে, ধর্মের গাজনে, নাথ সাহিত্যের গল্পে-গানে নিরঞ্জন সম্প্রদায়ের আচার-অনুষ্ঠানে যদি কিছু পাওয়া যায় তাকে অনুসন্ধান করে পৃথিবীর বিদ্বজ্জনের সামনে পৌছে দিতে হবে। সেই উদ্দেশ্যেই বহু পরিশ্রম অনুসন্ধান ও বিচার বিশ্লেষণের ফলস্বরূপ গবেষণা পত্রটি তৈরী হল। এর মধ্যেই কংগ্রেস সেক্রেটারিয়েট থেকে জানান হল, এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রধান আলোচ্য বিষয় (মেন থিম্) হবে—"traditions in contact and change"—সুতরাং আমার পেপারটির সঙ্গে সম্মেলনের মেন থিমের বেশ সাদৃশ্য দেখা গেল। তার কারণ আমার পেপারের বিষয় ছিল আজকের 'বাংলার লোকধর্মে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব'। একদিন বৌদ্ধধর্মের বন্যা বাংলার জনসমাজকে প্লাবিত করেছিল নানাভাবে। তারপর সেই প্লাবন মন্দীভূত হবার পর বাংলার বিভিন্ন লৌকিক ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের যে পলি রয়ে গেল তার মধ্য দিয়েই এককালের ঐতিহ্য এবং বর্তমানের পরিবর্তনশীলতা কিভাবে পাশাপাশি অবস্থান করছে সেটিকে প্রকাশ করাই ছিল আমার মূল উদ্দেশ্য। সেদিক দিয়ে সম্মেলনের মেন থিম-এর সঙ্গে আমার গবেষণা পত্রটির একটি সাযুজ্য দেখা দিয়েছিল। এখন গবেষণা পত্র তো তৈরী হল, টাকার ব্যবস্থা কি করা যাবে? বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্যের নিকট দরবার করতেই এক কথায় যাতায়াতের একটা বিরাট অংশ দিতে রাজী হলেন; কারণ তিনি নতুন একটি নীতি গ্রহণ করেছিলেন যে, যে সব নতুন গবেষক প্রথমবার বিদেশে কোন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গবেষণাপত্র পাঠের আহ্বান পাবেন তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে সাহায্য করা হবে। বিরাট একটি বাধা সহজেই অতিক্রান্ত হল উপাচার্য ডঃ রমেন্দ্রকুমার পোদ্দার মহোদয়ের বদান্যতায়। তৎকালীন সহ-উপাচার্যদ্বয় অধ্যাপক দীপ্তিভূষণ দত্ত ও শ্রীঅরুণ রায় সানন্দে স্বীকৃতি জানালেন। আশীর্বাদ

জানালেন ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ও ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা বিভাগের পক্ষ থেকে। ইতিমধ্যে আমার এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনের বিরাট সূচীটিকে একটু বৈচিত্র্যপূর্ণ করে তোলার জন্য এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহারের জন্য একটি বৃহত্তর পরিকল্পনা গ্রহণ করলাম যার এক ভাগে থাকবে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান করা এবং একটি গবেষণা পত্র সেখানে উপস্থিত করা, দ্বিতীয় ভাগে থাকবে যেহেতু আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনের ব্যাপারটিকে বিশেষ করে স্নাতকোত্তর পঠনপাঠন ব্যাপারটির সঙ্গে প্রশাসক হিসাবে যুক্ত আছি, সেহেতু পাশ্চাত্য দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পঠনপাঠন এবং গবেষণা কিভাবে সংগঠিত হচ্ছে তার চাক্ষুষ পরিচয় লাভ করে একটি পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা অর্জন করা। টরণ্টো বিশ্ববিদ্যালয়, নিউ ইয়র্ক ষ্টেট ইউনিভারসিটি সেণ্টার (বাফেলো) হার্ভার্ড ইউনিভারসিটি, কলম্বিয়া ইউনিভারসিটির সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে গেল। আনন্দের কথা লণ্ডনের ব্রিটিশ কাউন্সিলের একটি আমন্ত্রণ পত্র পেয়ে গেলাম সেখানে গেষ্ট ভিজিটর হিসাবে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করার জন্য :

Dear Dr. Banerjee—we are looking forward very much to welcoming you here as a guest of the British Council and I do hope that your forthcoming visit to Britain will prove to be both fruitful and enjoyable. I assure you that my colleagues and I will do all we can to make it so. Miss Vivienne Taylor, who is a member of the staff of this Department, is responsible for the detailed arrangements of your visit and will discuss your arrival. I am enclosing some notes on the administrative and financial arrangements which I hope you will find useful. With all good wishes for a pleasent journey and a successful visit.—E T H Fitzsmmons : Director, Visitors Department, 15 July 1980.

সুতরাং ব্যবস্থা যখন সমস্ত হয়েই গেল তখন ট্রেড উইং-এর সহায়তায় বিমানের একটি টিকিট ক্রয় করা হল। সেটির যাত্রাপথ ছিল কলকাতা থেকে দিল্লী—দিল্লী থেকে সোজা নিউ ইয়র্ক—নিউ ইয়র্ক থেকে সোজা কানাডার উইনিপেগ—উইনিপেগ থেকে সোজা সম্মেলনস্থল। এবং ফেরার পথে নিউ ইয়র্ক পর্যন্ত ট্রেনে বা বাসে, তারপর নিউ ইয়র্ক থেকে লণ্ডন পর্যন্ত বিমানে চেপে ব্রেক জার্নি করে, লণ্ডন থেকে দিল্লী—দিল্লী থেকে কলকাতা। ছোট খাট অর্থে বলা যেতে পারে পৃথিবী পরিক্রমা। ১৯৮০ সালে ১৪ই আগষ্ট সন্ধেবেলায় বৃহস্পতিবারের বারবেলায় এয়ার বাসে যখন চাপলাম তখন কি ভেবেছিলাম কপালে অনেক দুর্ভোগ আছে। ঘণ্টা দু-একের মধ্যে দিল্লীর পালাম বিমান বন্দরে পৌছে শুরু হল বৃহস্পতিবারের বারবেলায়

যাত্রার ফল হাতে হাতে। করেন এক্সচেঞ্জ, কাষ্টমস্, সিকিউরিটি, চেকিং ইত্যাদি সেরে প্যান অ্যাম্-এর অতিকায় জাম্বো জেটে যখন উঠে বসলাম তখন মনে হলো ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গেলেই বুঝি ভালো হত। আগাগোড়া সমুদ্র-নীল কার্পেটে মোড়া একটি বিরাট হোটেলসদৃশ বিমানে বসে অরেঞ্জ ও লেমন স্কোয়াশ খেতে খেতে আর সঙ্গীতের মৃদু মূর্ছনা শুনতে শুনতে মনে হতে লাগল এটি বোধ হয় দূর দূরান্তে ভেসে চলেছে। কয়েক ঘণ্টা পরে, ঠিক জানি না, একটু মৃদু তন্দ্রা এসেছিল, জেগে উঠতেই দেখলাম যে জানলা দিয়ে দিল্লীর এয়ারপোর্টটি যথাপূর্ব দেখা যাচ্ছে, আর সমস্ত বিমান বন্দরটি সূর্যের সোনালি আলোয় আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। জানা গেল যে, বিমানের একটি ইঞ্জিনে গোলমাল থাকার জন্য এখন আর বিমানটি ছাড়বে না। এখন এই চারশ যাত্রীকে দিল্লীর অশোকা হোটেলে নিয়ে যাওয়া হবে বিশ্রামের জন্য। আধ ঘণ্টার মধ্যেই যাত্রীদের বিমানবন্দরের নিয়মকানুন অনুসরণ করে বিলাসবহুল বাসে করে অশোকা হোটেলে পৌঁছে দেওয়া হল। সমস্ত পনেরোই আগষ্ট অশোকাতে অবস্থান করার পর ষোল তারিখে বেলা এগারোটার সময় বিমানটি ছাড়ল লণ্ডনের উদ্দেশ্যে। ঐদিনই একটানা উড়ে একবার মাত্র ফ্রাঙ্কফুট বিমানবন্দরে থেমে লণ্ডনে এসে পৌঁছলাম বিকাল সাড়ে পাঁচটার সময়। এখান থেকে বিমানটির যাওয়ার কথা ছিল সোজা নিউইয়র্কে। কিন্তু যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য তা আর হয়ে উঠল না—যাত্রীদের নিয়ে চলল, সেরাটন স্কাইলাইন নামক একটি ফাইভ ষ্টার হোটেলে। সেখানে সারা রাত্রি অবস্থান করে পরের দিন সতেরো তারিখে বেলা দুটোয় এয়ার কানাডার একটি অতিকায় জাম্বো জেটে চেপে আটলান্টিক পার হয়ে সোজা টরন্টো-তে এবং তারপর ক্যাথে প্যাসিফিকের একটি ডোমাষ্টিক ফ্লাইটে চেপে কি করে উইনিপেগে পৌঁছলাম সে আর এক গল্প। সেকথা আপাতত থাক। তবে আশ্চর্যের কথা এই যে রাত সাড়ে নটায় উইনিপেগ এয়ার পোর্টে যখন নামলাম তখন সূর্যদেব সবে বিদায় নিয়েছেন। গোধূলির রক্তিম আভায় রঙিন হয়ে আছে সমগ্র বিমান বন্দরটি। সেখানে বাস প্রস্তুত ছিল। সম্মেলনের অভ্যর্থনার ব্যবস্থাও ছিল যথারীতি। ম্যানিটোবা বিশ্ববিদ্যালয়টি শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত হওয়ায় অনেকখানি পথ অতিক্রম করে যখন কন্‌ফারেন্স স্থলে এসে পৌঁছলাম তখন দেখি আমাদের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী সায়েন্স বিভাগের ডঃ পীযূষকান্তি মহাপাত্র উপস্থিত হয়েছেন। তারপর যথারীতি রেজিষ্ট্রেশান ও অন্যান্য ব্যাপারগুলি সমাধান করে শুনলাম কংগ্রেসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এবং এই উপলক্ষে যে নাগরিক সংবর্ধনা ছিল তা শেষ। কারণ কংগ্রেসের যে অনুষ্ঠানলিপি ছিল তা নিম্নরূপ :

শনিবার ১৬ই আগষ্ট সকালে ছিল কানাডিয়ান সোসাইটি ফর দি ষ্টাডি অফ্ রিলিজিয়ান-এর অভ্যর্থনা এবং দুপুরে ছিল অতিথিদের আগমন তথা যোগদানের জন্য নথীবদ্ধকরণ এবং বিজনেস মিটিংস। সন্ধ্যায় কোন কর্মসূচী ছিল না। রবিবার ১৭ই

আগষ্ট সকালে সম্মেলনে আহূত অতিথিদের রেজিষ্ট্রেশান, দুপুরে কোন কর্মসূচী ছিল না। রাত্রে সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এবং মেয়রের নাগরিক সংবর্ধনা। সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার (১৮-২১শে আগষ্ট) একটানা প্লেনারি সেশান ও অধিবেশন, দুপুরে ১৮ ও ১৯শে ছিল অধিবেশন এবং ২০শে ছিল বহির্ভ্রমণ এবং ২১শে দুপুর বেলায় কংগ্রেসের অধিবেশন এবং সন্ধ্যায় সমাপ্তি অধিবেশন। আর রোজই সন্ধ্যায় হয় অর্কেষ্ট্রা, নয় কনটেম্পরারী ড্যান্স, নয় ব্যাঙ্কোয়েট অথবা পার্টি।

আমার পেপারটি ছিল ১৯শে আগষ্ট মঙ্গলবার সেক্সন ফোর সেশনে। এছাড়া আরও তিনটি পেপার ছিল। পেপারগুলি যথাক্রমে কে. ভট্টাচার্যের—'ইন্টার অ্যাক্সান অফ রিলিজিয়ান্স: দি কম্বোডিয়া ফেনোমেনা'। সি. কাবলীসিং-এর—'মডার্ন ট্রেইণ্ডস্ অফ বুদ্ধিজম্ ইন থাইল্যাণ্ড' এবং এন. এইচ. সম্তানির—'টেক্সচুয়াল বুদ্ধিজম্ অ্যাণ্ড বুদ্ধিজম্ অ্যাজ প্র্যাক্টাইজড্ এণ্ড কম্প্যারেটিভ ষ্ট্যাডি উইথ্ স্পেশাল রেফারেন্স টু ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড থাইল্যাণ্ড।' যথাসময়ে স্লাইড ও টেপ সহযোগে আমার বক্তৃতা শুরু করলাম। সঙ্গে বাউল সম্প্রদায়ের ধর্মঠাকুরের কিছু রঙিন ছবি সংগ্রহ করে নিয়ে গিয়েছিলাম বাঙলা বিভাগের গবেষণা পরিষদের সহায়তায়। ধর্মের মন্ত্র ও বাউলের গান কিছু ক্যাসেটের মধ্যে ভরে নিয়েছিলাম। এগুলোর সাহায্য নেওয়ায় আমার পেপার বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে উঠল। বাংলার লোকধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ করে বাউল, নাথ, নিরঞ্জন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও যে বৌদ্ধধর্মের লুপ্ত ভগ্নাংশ ছড়িয়ে আছে সেগুলিকে এইড সহযোগে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করলাম। আমার সময় ছিল কুড়িমিনিট কিন্তু আমি পঁয়ত্রিশ মিনিট পর্যন্ত বলার অধিকার পেলাম। আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এই প্রথম বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে গবেষণা পত্রপাঠ। সুতরাং ভয় যে হচ্ছিল তা বলা বাহুল্য। কিন্তু কোথা থেকে একটা আত্মবিশ্বাস যেন আমার উপর ভর করেছিল। ফলে পরে যখন কয়েকজন এই বিষয়ে কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলেন আমি খুব সহজেই তাদের উত্তর দিয়ে খুশী করতে পেরেছিলাম। সবচেয়ে আনন্দের কথা ঐ সভায় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভারততত্ত্ববিদ ডঃ ব্যাসম উপস্থিত ছিলেন। তিনিও পরে গবেষণা পত্রটির প্রশংসা করেছিলেন। তারপর যথারীতি সম্মেলন শেষ হল। আমিও আমার বিদেশ যাত্রার দ্বিতীয় কর্মসূচী বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কার্য দর্শন ও অভিজ্ঞতা লাভ—এই পর্যায়ের ভ্রমণসূচী শুরু করলাম। উইনিপেগ থেকে ট্রেনে চেপে দেড়দিনের পথ অতিক্রম করে কানাডাব টরন্টো শহরে সেখানকার টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয় ও সীমন্স কলেজ পরিদর্শন করে আমেরিকার ব্যাফেলো শহরে নিউইয়র্ক ষ্টেট ইউনিভারসিটি পরিদর্শন করলাম। সেখান থেকে সোজা বোষ্টনে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং এম. আই. টি. পরিদর্শন, পরে নিউইয়র্কে কলম্বিয়া ইউনিভারসিটিতে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে আটল্যান্টিক

পার হয়ে সোজা লণ্ডন। এবং সেখানে বৃটিশ কাউন্সিলের আতিথ্যে লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্স, ম্যানচেষ্টার ইউনিভারসিটি, অক্সফোর্ড এবং কেম্ব্রিজ ইউনিভারসিটি পরিদর্শন করে যে অভিজ্ঞতা লাভ করলাম তা আমার জীবনে একটা স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে।

'বলাকা'র একটি কবিতা ঃ বস্তুগত বিশ্লেষণ

১

'বলাকা' কাব্যের ৩৬ সংখ্যক কবিতা ("সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা"), যেটি গোটা কাব্যের ধ্রুবপদ, তাহাকে বিশ্লেষণের বকযন্ত্রে ফেলিয়া, রাসায়নিক পরিস্রাবণ পদ্ধতিতে চোঁয়াইয়া, ঘোরতর রকমের আধুনিক শিকাগো-পন্থী সমালোচনার বিচিত্র পদ্ধতির সাহায্যে কাটাছেঁড়া করিয়া কবিতাটির মূল কথা ধরিবার চেষ্টা করা যাক। অবশ্য এই ব্যাপারে আমাদিগকে উৎসাহিত হইতে দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন, ইহা কবিগুরুর প্রতি অশ্রদ্ধার নিদর্শন। হৃদ্‌পিণ্ড দেহের ভিতরে থাকে, তাহাকে শবব্যবচ্ছেদের চৌকির উপরে ফেলিয়া কাটাকুটি করিলে জ্ঞানের পরিধি নিশ্চয় বাড়িয়া যায়, কিন্তু হৃদ্‌যন্ত্রের মালিকটির তাহাতে কিঞ্চিৎ আপত্তি হইতে পাবে। সে যাহা হউক, জ্ঞানবিজ্ঞানের সীমা বাড়াইবার জন্য এমন অল্পস্বল্প ত্যাগ করিতেই হয়। এই কার্যের জন্য কবিগুরু সারস্বতলোক হইতে আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন, অথবা পিতামহ ভীষ্মের মতো পাণ্ডবপক্ষ ও ধার্তরাষ্ট্রপক্ষ—উভয়কেই স্নেহহাস্যে সহ্য করিবেন তাহা লইয়া গোলে পড়িয়াছি। তবে বিশ শতকের সত্তর-আশির দশকে বাঁচিয়া থাকিলে তিনি নব্য সমালোচকের খনিত্রযন্ত্রের খোঁচাখুঁচি হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ।

অধুনা পশ্চিম বিশ্বে, বিশেষতঃ মার্কিন মুল্লুকে সাহিত্য-সমালোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণের নবপদ্ধতি পুরাতন আমলের আলোচনাকে বেবাক পাশ কাটাইয়া বুদ্ধিজীবী মহলে বেশ আসর জাঁকাইয়া বসিয়াছে, এদেশেও তাহার অল্পস্বল্প প্রতিধ্বনি শুনা যাইতেছে। এই সমস্ত বস্তুগত, নিঃস্পৃহ, বিজ্ঞানধর্মী গজকাঠির সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কাব্যের কোন-একটি কবিতার তাৎপর্য মাপিবার চেষ্টা করা যাইতেছে। অবশ্য এ-কথা কবুল করিতে বাধা নাই যে, কোন বাঁধাধরা পুঁথিপত্রের নির্দেশ না মানিয়া শুধু ব্যক্তিগত চিন্তার ঘুনিজালে রবীন্দ্রকাব্যের মহামীনটিকে ধরা যায় কিনা, তাহা দেখিবার জন্যই নিবন্ধকার লেখনীকণ্ডূয়ন উপলব্ধি করিতেছেন।

২

দীর্ঘকাল ধরিয়া কাব্যবিচার ও উপভোগের নানা পদ্ধতি চলিয়া আসিতেছে। কখনো কাব্যের উপর, কখনো কবির উপর, কখনো-বা পাঠকের উপর গুরুত্ব দিয়া কাব্যকবিতার বিচার চলিতেছে। অ্যারিস্টটল লংগাইনাস হইতে রিচার্ডস্, ভরত হইতে জগন্নাথ পর্যন্ত—প্রায় হাজার দুই বৎসর ধরিয়া সাহিত্যবোধ-বিচার-বিশ্লেষণ, কিছু পরিবর্তন সত্ত্বেও, একটা মূল ধারা বহন করিয়া চলিয়াছে। সাহিত্য বিশেষ ধরনের

মানসিক ব্যাপার। বস্তুজগৎ কবিমনে প্রবেশ করিয়া আর একটি ভাবজগৎ হইয়া গড়িয়া উঠিতেছে। সেই ভাবজগৎ-ই শিল্পরূপ লাভ করে। বলাই বাহুল্য কবির প্রকৃতি ও প্রবণতা শিল্পমূর্তি নির্মাণের প্রধান হাতিয়ার। মূলতঃ কবিচিত্তের স্বরূপ সন্ধানই কাব্য-সমালোচনার বাঁধাপথ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। কবির ভাঁড়ারের খবর সন্ধান একালের সমালোচনায় বিশেষ প্রয়োজন। নিছক ষোল আনা রসিক বলিবেন, ভাঁড়ারে কী আছে বা না আছে তাহা জানিয়া লাভ নাই, স্বাদু খাদ্য পাতে পড়িলেই হইল। কিন্তু একালের সমালোচকের সতর্ক চক্ষু ফাঁকি দিবার উপায় নাই, কবি-সাহিত্যিকের মনোভূমির তলদেশে সুগোপনে তাঁহার মানসিক কুটৈষণা লুকাইয়া থাকে। বেদেয় যেমন সাপের হাঁচি চিনিতে পায়ে, তেমনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন সমালোচকও লেখকের অন্তঃপুরের ঠিক খবরটি বাহির করিতে পারেন।

কবির রচনা একপ্রকার, পাঠকে তাহাকে আরেক প্রকার উপভোগের সামগ্রী করিয়া তুলে। বস্তুতঃ কবির বোধের জগৎ ও পাঠকের উপলব্ধির জগৎ কখনোই হুবহু একপ্রকার নহে। পাঠকে ও রসভোক্তায় কবিসৃষ্টিকে সম্পূর্ণ রূপে নিজ সৃষ্টি করিয়া লয়। কবির জগৎ পাঠকের মনোজগতে গিয়া আর একপ্রকার রূপান্তর গ্রহণ করে। ব্যক্তিভেদে তাই সাহিত্যবিচারের নানা ভেদ-পার্থক্য দেখা দেয়। একই কবির কাব্য সম্বন্ধে সমালোচকদের মধ্যে লাঠালাঠি বাধিয়া যাওয়াও বিচিত্র নহে। লিউইস (C. S. Lewis) এবং লিভিস (F. R. Leavis)—দুইজনেই *Paradise Lost*-এর রচনাকার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করিয়াছেন। দুইজনেই পণ্ডিত-রসিক এবং সাহিত্যের শক্তিমান ভাষ্যকার। লিউইস মিল্টনের যে গুণের জন্য *Paradise Lost*-কে প্রশংসা করিয়াছেন, লিভিস কিন্তু সেই গুণকে দোষ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। উভয়ের মানসিক গড়নই একই বস্তুকে ল্যাজামুড়া হইতে পৃথগ্‌ভাবে দর্শন করিয়াছে। সাহিত্যবিচার ও ব্যাখ্যায় কাহার বক্তব্য অকাট্য তাহা বলা যায় না। পাঠক নিজ নিজ প্রবণতা অনুসারে সাহিত্যবিচারে অভ্যস্ত। সুতরাং সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, কাব্য-সাহিত্য যেহেতু মানসিক ব্যাপার, এবং যেহেতু প্রত্যেকের মন পৃথক, সেই হেতু কোন রচনার মূল্য সম্বন্ধে মতভেদ ঘটিয়া থাকে। তাহা ঘটাই স্বাভাবিক। প্রকৃতির মধ্যে কত না বৈচিত্র্য, মানুষের মনও বিচিত্র ধরনের। একমাত্র শাসনদণ্ড উঁচাইয়া, কোতলের ভয় দেখাইয়া সকলকে একভাবে লিখিতে এবং পাঠককে একভাবে মূল্য বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যাইতে পারে। কিন্তু এ-সমস্ত বিধি শেষ পর্যন্ত বিকল্পে পর্যবসিত হয়। ধর্মজগতের 'যত মত তত পথ' কথাটা সাহিত্যবিচারে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কিন্তু আর একটা শঙ্কার কথা আছে। সাহিত্যবিচারে ব্যক্তিগত মতামতই একমাত্র সমালোচনাপদ্ধতি বলিয়া স্বীকৃত হইলে মতামতের কচকচিতে সাধারণ রসবোধ ঘুলাইয়া উঠিবে। ব্যক্তিগত বিচারবোধ সাহিত্যের মূল্য নির্ণয়ে কতটা বিড়ম্বনা সৃষ্টি করে রিচার্ডস্ (I.A. Richards) ১৯২০ সালের দিকে যে কাব্যবিচার পদ্ধতি চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন,

তাহা হইতেই বুঝা যাইবে। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ-বাইশ বৎসরের ছাত্র-ছাত্রীদের সাহিত্যবোধ লইয়া তিনি কাগজেকলমে একটি অভিনব পরীক্ষা করেন। তাঁহার বিশ্বাস ঐ বয়সেই ছাত্র-ছাত্রীগণ সাহিত্যবোধে ও উপভোগে লায়েক হইয়া উঠে, পরবর্তীকালে সাহিত্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে তাহাদের আর নূতন করিয়া বিশেষ কিছু আয়ত্ত করিতে হয় না। বুদ্ধি থাকিলে তাহারা পাঁজিপুঁথি ঘাঁটিয়া বস্তা বস্তা তথ্য উপাদান সংগ্রহ করিতে পারে। কিন্তু সাহিত্যের রসভোগ ঐ বিশ-বাইশ বৎসরের মধ্যেই প্রায় পাকা হইয়া যায়। রিচার্ডস জ্ঞাতনামা অথবা অজ্ঞাতনামা কবিদের রচনার মূল্য নির্ণয়ের জন্য তাঁহার ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যক্তিগত অভিরুচি অনুসারে মতামত জিজ্ঞাসা করেন। তাহারা কাগজেকলমে তাহার যে উত্তর দিল তাহা বিভ্রান্তিকর। কোন একটি কবিতা সম্পর্কে কোন পড়ুয়া বলিল—চমৎকার, ভাব-ভাষার এমন রাজযোটক মিল সে আর কোথাও দেখে নাই। আর একজন পাঠার্থী কাটিয়া কুটিয়া দোষ দেখাইয়া কবিতাটিকে নয়ছয় করিয়া ফেলিল। উভয়েই যুক্তি খাড়া করিতে পিছপাও হইল না। তাদের সেই সমস্ত বিচিত্র, বিভিন্ন, পরস্পরবিরোধী মতামত একসঙ্গে গ্রথিত করিয়া রিচার্ডস্ ১৯২৯ সালে *Practical Criticism* গ্রন্থটি প্রকাশ করিলেন। তাঁহার অভিমতের ব্যঞ্জনা বোধহয় এই: সাহিত্যবিচার শুধু ব্যক্তিগত অর্থাৎ subjective হইলে কবিতার প্রকৃতস্বরূপ কখনোই স্পষ্ট হইতে পারে না। তাই ব্যক্তিগত অভিরুচিকে আড়াল করিয়া objective method বা বস্তুগত রীতির দ্বারা কবিতার বিশ্লেষণ না হইলে তাৎপর্য সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত দেখা দিতে পারে। সুতরাং কোন শিল্পবস্তুর প্রকৃত তাৎপর্য অনুসন্ধান করিবার জন্য নিঃস্পৃহ, বৈজ্ঞানিক ও বস্তুগত দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন।

৩

রিচার্ডস্ তাঁর *Interpretation of Teaching*-এ এই সমস্যার নানাদিক উত্থাপন করিয়াছেন। *Sacred Wood*-এ এলিয়ট, *Survey* of *Modernist Poetry*-তে রবার্ট গ্রীভ্স্ এবং *Seven Types* of *Ambiguities*-এ উইলিয়ম এম্পসন কাব্য-বিচারের নানা সমস্যা—বস্তুগত, শব্দগত ও শব্দানুসারী অর্থগত দিক হইতে বিশ্লেষণের চেষ্টা করিয়াছেন। কেহ কেহ ভাষাবিজ্ঞানের আত্মজ স্টাইলিসটিক অর্থাৎ বিজ্ঞানসম্মত রচনারীতির দিক হইতে এবং explication অর্থাৎ প্রকরণ সংগঠন ও রচনাবস্তু বিশ্লেষণ করিয়া কবিতাবিচারের নূতন আয়তন ফুটাইয়া তুলিলেন। ইদানীং এ পদ্ধতি আমেরিকায় বেশ জনপ্রিয় হইয়াছে। সম্প্রতি কলিকাতায় ফাউলার সাহেব কয়েকটি বক্তৃতায় এই পদ্ধতির বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। একালে কবিতাকে সনাতন পন্থায় বিশ্লেষণ করা যুগধর্মবিরোধী বলিয়া মনে করা হইতেছে এবং Textual criticism পন্থী সমালোচকগণ অর্থাৎ শিকাগো সমালোচকগোষ্ঠী ও নব্য অ্যারিস্টটল-পন্থী—যাঁহারা নব্যসমালোচক বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা কবিতার পংক্তিবিন্যাস, ছন্দ,

বিরামচিহ্ন, ধ্বনিতত্ত্ব, স্বনিম, বাক্যগঠন, উদ্দেশ্য-বিধেয় সম্পর্ক, উপপত্তি নির্ণয় প্রভৃতি বিশ্লেষণ করিয়া বস্তুগতভাবে বিশুদ্ধ জ্ঞানাত্মক ও হিসাবনিকাশ-সংকুল গাণিতিক সংখ্যা-বিজ্ঞানের দ্বারা কবিতার মোদ্দা কথাটা ধরিবার চেষ্টা করিলেন। স্পিনগ্রান (Joel E. Spingran) ১৯১০ সালে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বক্তৃতায় এই পদ্ধতির প্রথম আভাস দিয়াছিলেন। র‍্যানসম (John Crowe Ransom) ১৯৪১ সালে 'The New Criticism' নামে যে গ্রন্থ প্রকাশ করেন তাহাতে এই রীতি বিস্তারিত আকারে ব্যাখ্যা করা হয়। সমসাময়িক কালে রিচার্ডস, এম্পসন, এলিয়ট, উইনটার্স, অ্যালান টেট, ব্ল্যাকমুর, কেনেথ বার্ক প্রভৃতি নব্যপন্থী সমালোচকগণ কবিতার প্রতিটি পংক্তি ভাঙিয়া চুরিয়া, ছিঁড়িয়া ছেঁচিয়া, কাটিয়া কুটিয়া, মাপিয়া জুখিয়া সারস্বত সৃষ্টিকে কেমিষ্ট বা ড্রাগষ্টোরের শিশিবোতলে-ভরা পৃথক পৃথক ধাতব ও রাসায়নিক বস্তুতে পরিণত করিতে চাহিলেন। উনবিংশ শতাব্দী হইতে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত কাব্য বিচারের যে পদ্ধতি অনুসৃত হইয়া আসিয়াছে, ইদানীং তাহা ঝাড়েবংশে লোপাট হইবার উপক্রম হইয়াছে। কবিতার উপাদান, মূল্য যাচাই, রস-বিশ্লেষণ, কল্পনা-আবেগ-চিত্রকল্পের বিচিত্রতা বড়ো বেশী ব্যক্তিভাব-রঞ্জিত বলিয়া এ-সমস্ত উনিশ-শতকী রোমান্টিক ভাববিলাস বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে বাতিল হইতে বসিয়াছে।

অধুনা প্রচলিত বিশ্লেষণাত্মক সমালোচনা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য—অত্যন্ত ঘনিষ্টভাবে প্রত্যেক ছত্র বিশ্লেষণ করিতে হইবে, সেই বিশ্লেষণের মধ্যেই কবিচেতনা ও কবিতার তাৎপর্য নিহিত আছে। কবিতার স্তবক বন্ধনকেও এই রীতিতে বিচার-বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে। ব্যঞ্জন ও স্বরধ্বনি, অন্ত্যানুপ্রাস ও ছন্দস্পন্দ, পদ পরিচয়, শব্দ প্রয়োগ রীতি, বাক্য গঠন, বাক্যের মধ্যে শব্দবিন্যাস ও তাহার দ্বারা ভাবের সংহতি, বাহ্যিক অলঙ্করণ, নানা কলাকৌশল, চিত্রকল্পের বিচিত্রতা—এইভাবে আধা-বৈয়াকরণ, আধা-ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করিলে কবিতার বস্তুগত স্বরূপ একালের উপযোগী গাণিতিক বা জ্যামিতিক যথাযথতায় (mathematical accuracy) সার্থক হইয়া উঠিবে। অবশ্য এই বিশ্লেষণকে আরো ঘোরালো করিতে হইলে আরো বিশুদ্ধ, কল্পনাব্যতিরিক্ত, ইমেজিস্ট-গ্রুপ-প্রচারিত নিছক ব্যক্তিভাববিরহিত ভাবমণ্ডল সৃষ্টি করিতে হইলে ইহার সহিত সাংখ্যিক হিসাব (statistical measurement), বৈদ্যুতিক মাপজোখ (electrical device) এবং পরিমাণগত বিশ্লেষণ (quantitative analysis)—এই সমস্ত বিচিত্র কর্মকাণ্ড যোগ করিতে হইবে। তাহা হইলে বিজ্ঞানপন্থী সমালোচকগণ এই ভাবিয়া খুশি হইবেন যে, কাব্যবিচার সাম্প্রতিক, বৈপ্লবিক ও বৈজ্ঞানিক হইয়াছে। অবশ্য এই জাতীয় কাব্যকলাতত্ত্বের আলোচনা এখনো পর্যন্ত বুদ্ধির কসরত বলিয়া বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছে, এই পদ্ধতি সর্বজনগ্রাহ্য হইতে বিলম্ব আছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, এই পদ্ধতি জনপ্রিয় হইতে গেলে আমাদের কাব্যপাঠপ্রবণতা ও রসভোগজনিত নান্দনিক আনন্দের আমূল

পরিবর্তন আবশ্যক। প্রায় দুই হাজার বৎসর ধরিয়া সাহিত্যসৃষ্টি ও সাহিত্যভোগ যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া চলিয়া আসিতেছে তাহা সম্পূর্ণরূপে বাতিল না হইলে এই রীতি সর্বজনস্বীকার্য হইতে বিলম্ব ঘটিবে। পাণিনি, ব্যোপদেব, কাত্যায়ন, বররুচি চমস্কির দল যদি সরস্বতীর বীণাযন্ত্র কাড়িয়া লইয়া তাহাতে ব্যাকরণ, ধ্বনিতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বের প্রাণঘাতী টঙ্কার দিতে থাকেন তাহা হইলে কাব্যরসপিপাসুর হৃৎকম্প উপস্থিত হইবে। এখনো পর্যন্ত এ-সব পদ্ধতি উদ্ভট খোশখেয়ালের স্তরেই রহিয়া গিয়াছে, অন্তত আমাদের দেশে। সে যাহা হোক, এই নূতন পদ্ধতির 'ক্যালিডো-স্কোপ' চোখে চড়াইয়া 'বলাকা' কাব্যের ৩৬ সংখ্যক কবিতাটির ("সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা") স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাক, এই পদ্ধতি কাব্যপাঠ-বোধ-ভোগের দিক হইতে কতটা প্রয়োজন।

৪

আমাদের মতো যাহারা ভাষাতত্ত্ব ও শব্দশাস্ত্রে বুদ্ধিবৈগুণ্য বশতঃ দুর্মেধা তাহারা এই পদ্ধতির কতটা মূল্য বুঝিবে তাহাতে সন্দেহ আছে। উপরন্তু কাব্য-বিশ্লেষণে ভোক্তার 'আমি'-কে কতটা দূরে সরাইয়া রাখা যায় তাহার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা এখনো বাকি আছে। যে ধরনের নিরাসক্তি ও নিঃস্পৃহতা বৈজ্ঞানিক বোধের জন্য আশু প্রয়োজন, যাঁহারা এতাবৎকাল ধরিয়া কাব্যরসে বুঁদ হইয়া আছেন, তাঁহারা তাহার প্রয়োজন বোধ করেন না। তাঁহারা বলিবেন, সাহিত্য বিচার, বিশ্লেষণ ও উপভোগ—সবই আমার মনোমুকুরে-প্রতিফলিত ব্যক্তিগত ব্যাপার। বিজ্ঞানী, ভাষাতাত্ত্বিক, মনোবিজ্ঞানী ও সমাজদার্শনিক কাব্যসাহিত্যকে তাঁহাদের স্ব স্ব কোটর হইতে আরেকভাবে দেখিতে পারেন বটে, কিন্তু রসিক পাঠকের তাহাতে কী লাভ? বস্তুগত সমালোচনায় বিশ্বাসীরা বলিবেন, রস, আনন্দ, সৌন্দর্য—এ-সব উনিশ শতকী রোমান্টিক সংস্কার। বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠার পর যেমন ভূত, ভগবান ও প্রেম কবরস্থ হইয়াছে, তেমনি বিজ্ঞানালোকিত আধুনিক যুগে কাব্যবিচারপদ্ধতি আবেগ-কলুষিত বাহ্বাস্ফোট ও নাভিশ্বাস গণনা করিতেছে। যাহা হউক, এই পদ্ধতির সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাটি আলোচনা করিয়া দেখা যাক।

১৯১৬ সালে 'বলাকা' প্রকাশিত হয়। ঐ বৎসর কার্তিক মাসে রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন কাশ্মীরের শ্রীনগরে বাস করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে ওখানেই দুটি কবিতা রচিত হয়। কবিতা দুইটি 'বলাকার' বর্তমান সংস্করণে ৩৫ ও ৩৬ সংখ্যা রূপে মুদ্রিত হয়। ৩৫ সংখ্যক কবিতায় ("আজ প্রভাতের আকাশটি এই শিশির ছল ছল") কবির ব্যক্তিগত উপলব্ধির কথা ১৬টি ছোটবড়ো পংক্তির সাহায্যে বলা হইয়াছে। ৩৬ সংখ্যক কবিতাটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ, বলিতে গেলে ইহার নামেই কাব্যেরও নামকরণ। ভাব ও তত্ত্বের দিক হইতে এটি সমগ্র কাব্যেরই সারসংক্ষেপ। এই সময়ে

রবীন্দ্রনাথ যে দার্শনিক প্রত্যয়ের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন তাহার সাক্ষাৎ প্রমাণ মিলিবে এই কবিতায়।

এই কবিতায় মোট পঁয়ষট্টিটি চরণ আছে। প্রতি দুই চরণ মিত্রাক্ষর, দুই স্থানে তিন পংক্তির মিলও লক্ষ্য করা যায় :

এ সন্ধ্যার স্বপ্ন টুটে বেদনার ঢেউ উঠে জাগি
সুদূরের লাগি,
হে পাখা বিবাগী।

কবিতাটি তানপ্রধান পয়ার জাতীয় ছন্দে বিন্যস্ত। ছোটবড়ো পংক্তিগুলিতে পর্ব সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত। মাত্রা গণনা করিলে দেখা যাইবে, পংক্তিতে ১৮, ১৪, ১০, ৮, ৬ ও ৪ মাত্রা ব্যবহৃত হইয়াছে। পয়ারে ৮+৬ এবং ৮+১০ অর্থাৎ ১৪ ও ১৮ মাত্রা ব্যবহৃত হইয়াছে। অনেক ছত্রে শুধু ১০, ৮, ৬ ও ৪ মাত্রা ব্যবহৃত হইয়াছে। বলা বাহুল্য এগুলি ৮+৬ এবং ৮+১০-এর গুণিতক। পংক্তিগুলির মাপ ছোটবড়ো হইলেও মাত্রা সন্নিবেশে পয়ারের রীতি পুরাপুরি অনুসৃত হইয়াছে। যেখানে ছত্রটি ৮+৬ বা ৮+১০ নয়, সেখানে ইহার খণ্ড ইউনিট অর্থাৎ ৪, ৬, ৮ ও ১০—এই মাপেও ছত্র বিন্যস্ত হইয়াছে। ছত্রের মাপ ছোটবড়ো হইবার জন্য নিশ্বাস প্রশ্বাসও সেই অনুপাতে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং একটানা একঘেয়ে ধ্বনির বদলে ছোটবড়ো মাপের পর্বের আঘাতে ছত্রটি ধ্বনিবৈচিত্র্যে তরঙ্গিত হইয়া উঠে। বলাকায় ছন্দের মুক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

অন্ত্যমিল আলোচনা করিলে দেখা যাইবে গোটা কবিতায় মাত্র আটটি ব্যঞ্জনান্ত মিল আছে (তলোয়ার, জোয়ার ; মগন, বন ; আবেগ, মেঘ ; চঞ্চল, তৃণদল) স্বরান্ত মিলের সংখ্যা সাতান্ন। আকারান্ত—১৪, একারান্ত—২৮, ই/ঈ—১৫। এই গাণিতিক হিসাব হইতে কবিতার তাৎপর্য সম্বন্ধে কী ধারণা করা যায়? ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর বা closed syllable ('বদ্ধাক্ষর'—বাংলা একাডেমি প্রকাশিত 'ভাষা ও সাহিত্য পরিভাষা কোষ', ঢাকা), অর্থাৎ যেখানে ধ্বনি রুদ্ধ হইয়া যাইতেছে ; যেমন, মগন-বন, আবেগ-মেঘ। কবিতাটির তাৎপর্য নিরুদ্দেশ চলা, অবিরাম গতি। তাই কি বদ্ধ-অক্ষর মিলের সংখ্যা স্বল্পতম? স্বরান্ত মিল ৫৭টি, স্বরান্ত মিল অর্থাৎ open syllable বা মুক্তাক্ষর—সেখানে পংক্তি বাধা পায় না। ইহার দ্বারা কি ধ্বনিগত গতিবেগ সূচিত হইতেছে? ই-কারান্ত মিলগুলি সব কটি অসমাপিকা ক্রিয়াদ্যোতক—করি, গুমরি, শিহরি, মেলি, ফেলি ইত্যাদি। অসমাপিকা ক্রিয়াতেও রহিয়াছে অনিকেত যাত্রার ব্যঞ্জনা। অধিকাংশ এ-কারান্ত মিলে অধিকরণের স্থানিক ও কালিক নির্দেশ লক্ষ্য করা যাইবে। যথা—জলে, তলে, ক্ষণে, গগনে, প্রান্তরে, জলেস্থলে, ডানায় (ডানাএ), অজানায় (অজানাএ)। অধিকরণ কারকে সমাপ্তি নির্দেশ বা থামার ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যাইবে। নির্দেশকত্ব অধিকরণ কারকের বৈশিষ্ট্য। যেমন—নিঃশব্দের তলে, শূন্যে জলে স্থলে, ক্ষণে, প্রান্তরে, আকাশে। এই হিসাবে

মনে হইবে কবিতাটিতে সূক্ষ্মভাবে contradiction, অর্থাৎ স্বীকৃতির দিক হইতে কিছু বৈপরীত্য আছে। ই-কারান্ত মিলগুলিতে আছে অসমাপ্তি বা চলার বেগ, অপরদিকে এ-কারান্ত মিলগুলিতে বাধা, বন্ধন, বিরাম, থামার ইঙ্গিত আছে—তা স্থানের বন্ধন বা কালের বন্ধন, যাহাই হোক। বলাকার পক্ষধ্বনি কবির অন্তরে বাধাবন্ধহীন গতিবেগের অনির্দেশ্য অনিকেত যাত্রার সূচনা করিতেছে, ইহাই বোধহয় কবিতাটির তাত্ত্বিক তাৎপর্য। কিন্তু ইহার বাক্‌পুঞ্জের আলোচনা, বিশেষতঃ মিত্রাক্ষর-রীতি আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, যুগপৎ গতি ও স্থিতি, বন্ধন ও মুক্তি, চলা ও থামা ইকার-একার মিলের দ্বারা তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। উদাহরণ স্বরূপ সর্বশেষ স্তবকটি উল্লেখ করি। এই স্তবকে ১০টি পংক্তি, প্রত্যেক পংক্তিতেই একারান্ত মিল। যথা—দলে দলে, উড়ে চলে ; যুগান্তরে, অন্তরে ; সাথে, দিনেরাত্রে ; অন্ধকারে, পারে ; গানে, কোন্‌খানে। এই স্তবকে দেখা যাইতেছে, কবি অবিরাম যাত্রার শেষে 'অন্য কোনখানে, অন্য কোথা'র সন্ধান পাইয়াছেন। 'হেথা নয়'—সেকথা ঠিক, কিন্তু নেতিবাচক শূন্যত্বে তিনি থামিতে পারিলেন না, 'কোন্ খানে'র অস্তিত্ব তাঁহাকে ধাবমান কালস্রোতের মধ্যে শক্ত মাটির স্পর্শ দিল। হেরক্লিটাস হইতে বার্গসঁ—যাঁহারা অকারণ অবারণ চলাকে বিবর্তনমূলক স্মৃতি-সত্তা-ভবিতব্যের মূলীভূত প্রেরণা বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন, তাঁহারা তাত্ত্বিক, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক—সুতরাং নিঃস্পৃহ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কবি বলিয়া তাঁহার চেতনার সঙ্গে যখন এই গতিরাগের সংঘাত ঘটিল, তখন তিনি উদ্দাম সৃষ্টিপ্রবাহে শুধু ভাসিয়া চলিলেন না, তাঁহাকে পথের প্রান্তে থামিতেও হইল। "যেন আমার গানের শেষে থামতে পারি সমে এসে"—ইহাই তাঁহার একান্ত ব্যক্তিগত উপলব্ধি। কৌতূহলী পাঠক এই কবিতার অন্ত্যমিলগুলি লক্ষ্য করিলে কবিসমাজের মূল স্বরূপ বুঝিতে পারিবেন। এইভাবে কবিতাটির প্রতিটি ধ্বনিগুচ্ছ ও প্রতিবিম্বের বিশ্লেষণ বিভাজন চলিতে পারে।

এই কবিতার রূপকল্প বা imageryগুলি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। খাপে ঢাকা বাঁকা তলোয়ার, দিনের ভাঁটা, রাত্রির জোয়ার, শব্দের বিদ্যুৎছটা, শূন্যের প্রান্তর, আনন্দের অট্টহাস, বিস্ময়ের জাগরণ, শব্দময়ী অপ্‌সর রমণী, স্তব্ধতার তপোভঙ্গ, বেগের আবেগ, বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ, মাটির বন্ধন, আকাশের কিনারা, বেদনার ঢেউ, স্তব্ধতার ঢাকা, মাটির আকাশ, মাটির আঁধার, বীজের বলাকা, উন্মুক্ত ডানা, নক্ষত্রের পাখার স্পন্দন, আলোর ক্রন্দন, বাসাছাড়া পাখি প্রভৃতি উপমা রূপক উৎপ্রেক্ষায় কিছু কিছু বিশিষ্টতা লক্ষ্য করা যাইবে। পৌরাণিকতা রবীন্দ্রনাথের সমগ্র চেতনাকেই প্রভাবিত করিয়াছে, আধুনিক কবিরাও দেশ-বিদেশের ইতিহাস-পুরাণের দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ যে-সমস্ত চিত্রকল্প ও প্রতীক ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে ভারতীয় পুরাণ, মহাকাব্য ও অন্যান্য কাব্য ও শিল্পকলার রূপ ও ধ্বনিগত বিশেষ প্রভাব আছে। "ঐ পক্ষধ্বনি, শব্দময়ী অপ্‌সর-রমণী গেল চলি স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করি", "পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ" এবং "এই গিরিরাজি এই বন, চলিয়াছে

উন্মুক্ত ডানায়"—এই চিত্ররূপ ক'টি স্মরণ করা যাইতে পারে। অপ্সর-রমণীদের দ্বারা মুনিগণের ধ্যানভঙ্গের নানা উপাখ্যান ভারতীয় পুরাতন ঐতিহ্যে যত্রতত্র মিলিবে। এখানে সূক্ষ্ম রূপকের মারফতে সেই চিত্ররূপ সৃষ্টি করা হইয়াছে। দ্বিতীয় বর্ণনায় পর্বত গিরিরাজি উন্মুক্ত ডানায় জানা হইতে অজানায় উড়িয়া চলিয়াছে, এ রূপকল্পনাটি রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে বর্ণিত মৈনাক আখ্যানের প্রভাবে পরিকল্পিত মনে করা যায় কি ?

কবিতাটির বাণীমূর্তিগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, অনির্দেশ্য গতি ও উদ্দেশ্যহীন যাত্রার ব্যঞ্জনা হিসাবে রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ ধ্বনি বা শব্দের উপর বেশী গুরুত্ব দিয়াছেন। চিত্র অনেকটা স্থির নিশ্চল, ধ্বনি ধাবমান। সেই গতিময়তা পরিস্ফুট করিবার জন্য তাঁহাকে শব্দের উপর বেশী নির্ভর করিতে হইয়াছে। কবিতার প্রথম স্তবকে "অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি"—এইখানে ধ্বনির প্রথম ব্যঞ্জনা। এই স্তবকের প্রথম সাতটি পংক্তিতে চিত্ররূপ, শেষ তিন পংক্তিতে ("মনে হল সৃষ্টি যেন" হইতে "উঠিছে গুমরি" পর্যন্ত) অব্যক্ত ধ্বনিপুঞ্জ ব্যক্ত হইতে চাহিতেছে। ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোত, কালোজলে তারাফুলের প্রতিফলন, অন্ধকার গিরিতটতল, সারে সারে দেওদার তরু—এ সমস্তই চিত্ররূপ। কিন্তু স্থির চিত্র ধ্বনিপুঞ্জের মধ্য দিয়া গতিময় হইতে চাহিতেছে, কবির তাহাই মনে হইল। সহসা হংসবলাকার পক্ষবিধূনন বিদ্যুৎছটার মতো ছুটিয়া গেল। ইহাও মূলতঃ দৃশ্যময় ও চাক্ষুষ ব্যাপার। কিন্তু এই শব্দানুষঙ্গ পরক্ষণেই ঝঞ্ঝামদরসে-মত্ত পাখা হইতে আনন্দের অট্টহাসে পরিণত হইল, স্থাবর গিরিশ্রেণী ও মৃত্তিকাবন্দী দেওদার বনের শিহরণ কল্পনাও যুগপৎ চিত্র ও ধ্বনির ইঙ্গিত বহন করিতেছে। বলাকার পক্ষধ্বনি কবির অন্তরে কতকগুলি বোধ জাগাইয়া তুলিল। "নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে বেগের আবেগ", পর্বতের বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ হইবার বাসনা, তরুশ্রেণীর মাটির বন্ধন ফেলিয়া শব্দরেখা ধরিয়া আকাশের সীমা খুঁজিতে উধাও হইবার আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি চিত্র ও ধ্বনিপ্রকরণের মারফতে রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করিলেন, বিশ্ববস্তু ও তাহার অস্তিত্ব জড়ের শিকলে বন্দী হইয়া নাই, সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চ স্থাবরত্বের বন্ধন ছিঁড়িয়া অন্য কোথাও ছুটিয়া চলিয়াছে। উদ্দাম চঞ্চল পাখার শব্দে ক্ষুদ্র তৃণদল হইতে আরম্ভ করিয়া গিরিবাজি ও দেওদার বন 'দ্বীপ হতে দ্বীপান্তরে' উড়িয়া চলিয়াছে। লক্ষণীয় 'দ্বীপ হতে দ্বীপান্তরে' বলিতে বোধহয় তিনি বস্তুবিশ্বকে কালপ্রবাহের মধ্য এক-একটি দ্বীপ বলিয়া মনে করিয়াছেন। নক্ষত্রের পাখার স্পন্দন এবং আলোর ক্রন্দনও ধ্বনিময়তার ব্যঞ্জনা বহন করিতেছে।

সর্বশেষ স্তবকে কবি বহির্বিশ্বের ধাবমান অস্তিত্ব প্রবাহ নিজ অন্তরে উপলব্ধি করিলেন। বস্তুবিশ্বের পাখিরা তো শব্দময় অনন্তের দিকে উড়িয়া চলিয়াছে, চলার সেই বেগ কবিও উপলব্ধি করিলেন। তাঁহার বাসাছাড়া পাখি এক পার হইতে অন্য পারে যাত্রা করিল। অবশ্য শুধু কি 'অকারণ অবারণ চলাই' তাঁহার উপলব্ধির মূল উদ্দেশ্য ? "অন্য কোথা অন্য কোন্ খানে"—এই অর্ধছত্রেই বুঝা যাইতেছে, তিনি

পরিণামহীন ও কার্যকারণসম্বন্ধব্যতিরিক্ত ধাবমানতাকে তাঁহার জীবনের শেষ পরিণাম বলিয়া ভাবিতে পারেন নাই। অবশ্য এই কাব্যের আর এক স্থানে বলিয়াছেন :

ফিরবে না রে, ফিরবে না রে, ফিরবে না,
সেই কূলে আর ভিড়বে না।

তবু কবিচেতনা যে একটি স্থিরবিন্দুসন্ধানী তাহাতে কোন দ্বিমত নাই। এই প্রসঙ্গে ১৯ সংখ্যক কবিতাটি ("আমি যে বেসেছি ভালো এই জগতেরে") স্মরণ করা যাইতে পারে। পাওয়া ও ত্যাগ করা—"এ দুয়ের মাঝে তবু কোনখানে আছে কোন মিল"—এই সিদ্ধান্ত তাঁহাকে অস্তি-নাস্তির মাঝখানে আশ্বস্ত করিয়াছে। অবশ্য ইহা তো ভাব ও তত্ত্বের কথা, আমাদের বর্তমান আলোচনার বহির্ভূত। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, প্রতিমার লাবণ্য নহে, তদন্তরালবর্তী কাঠ-বাঁশ-খড় লইয়াই আমরা আলোচনা করিতে চাহি। কিন্তু কাঠখড় রশারশির কড়াক্রান্তি হিসাব লইলেই কি প্রতিমার লাবণ্য উপলব্ধি করা যাইবে? শুধু মাপজোখের দ্বারা কবিতার প্রকৃত স্বরূপ ধরা যায় না—"আইনের লৌহ ছাঁচে কবিতা কভু না বাঁচে, প্রাণ তাহা পায় শুধু প্রাণে"। তবে ব্যাকরণ ও ধ্বনিতত্ত্বের নিরিখে হয়তো কবিচেতনার অন্তরগুহাশায়ী প্যাটার্ণের রহস্য বুঝা যাইতেও পারে।

এবার স্তবকগুলি একটু নাড়িয়া চাড়িয়া দেখা যাক। কবিতাটির পাঁচটি স্তবক। প্রতি স্তবকে পংক্তিবিন্যাস এইরূপ :

প্রথম স্তবকে ১০টি পংক্তি, সর্বাপেক্ষা বড়ো মাপের পর্বে ১৮ মাত্রা। এইরূপ পর্বের সংখ্যা—৪ ; সর্বাপেক্ষা ছোট মাপের পর্বে মাত্রা—৬। ১০ মাত্রার পর্ব ৩টি।

দ্বিতীয় স্তবকে ১৪ পংক্তি। এখানেও পর্বগুলির মাত্রা ১৮, ১৪, ১০। একটি পর্বে একটি যুগ্ম স্বর দুই মাত্রা ধরা হইয়াছে—"ঐ পক্ষধ্বনি"—এখানে 'ঐ'-কে দুই মাত্রা (ওই) না ধরিলে ছন্দে ঘা লাগে। যুগ্ম ও দীর্ঘ স্বরকে রবীন্দ্রনাথ ছন্দের খাতিরে কোথাও কোথাও দু'মাত্রা ধরিয়াছেন। যেমন—"বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে" (বৈশাখ) এবং "রূঢ় দীপের আলোক লাগিল ক্ষমাসুন্দর চক্ষে (রূঢ়)।

তৃতীয় স্তবকে ১৫ ছত্র। এখানেও পর্বসংখ্যা ও মাত্রা পূর্বের মতো। একটি ৪ মাত্রার পর্বও আছে—"দিল আজি।" পরের দুই স্তবকে ৪ মাত্রার আরো দুটি ছোট পর্ব আছে—"তৃণদল," "দিনেরাতে"।

চতুর্থ স্তবকে ১৬ ছত্র এবং পঞ্চম স্তবকে ১০ ছত্র। ভাবের উপস্থাপনা বিচার করিলে প্রথম স্তবকে সূচনা, দ্বিতীয় স্তবকে শব্দতরঙ্গের আঘাতে জড়বস্তুর মধ্যে প্রাণ-চাঞ্চল্য, তৃতীয় স্তবকে বলাকার পক্ষধ্বনি হইতে কবির অন্তরে কতকগুলি রূপময় গতিবেগের জন্ম—সমস্ত বস্তুচেতনা প্রবহমান ধ্বনিকে অবলম্বন করিয়া, জড়ত্বের পাষাণভার ত্যাগ করিয়া এবং নিকটকে পিছনে ফেলিয়া সুদূরের পানে উধাও হইল। কিন্তু সে দূরও অনন্তের অভিসার নহে। তৃতীয় স্তবকেই দেখা যাইতেছে, ধাবমান

যাত্রা 'অন্য কোনখানে' নিবৃত্তি লাভ করিবে এমন একটা ইঙ্গিত আছে। "শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও, উদ্দাম উধাও, ফিরে নাহি চাও"—এই নিরন্তর গতিই নহে, "হেথা নয় হেথা নয়"—এই ছুটি নেতিবাচক নিষেধের দ্বারা স্থানের দিক হইতে অসীমতার ব্যঞ্জনা, কিন্তু পরক্ষণেই 'অন্য কোন খানের' স্থানিক ব্যঞ্জনার প্রশ্নবোধক নির্দেশ। তৃতীয় স্তবকে কবি কূল ছাড়িলেও তিনি যে তীরাভিসারী এইরূপ আভাস পাওয়া যাইতেছে। চতুর্থ স্তবকে কবির দার্শনিক সিদ্ধান্ত। জলেস্থলে সর্বত্র তিনি গতিপ্রবাহ উপলব্ধি করিলেন, যে গতিপ্রবাহ ধ্বনিপ্রবাহেরই প্রতিক্রিয়া মাত্র। দ্বিতীয় স্তবকে কবির মনে হইয়াছিল নিশ্চলের অন্তরে বেগের আবেগ জন্মলাভ করিতেছে। কিন্তু চতুর্থ স্তবকে কবির আর কোনো সংশয় রহিল না। স্থূল সূক্ষ্ম, মাটির আকাশ ও মাটির আঁধার নীচে লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা অর্থাৎ অশেষ গতিবেগে জন্মলাভ করিতেছে। গিরি অরণ্য সবই যেন ডানা মেলিয়া অজানা হইতে অজানায়, শূন্য হইতে শূন্যে উড়িয়া চলিয়াছে।

পঞ্চম স্তবকের প্রথম কয় ছত্রে দেখা যাইতেছে, মানুষের চিন্তা-ভাবনা সবার অলক্ষ্যে অস্পষ্ট অতীত হইতে অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে ছুটিয়া চলিয়াছে। অস্পষ্ট অতীত অর্থাৎ স্মৃতিলোক, সুদূর যুগান্তর অর্থাৎ ভবিষ্যৎ। এখানে অতীত অস্পষ্ট হইলেও অস্তিত্বহীন নহে, এই অতীতবোধ হইতেছে অতিক্রান্ত কালচেতনা। কিন্তু 'যুগান্তর' শব্দে কালচেতনার সঙ্গে দেশচেতনাও ইঙ্গিতে রহিয়া গিয়াছে। অর্থাৎ বোধ হয় কবির বক্তব্য, মানবচেতনা ও ভাবনা জড়বস্তুর মতো স্থাণুত্বের শিকলে বন্দী হইয়া নাই, তাহা দেশ ও কালকে অতিক্রম করিয়া তীব্র গতির মধ্য দিয়া ধাবিত হইয়াছে। কবি সেই স্থানকালবন্ধনহীন গতিবেগ নিজ চেতনায় উপলব্ধি করিলেন। বাহিরের অভিজ্ঞতা কবির চেতনলোকে প্রবেশ করিয়া তাঁহার ব্যক্তিগত বোধকেও পরিবর্তিত করিল। আকাশে উড্ডীয়মান বলাকার সঙ্গে তাঁহার অন্তর-বিহঙ্গও আলো-অন্ধকার, অর্থাৎ অস্তি-নাস্তির মধ্য দিয়া এক বোধের জগৎ হইতে অন্য বোধের জগতে চলিয়াছে। 'বলাকা'র অনেকগুলি কবিতায় যাত্রা, উড়িয়া যাওয়া, খেয়া পারাপার, নদীস্রোত প্রভৃতি চিত্রকল্পের মধ্য দিয়া অবিরাম গতির ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু নির্বিকল্প গতিতেই গতির নির্বাণ, এমন একটা অপরিণামী নেতিত্ব বোধ হয় তাঁহার অস্তিবাদী ভারতীয় মন মানিতে চাহে নাই। একটি কবিতায় তিনি বলিয়াছেন :

> অজানা সমুদ্রতীর, অজানা সে-দেশ—
> সেথাকার লাগি
> উঠিয়াছে জাগি
> ঝটিকার কণ্ঠে কণ্ঠে শূন্যে শূন্যে প্রচণ্ড আহ্বান।

এ সমুদ্রতীর ও দেশ অজানা হইলেও অস্তিত্বহীন নহে।

আলোচনা চলিতে পারে। চলিতে পারে তাহার ভাবানুষঙ্গ, ধ্বনি ও চিত্ররূপ, শব্দপ্রয়োগের বিশ্লেষণ। তবে একথা মনে রাখা প্রয়োজন, হিসাব করিয়া, গণিয়া গাঁথিয়া, ছক আঁকিয়া cross word puzzle-এর সমস্যা সমাধান করা যায়, কিন্তু কবিতা হয় না। কবিচেতনায় বিশেষ রসাবেশের অব্যক্ত আবেগ সঞ্চারিত হইলে প্রকাশের সময় সে আবেগ আপনা আপনি ভাষা, ছন্দ, বাণীরূপ নির্মাণ করিয়া লয়। সেই স্বয়ং-ক্রিয় সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার পিছনেও যে একটি সক্রিয় পরিমাণসামঞ্জস্য থাকে, এবং যে সামঞ্জস্যীভূত প্রকরণকে রাসায়নিক বিশ্লেষণের মতো পৃথগ্‌ভাবে দেখানো যাইতে পারে, একালের নূতন সাহিত্যবিশ্লেষণ পদ্ধতি সেইটি দেখাইবার চেষ্টা করিতেছে। আমাদের বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় সেই রীতি সবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। বহু অনুশীলন, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের পর এই রীতির যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠিত হইবে। একালের কোন কোন অত্যুৎসাহী সাহিত্যপাঠক বলিতেছেন যে, অদূর ভবিষ্যতে এই বস্তুগত, নিঃস্পৃহ বৈজ্ঞানিক ও বৈয়াকরণ রীতিই সাহিত্য-বিচারের একমাত্র পন্থা বলিয়া নির্দিষ্ট হইবে। অবশ্য এ-সম্পর্কে হলফনামা পাঠ করিয়া কোন মন্তব্য করিতে সম্মত নহি। কারণ আমাদের এমন কোন অলৌকিক সামুদ্রিক বিদ্যা আয়ত্ত হয় নাই যাহাতে নির্ভুলভাবে সাহিত্যের ভবিষ্যৎ করকোষ্ঠী গণনা করিতে পারা যায়। কেহ কেহ বলিবেন, কিন্তু খর্জ্জুর খাইয়া জিহ্বা অসাড় হইয়া গেলে তিন্তিড়ীর অম্লস্বাদ মন্দ লাগিবে না। উর্বশীর অধরস্পৃষ্ট অমৃতপাত্রে অনীহা দেখা দিলে সারস্বত অগ্নিমান্দ্য আরোগ্যের জন্য কোন্ জড়িবুটির প্রয়োজন হইবে তাহাও নির্দেশ করা দুরূহ। কঙ্কালতত্ত্বের বিশ্লেষণ অতি প্রয়োজন, কিন্তু সে বিদ্যা কি লাবণ্যসৃষ্টিতে কাজে লাগে? আঙ্কিক ও ধ্বনিতাত্ত্বিক হিসাবনিকাশে কবিতাকে আর একটা দিক হইতে দেখা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতে কাহার লাভ?

—অ. কু. ব.

বিভাগীয় সংবাদ

বাংলা বিভাগের গবেষণা ও সাহিত্যপত্রের ৭ম বার্ষিক সংখ্যা প্রকাশিত হইল। প্রথমেই বেদনার সহিত জানাই, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেনের মরদেহের অবসান হইয়াছে। তিনি বাংলা বিভাগের প্রতি অতিশয় অনুকূল ছিলেন, গবেষণাদির খোঁজখবর লইতেন। তাঁহারই প্রবর্তনায় এই পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। বাংলা বিভাগের গবেষণা পরিষদের জন্যও তিনি নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা, সমাজ, অর্থনীতি—সংস্কৃতির নানাবিভাগে তাঁহার নিজস্ব প্রতিভার মৌলিকতা ও অনন্যসাধারণত্ব দীর্ঘকাল স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের খয়রা অধ্যাপক এবং বাংলা বিভাগের আংশিক সময়ের অধ্যাপক ডঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ বসুর আকস্মিক প্রয়াণের সংবাদে তাঁহার গুণমুগ্ধ ছাত্র-ছাত্রী এবং অন্তরঙ্গ সহকর্মিগণ মর্মাহত হইয়াছেন। যদিও তিনি আংশিক সময়ের অধ্যাপকরূপে বাংলা বিভাগের সহিত যুক্ত ছিলেন, কিন্তু বিভাগের অধ্যাপক-অধ্যাপিকাগণ তাঁহাকে পরম আত্মীয় বলিয়াই মনে করিতেন। তাঁহার অপ্রকাশিত ও পত্রিকায় প্রকাশিত ইংরেজি ও বাংলা প্রবন্ধগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইলে পাঠকগণ তাঁহার ভাষাতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বে অধিকার লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইবেন। আমরা প্রয়াত প্রাক্তন উপাচার্য এবং ডক্টর বসুর আত্মার সদ্‌গতি কামনা করিতেছি।

* * *

বাংলা বিভাগের অন্যতম প্রবীণ রীডার ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ আগামী দুই বৎসরের জন্য (১৯৮৩-৮৫) বিভাগীয় প্রধানের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। এইজন্য তাঁহাকে অভিনন্দিত করি। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় প্রধান ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায় বাংলা বিভাগে আংশিক সময়ের অধ্যাপকরূপে যোগদান করিয়াছেন। তিনি আমাদের পুরাতন ছাত্র, সুতরাং তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবার প্রয়োজন নাই।

* * *

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২৫ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে মাননীয় উপাচার্য ডঃ শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রকুমার পোদ্দার মহাশয়ের নেতৃত্বে ও প্রবর্তনায় যে সমস্ত অনুষ্ঠান হইয়াছে, তাহাতে বাংলা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী ও অধ্যাপকগণ যথাযোগ্য অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। এই উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন সাহেব আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। অতিবৃদ্ধ মাননীয় অধ্যাপক মহোদয় বাংলা বিভাগেরই প্রাক্তন ছাত্র ছিলেন, ১৯২৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রথম শ্রেণীতে এম. এ. পাস করিয়া শিক্ষাবিভাগে যোগদান করেন। এই পত্রিকার বর্তমান সম্পাদক একদা তাঁহার নিকট সাহিত্যের প্রথম

পাঠ গ্রহণ করিয়াছিলেন। দ্বারভাঙা হল ও বাংলা বিভাগে তাঁহার প্রদত্ত বক্তৃতা অতিশয় চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল, বিশেষতঃ বাংলা বিভাগ সম্বন্ধে তাঁহার স্মৃতিচারণায় সকলেই তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন। অনেকদিন পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মনসুর উদ্দীন সাহেব সংগৃহীত বাউল গানের সংকলন "হারামণি" প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্প্রতি সংকলনটি নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। মাননীয় উপাচার্য সংকলনটির পুনঃপ্রকাশের জন্য উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন।

এই ১২৫ বৎসর উদ্‌যাপন উপলক্ষে শীঘ্রই বাংলা বিভাগ হইতে 'হাজার বছরের বাংলা সাহিত্য' সম্পর্কে একটি বিস্তারিত আলোচনাচক্রের আয়োজনের চেষ্টা করা হইতেছে। তাহাতে বিভিন্ন শাখার বিশেষজ্ঞগণ যে সমস্ত গবেষণাপ্রবন্ধ পাঠ করিবেন তাহার একটি সুগ্রথিত সংকলনও প্রকাশের চেষ্টা করা হইবে।

* * *

বিভাগের অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও ছাত্র-ছাত্রীগণ বিদায়ী অধ্যাপক ডঃ ক্ষুদিরাম দাস, ডঃ ভবানীগোপাল সান্যাল এবং ডঃ সতী ঘোষের যে বিদায়-সংবর্ধনার আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহাতে ডঃ দাস ও ডঃ সান্যালের অতীত স্মৃতিচারণ অতিশয় মনোজ্ঞ হইয়াছিল। অনিবার্যকারণ বশতঃ ডঃ সতী ঘোষের সভায় উপস্থিত না হইতে পারায় তাঁহার একটি সুদীর্ঘ পত্র সভায় পঠিত হয়। ছাত্র-ছাত্রীগণ পূজ্যপাদ অধ্যাপক মহাশয়দের পুষ্পস্তবক ও পুস্তক শ্রদ্ধার্ঘ্যস্বরূপ অর্পণ করে।

* * *

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও বাণিজ্য বিভাগের সচিব এবং বাংলা বিভাগের আংশিক সময়ের অধ্যাপক ডঃ সুভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১৯৮০ সালে ক্যানাডায় চতুর্দ্দশ বিশ্ব-ধর্ম্ম-ইতিহাস সম্মেলনে আহূত হইয়া সেই অধিবেশনে একটি মূল্যবান গবেষণাপ্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি উক্ত সম্মেলনে যোগদানকারী বিভিন্ন তাত্ত্বিক ও গবেষকদের সমীপে ছায়াচিত্র সহযোগে বাংলার সাহিত্য, সমাজ ও লোকজীবন সম্বন্ধে কয়েকটি মৌলিক তথ্যের অবতারণা করেন, শ্রোতৃগণ তাহা দেখিয়া এই বিষয়ে বিশেষ কৌতূহল প্রকাশ করিয়াছিলেন। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল বক্তৃতার বিষয় ছিল "বাংলার লোকধর্মে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব"। অতঃপর তিনি আমেরিকা ও ইংলণ্ডের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন প্রণালী পরিদর্শন করেন এবং সেই সম্পর্কে অনেক তথ্যও সংগ্রহ করেন। তাঁহার ইংলণ্ড সফরের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন কলিকাতাস্থ ব্রিটিশ কাউন্সিল।

* * *

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অধ্যাপক ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অক্সফোর্ডের হার্টফোর্ড কলেজে অনুষ্ঠিত পঞ্চম বার্ষিক বিশ্ব বৌদ্ধ সম্মেলনে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে উত্তর-বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্মমতের প্রভাব সম্পর্কে প্রবন্ধ পাঠের জন্য আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন (১৯৮২)। তাঁহার গবেষণাপ্রবন্ধ ও তাহার বিষয় সম্বন্ধে সমাগত বৌদ্ধ শ্রমণ,

তাত্ত্বিক ও দার্শনিকগণ বিবিধ প্রশ্ন করিয়াছেন, বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ প্রভাবের বিচিত্র ইতিহাস জানিয়া তাঁহারা এই বিষয়ে বিশেষ কৌতূহল ও বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় এক মাস ইংলণ্ড ও য়ুরোপের কোন কোন অঞ্চলে অবস্থান করিয়া সেই সমস্ত অঞ্চলের সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করেন। অতীত ঐতিহ্যমণ্ডিত অক্সফোর্ড শহরের বিভিন্ন কলেজ, লাইব্রেরি, বিশেষতঃ বডেলিয়ন লাইব্রেরি পরিদর্শন করিয়া তিনি কয়েকটি নূতন তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। বডেলিয়ন লাইব্রেরিতে রক্ষিত বঙ্গাক্ষরে লিখিত প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন এক পুঁথির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। পুঁথিটি কোন এক বাঙালী পণ্ডিতের লেখা সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র সম্পর্কীয়। অতঃপর তিনি ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে দুষ্প্রাপ্য বাংলা মুদ্রিত পুস্তকের তালিকা খুঁটাইয়া পরীক্ষা করেন। ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের আনুকূল্যে তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত স্কুল অব ওরিয়েণ্টাল অ্যাণ্ড আফ্রিকান স্টাডিজের গ্রন্থাগার ও প্রাচীন পুস্তকাদি সম্বন্ধেও অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের পাঠচক্রের এক অধিবেশনে তিনি 'অক্সফোর্ডের অভিজ্ঞতা' শীর্ষক বক্তৃতায় এই বিষয়ে আলোচনা করেন। সম্প্রতি তিনি পাঁচ বৎসরের জন্য (১৯৮৩-১৯৮৭) সাহিত্য অ্যাকাডেমির সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন।

* * *

১৯৮১-৮২ সালের জন্য বাংলা পাঠচক্রের পরিচালক-সমিতিতে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্য হইতে নিম্নলিখিত সদস্যগণ নির্বাচিত হইয়াছেন:

প্রথম বর্ষ: শ্রীসমর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী চৈতালি দাশ।

দ্বিতীয় বর্ষ: শ্রীশিবাজী দত্ত, শ্রীমলয় সেন, শ্রীবিভাবসু দত্ত, শ্রীমতী লিপি গোস্বামী, শ্রীমতী মিতা মল্লিক।

ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ ও ডঃ মানস মজুমদারের সুযোগ্য পরিচালনায় বাংলা পাঠচক্রে উল্লেখযোগ্য আলোচনা ও বিতর্ক অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। স্থানাভাবের জন্য এখানে শুধু কয়েকটি আলোচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

শ্রীযুক্ত ভুবন দাস উচ্চারণ অনুযায়ী যে আন্তর্জাতিক বর্ণমালার পরিকল্পনা করিয়াছেন, সে বিষয়ে তিনি বাংলা পাঠচক্রের অধিবেশনে নমুনা ও দৃষ্টান্তসহ আলোচনা করেন। তিনি প্রমাণের চেষ্টা করেন যে, এই বর্ণমালা গৃহীত হইলে ইহার সাহায্যে পৃথিবীর যে-কোন বর্ণের ভাষা লেখা যাইবে। ইহা সম্ভব হইলে বিভিন্ন ভাষাভাষী দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ নিকটতর হইবে বলিয়া শ্রীযুক্ত দাস বিশ্বাস করেন।

বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ এবং লোকসাহিত্যের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার জাপান সফর সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ ও সরস আলোচনা করেন। তাঁহার বিচিত্র অভিজ্ঞতার বর্ণনায় সকলেই অতিশয়

প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। পাঠচক্রের আর এক অধিবেশনে 'মস্কো ইনস্টিটিউট অব ইণ্টারন্যাশনাল রিলেশান্স'-এর বাংলা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত শ্রীমতী চেবকিনা (Chevkina) রুশদেশে বাংলা চর্চা সম্বন্ধে একটি তথ্যবহুল ও কৌতূহলোদ্দীপক বাংলা ভাষণ দেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও আকর্ষণের কথা বলেন। হাভানা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. লুইস এস্ত্রাদা (Estrada) 'লাটিন আমেরিকার বর্তমান সাহিত্য' সম্বন্ধে তাঁহার মাতৃভাষা স্প্যানিশে একটি অতিশয় জ্ঞাতব্য বিষয়ের বিবরণ দেন। দিল্লী জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের স্প্যানিশ ভাষার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অপরাজিত চট্টোপাধ্যায় তৎক্ষণাৎ তাহার বাংলা অনুবাদ করিয়া দেন। সান্ধ্য ভাষা-সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা কোর্সের ভারপ্রাপ্ত শ্রীযুক্ত অমর বসু মহাশয়ের চেষ্টাতেই এই যোগাযোগ করা সম্ভব হইয়াছিল।

কুষ্টিয়ার (বাংলাদেশ) সরকারী কলেজের ইংরেজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক এবং বাউল-বিশেষজ্ঞ ডঃ আনোয়ারুল করীম রবীন্দ্র কাব্য ও সঙ্গীতে বাউল প্রভাব সম্বন্ধে একটি চিত্তাকর্ষক ভাষণ দিয়াছিলেন। ছাত্র-ছাত্রীগণ তাঁহার আলোচনায় বিশেষভাবে উপকৃত হইয়াছে। উড়িষ্যায় অধ্যাপক ডঃ গঙ্গাধর বল উড়িষ্যার জীবন ও সংস্কৃতি বিষয়ে নানা তথ্যের অবতারণা করেন। ওড়িয়া ভাষাতে বক্তৃতা করিলেও শ্রোতৃগণের তাহা অনুসরণ করিতে কোন অসুবিধা হয় নাই। বাংলা ও ওড়িয়া ভাষা যে কত নিকটবর্তী তাহা ডঃ বলের ভাষণ হইতেই বুঝা গিয়াছে। রাজস্থানী ভাষার অধ্যাপক ও গবেষক এবং সাহিত্য অ্যাকাডেমির সদস্য ডঃ হীরালাল মাহেশ্বরী বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন হইতে পরিদর্শক অধ্যাপক হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান সংগ্রহের জন্য বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অধিকার আছে। ইংরেজিতে রচিত তাঁহার রাজস্থানী সাহিত্যের ইতিহাস (সাহিত্য অ্যাকাডেমি প্রকাশিত) বিশেষজ্ঞমহলে সুপরিচিত। তিনি আমাদের বাংলা বিভাগের গ্রন্থাগার ও পুঁথিশালা দেখিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন।

এই বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা আয়োজিত সত্যেন্দ্র শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে যে সাহিত্যসভার অনুষ্ঠান হয়, তাহাতে ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র সভাপতিত্ব করেন এবং ডঃ অলোক রায় ভাষণ দান করেন। তাঁহাদের আলোচনাগুলি নানা তথ্যে পরিপূর্ণ হওয়াতে ছাত্র-ছাত্রীরা তাহা হইতে লাভবান হইয়াছে। এই সভায় ছাত্র-ছাত্রী পরিবেশিত সত্যেন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতা সঙ্গীতের আকারে পরিবেশিত হয়। ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক 'রবীন্দ্রসঙ্গীতে পথ চেতনা' শীর্ষক একটি বিচিত্র বিষয়ের অবতারণা করেন। বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীগণ বিষয়োপযোগী কয়েকটি গান গাহিয়া শ্রোতাদের আনন্দিত করেন।

বিদ্যাসাগর ও শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎকারের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে ঐ বিষয়ে বিভাগের পাঠচক্রের উদ্যোগে যে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাতে ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ ও শ্রীযুক্ত শঙ্করীপ্রসাদ বসু বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে সাক্ষাতের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন এবং প্রসঙ্গক্রমে দুই মহাপুরুষের জীবনদর্শন সম্বন্ধেও গভীর তত্ত্ববহ আলোচনা করেন। ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জ্যোতি ভট্টাচার্য মহাশয় সাহিত্যের ঔপাঙ্গ-বিশ্লেষণ (Structural Analysis) সম্বন্ধে একটি অভিনব সমালোচনাশাখার কথা আলোচনা করেন। বিষয়টি সমালোচনা সাহিত্যে নূতন বলিয়া সকলেই এই বিষয়ে বিশেষ কৌতূহল প্রকাশ করিয়াছেন।

ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেরা উদ্যোগী হইয়া পাঠচক্রের মারফতে কয়েকটি অনুষ্ঠান করিয়াছেন। তাহার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছাত্র-ছাত্রীদের স্বরচিত কবিতা-পাঠের আসর এবং তাৎক্ষণিক বক্তৃতা (Extempore lecture)। তাঁহাদের কৃতিত্ব ও উৎসাহে অন্যান্য ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকগণ বিশেষ পরিতুষ্ট হইয়াছেন। তাঁহাদেরই উদ্যোগে 'বঙ্কিমচন্দ্রই বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক' শীর্ষক একটি বিতর্ক সভার আয়োজন করা হইয়াছিল। প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে আলোচনা, বিশেষতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' সম্পর্কে বিতর্ক ও মতামতের দ্বন্দ্ব অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। সভাপতি ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনিয়া সামঞ্জস্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। প্রস্তাবটি কিছু ভোটাধিক্যে পরিত্যক্ত হয়। নবাগত ও বিদায়ী ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি বর্তমান ছাত্রগণ যে সংবর্ধনা ও বিদায়-অভিনন্দন জানাইয়াছিল তাহা সকলের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল। উভয় অনুষ্ঠানেই ছাত্র-ছাত্রীগণ সঙ্গীত ও আবৃত্তি পরিবেশন করেন। পাঠচক্রের অধিবেশনগুলি শুধু জ্ঞান সংগ্রহের জন্যই নহে, খোলা জানালা হইতে যাহাতে বদ্ধ ক্লাসের মধ্যে বাহিরের আলো-বাতাস প্রবেশ করিতে পারে, এই জন্যই পাঠচক্রগুলির অনুষ্ঠান পরিকল্পিত হইয়াছে। শুধু পরীক্ষা উত্তরণের জন্যই নহে, বৃহত্তর সাহিত্য ও সংস্কৃতির উদার প্রাঙ্গণে ছাত্র-ছাত্রীদিগকে স্বাধীন ভাবে বিচরণে সাহায্য করিবার জন্যই ইহার আয়োজন হইয়া থাকে। এই বৎসর হইতে ডঃ সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায় পাঠচক্রের অনুষ্ঠান প্রভৃতি পরিচালনা করিতেছেন। আশা করা যায় তাঁহার নেতৃত্বে পাঠচক্রের গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

* * *

বাংলা বিভাগে বহু ছাত্র-ছাত্রী পি-এইচ. ডি.র জন্য গবেষণা করিতেছেন। ভারত সরকারের বৃত্তিধারী কয়েকজন বাংলাদেশের গবেষকও (ইঁহাদের অধিকাংশই বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের অধ্যাপক) এই বিভাগের সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া পি-এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করিয়া নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরিয়া গিয়াছেন। ভাষাতত্ত্ব, মধ্যযুগ ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য, সাহিত্যের সহিত সম্পৃক্ত সমাজ, ইতিহাস ও ধর্মসম্প্রদায়, লোকগান ও লোকসাহিত্য—নানা বিষয়ে এই বিভাগে গবেষণা হইতেছে। ইতিমধ্যে

অনেকগুলি পি-এইচ. ডি. প্রাপ্ত গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে একটি বিষয়ের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে। গত বিশ বৎসরের মধ্যে যত গবেষণা হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের বিষয়ে, মধ্যযুগ ও ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে গবেষণার সংখ্যা নগণ্য। কিন্তু ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা ও মধ্যযুগীয় পুঁথি-সাহিত্যের গবেষণা আশানুরূপে না হইলে বাংলা সাহিত্যের গবেষণা একচক্ষু হরিণের মতো শুধু একদিকেই ধাবিত হইবে। কালে হয়তো কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে মধ্যযুগের সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে অধ্যাপনার জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের অসদ্ভাব ঘটিবে। শুধু আধুনিক সাহিত্যেই নহে, মধ্যযুগের সাহিত্য, সমাজ ও ভাষা সম্পর্কে পুংখানুপুংখ গবেষণা ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন। বাংলা বিভাগে যে আট হাজারের মতো দুষ্প্রাপ্য সুপ্রাচীন পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে, সেগুলির পাঠ ও সম্পাদনা না হইলে বাঙালীর একটা মূল্যবান জাতীয় জীবনের দলিল অনাবিষ্কৃত রহিয়া যাইবে। এই সম্পর্কে স্মরণীয়, সম্প্রতি ষষ্ঠ পঞ্চমবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের যে সদস্যগণ বাংলা বিভাগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, পুঁথিশালা সংরক্ষণের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। বিভাগ হইতে পুঁথিসংরক্ষণ সম্পর্কে যে পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার জন্য তাঁহাদের নিকট আর্থিক অনুদান প্রার্থনা করা হইয়াছে।

* * *

পূর্বের সংখ্যায় আমরা কলিকাতা জাতীয় গ্রন্থাগারের সহকারী গ্রন্থাগারিক (অবসর প্রাপ্ত) শ্রীযুক্ত সনৎকুমার দে মহাশয় সংগৃহীত রবীন্দ্র-শতবর্ষ সম্পর্কে পত্র-পত্রিকায় (১৩৬৮) প্রকাশিত প্রবন্ধের তালিকা হইতে যৎকিঞ্চিৎ মুদ্রিত করিয়াছিলাম। যাঁহারা রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পর্কে গবেষণা করেন তাঁহারা ইহা হইতে উপকৃত হইতে পারেন এই ধারণায় আমার এই সংখ্যাতেও আরো কিছু প্রবন্ধের তালিকা উল্লেখ করিতেছি। স্থানাভাব বশতঃ এই সংগ্রহের অতি অল্পই মুদ্রিত করা গেল। শ্রীযুক্ত দে যদি এই সুবৃহৎ তালিকাটি প্রকাশ করিতে পারেন তাহা হইলে রবীন্দ্রসাহিত্য গবেষণায় অনেক সুবিধা হইবে।

তালিকা

কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়—রবীন্দ্রচিত্রের উপক্রমণিকা
(গল্পভারতী, বৈশাখ ১৩৬৮)

সচ্চিদানন্দ গঙ্গোপাধ্যায়—রবীন্দ্র-সংস্কৃতির রূপায়ণ
('কান্দীবান্ধব' শারদীয়া ১৩৬৮)

হেমন্ত গঙ্গোপাধ্যায়—রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব ('আন্তর্জাতিক', শারদীয়া ১৩৬৮)

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—রবীন্দ্রনাট্যের বিবর্তন
('নতুন সাহিত্য', বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৬৮)

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে ('সংহিতা', বৈশাখ, ১৩৬৮)
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—রবীন্দ্রনাথের 'তিনসঙ্গী' (পারিয়া, বৈশাখ, ১৩৬৮)
অচ্যুত গোস্বামী—অমৃতের সন্ধানে
(শনিবারের চিঠি, রবীন্দ্র শতবার্ষিক সংখ্যা, ১৩৬৮)
পরিমল গোস্বামী—হাউসবোটে রবীন্দ্রনাথ ('ঘরে বাইরে', বৈশাখ ১৩৬৮)
জনার্দন গোস্বামী—সিন্ধী সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ ('সবুজ শিখা', শারদীয়, ১৩৬৮)
কেশবচন্দ্র গুপ্ত—রবীন্দ্রসাহিত্যে দুঃখের বাণী ('মাসিক বসুমতী', শ্রাবণ ১৩৬৮)
মোহিত গাঙ্গুলী—রবীন্দ্রনাথ ('পরিচয়', ৭ম খণ্ড, ১৯৬২)
শঙ্কর গিরি—রবীন্দ্রনাট্য ('নবান্ন' রবীন্দ্র শতবার্ষিক সংখ্যা, ১৩৬৮)
জীবেন্দ্রকুমার গুহ—রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা ('উত্তরসূরী', মাঘ-আষাঢ়, ১৩৬৭-৬৮)
বিভুরঞ্জন গুহ—রবীন্দ্র স্মরণে ('মন্দিরা', জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৮)
বিভুরঞ্জন গুহ—শিক্ষাক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, রুশো, মন্তেসরী
('শিক্ষা', বৈশাখ, ১৩৬৮)
নলিনীকান্ত গুপ্ত—রবীন্দ্রনাথ ('স্বপ্ন', বৈশাখ, ১৩৬৮)
নলিনীকান্ত গুপ্ত—রবীন্দ্রনাথের একপদী কবিতা (রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা,
বৈশাখ, ১৩৬৮)
নলিনীকান্ত গুপ্ত—রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দ (রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা, বৈশাখ, ১৩৬৮)
অতুলচন্দ্র গুপ্ত—রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য ('উত্তরসূরী',
মাঘ-আষাঢ়, ১৩৬৭-৬৮)
ধ্রুব গুপ্ত—রবীন্দ্রনাথের গান ('নতুন সাহিত্য', বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৬৮)
অজিতকুমার ঘোষ—রবীন্দ্রনাথের সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ
('ইতিকথা', বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৮)
অজিতকুমার ঘোষ—রবীন্দ্রনাথের বৃক্ষচেতনা ও বনবাণী কাব্য ('সোমপ্রকাশ',
চৈত্র-জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭-৬৮)
ইরা ঘোষ—রবীন্দ্রকাব্যে মৃত্যু ('হোমশিখা', অগ্রহায়ণ, ১৩৬৮)
জগন্নাথ ঘোষ—রবীন্দ্রনাথের 'কালান্তর' ('স্মারক', বিশেষ সংখ্যা, ১৩৬৮)
চিত্তরঞ্জন ঘোষ—শিক্ষা ও রবীন্দ্রনাথ ('পরিচয়' বৈশাখ, ১৩৬৮)
চিত্তরঞ্জন ঘোষ—শিশুদের রবীন্দ্রনাথ ('রেখা ও লেখা', বৈশাখ, ১৩৬৮)
ত্রিদিব ঘোষ—রবীন্দ্রনাথ ও মানুষের ব্যক্তিস্বরূপ ('উত্তরসূরী',
শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৬৮)

Statement about ownership and other particulars in respect of the newspaper entitled কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা সাহিত্য পত্রিকা, u/s 19D(b) of the Press and Registration of Books Act 1867 and under Rule 8 of the Registration of Newspapers (Central) Rules 1956.

1. Place of Publication : Asutosh Building, Calcutta University, Calcutta-700073.

2. Periodicity of Publication : Yearly.

3. Name of the Publisher : Dilip Kumar Mukherjee.
Nationality : Indian.
Address : Asutosh Building, Calcutta University, Calcutta-700073.

4. Name of the Printer : Dilip Kumar Mukherjee.
Nationality : Indian.
Address : Asutosh Building, Calcutta University, Calcutta-700073.

5. Name of the Editor : Professor Asit K. Banerjee.
Nationality : Indian.
Address : Asutosh Building, Calcutta University, Calcutta-700073.

6. Owner's name : Department of Bengali (Modern Indian Languages)
Address : University of Calcutta, Asutosh Building, Calcutta-700073.

I, DILIP KUMAR MUKHERJEE, do hereby declare that the statement made above is true to the best of my knowledge and belief.

D K Mukherjee

Publisher and Printer,
The Kalikata Viswavidyalaya
Bangla Sahitya Patrika.

1. 3. 1983

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অধ্যাপক ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের পক্ষে শ্রীদিলীপ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক আশুতোষ ভবন, কলিকাতা-৭০০০৭৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক জয়গুরু প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ১৩/১, মণীন্দ্র মিত্র রো, কলিকাতা-৭০০০০৯ হইতে মুদ্রিত।